নবতম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৬৭ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

অলংকরণ
শুভাপ্রসন্ন

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হিতপ্রাপ্যতে।

—ভবভূতি : উত্তররামচরিত

সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থাতেই যা একরূপ থাকে, হৃদয় যাতে
বিশ্রাম লাভ করে সর্বক্ষণ, বার্ধক্যে যার রসক্ষয়
হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় অপগত হয়ে যা স্নেহসারে স্থিত হয়,
সুমানুষের সেই ভদ্র প্রেম কত পুণ্যেই না পাওয়া যায়॥

সূচীপত্র

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ প্রণীত 'রামায়ণী প্রেমকথা'র প্রথম সংস্করণ পড়ে খুশি হয়েছিলাম। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সংবাদে খুশির মাত্রা বেড়ে গেল। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে আমাদের সারস্বতবোধ যে এখনও বজায় আছে, এটি আশ্বাস ও আনন্দের সংবাদ।

রামায়ণের বিশাল প্রাঙ্গণে অসংখ্য যক্ষরক্ষ, দেবদানব, নরবানরের শোভাযাত্রার মধ্য থেকে লেখক কয়েকটি বিশেষ চরিত্রকে বেছে নিয়ে আদিরসের বিচিত্র পটভূমিকায় তাদের এক নতুনরূপে উপস্থিত করেছেন। রামায়ণ ও রামায়ণকেন্দ্রিক আর্যসভ্যতার ধরনধারণ সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মতভেদের অন্ত নেই। কেউ বলবেন, রামায়ণ মূলতঃ মহাকাব্য, বীরযুগের মহাকাব্য। কেউ বলবেন, একে শ্রেষ্ঠ পুরাণ-সাহিত্য বলে গণ্য করতে হবে। এতে আর্য-ঐতিহ্যের কতকগুলি চিরায়ত নীতি, আদর্শ ও জীবনচর্যার স্থায়ী মূল্য প্রতীকের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে এবং হিন্দুজাতির মানসিক সাকল্যবোধকে যুগাতিচারিত্ব দান করেছে। পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানে অধীতব্যক্তি বলবেন, এর মধ্যে নাগরিক দ্রাবিড় সভ্যতা এবং কৃষিজীবী আর্যসভ্যতার সংঘাত দেখান হয়েছে। কেউ বা বলবেন, মনোজীবী ব্যক্তিত্ব ও দেহজীবী ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষই রূপকের ছলে বলা হয়েছে।

অবশ্য একথা ঠিক, আর্যমহাকাব্য একটা বিশেষ যুগজীবনের, বিশাল মানবসংস্কৃতির বাণী বহন করে। রামায়ণ সেই ধরনের মহৎ শিল্প, শিল্পসৃষ্টি যার মূল লক্ষ্য নয়। শিল্প ও চিত্তবিনোদনকে অতিক্রম করে মানসিক উন্নয়নই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ একদা যা হতে চেয়েছিল, এই রামায়ণের মধ্যে তার পূর্ণ চিত্র আছে। ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে যা হতে চাইছে, তাও কি এর মধ্যে আছে? সব মহৎ সাহিত্যেরই একটা তাৎক্ষণিক মূল্য থাকে, আবার তার আরেকটি দেশকালাতীত চিরন্তনত্বও থাকে। রামায়ণ যুগধর্ম ও নিত্যধর্মের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীক ইলিয়দ ও অদেসি, রোমান ঈনিদ,—এ সব মহাকাব্য শুধু কাহিনী-বৈচিত্র্য ও চারিত্ররূপে বেঁচে আছে ; এর মানবিকতা ও মানসিকতা এখন পাঠকের কাছে নিষ্প্রভপ্রায়। কিন্তু রামায়ণ থেকে আমরা আরও কিছু বেশী পেয়েছি। তাই হোমর, ভার্জিল হাল আমলে য়ুরোপের কাছে যে-অর্থে জীবিত, আমাদের আর্য কবিদ্বয় এদেশের কাছে তার চেয়েও বেশী। শুধু কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে নয়, অধিমানসিকতার সঙ্গেই এই দুই মহাকাব্যের যথার্থ যোগ। রামায়ণে যুদ্ধবিগ্রহ যথেষ্ট আছে, একটা গোটা কাণ্ডই তো যুদ্ধ নিয়ে রচিত। কিন্তু মানুষের কতকগুলি মানবিক বোধ—যা

প্রধানতঃ গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী, সেই পারিবারিক প্রেমপ্রীতিনিষিক্ত, সুখদুঃখময়, হাসি-অশ্রুপরিস্নাত সম্পর্কগুলি রামায়ণের মূল বক্তব্য। সীতার অগ্নিপরীক্ষা লঙ্কাকাণ্ডের শেষে বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র রামায়ণই মানববোধের অগ্নিপরীক্ষা, আধুনিক কালে যাকে বলে 'অ্যাসিড টেস্ট'। বিরুদ্ধ শক্তি ও নিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সঙ্গে শুভবোধের দ্বন্দ্ব এবং অন্তিমে কল্যাণাস্পদ মানবধর্মের জয়; যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানি সত্ত্বেও পিতা-মাতা-ভ্রাতা-বধূ জড়িত পারিবারিক জীবনের প্রাধান্য—এ কথাই কি রামায়ণের ফলশ্রুতি নয়? মানুষের জয়পরাজয়ের অতীত বিশাল নির্বেদ, যার শেষ পরিণাম জয়ধ্বনি ও শ্মশানসঙ্গীতের ঐকতান—সেই অমোঘ, অধৃষ্য, অপরিমেয় বেদনারাশির শান্ত পদসঞ্চার ঐশ্বর্যবান সমারোহকে অস্তি-নাস্তির একসূত্রে গ্রথিত করে; সেই সান্তনাহীন দুঃখ কি এ মহাকাব্যের সমাপ্তিতে অশ্রুব্যাকুল হয়ে ওঠে না?

তত্ত্বের কথা যাই হোক, 'রামায়ণী প্রেমকথা'র লেখক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ রামায়ণের এমন কয়েকটি চরিত্রকে অবলম্বন করেছেন, আদিরস যার মূল ধারক শক্তি। যে মহাকাব্য শুধু মহাকাব্য নয়, আমাদের জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেছে, শৃঙ্গার রসের ফেনিল উত্তেজক পটভূমিকায় তাকে দেখতে হলে কোথায় যেন সংস্কার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে নর্মলীলা অধর্ম বা "Original sin" বলে পরিত্যক্ত হয় নি। সংস্কৃত প্রাকৃত সাহিত্য ও মন্দিরগাত্রে ভাস্কর্যরীতি তার প্রমাণ। আসলকথা, প্রাচীনভারত মানুষকে কেবল-মাত্র মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বল্কলে আবৃত করে তার স্বভাবসুন্দর মানবধর্মকে অস্বীকার করে নি। আদিরস, দেহলীলা, অনঙ্গরঙ্গ—এ কখনই অশুচি নয়, অন্ততঃ প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে কোনো স্থানেই দেহভীরুতা—যা জীবনবিনাশী নৈতিবাদ মাত্র, তা প্রবল হয়ে মীনকেতনের চীনাংশুককে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রমণ্ডিত করে ফেলে নি। চতুর্বর্গ ফললাভ করতে গেলে বাসনাকে অস্বীকার করা যায় না, ধর্মার্থকাম-মোক্ষের মধ্যে 'কাম' বর্জনীয় নয়। জীবনকে সংঘারামের দিকে ঠেলে না দিয়ে তাকে পরিপূর্ণতার মধ্যে গ্রহণ করাই ছিল ভারতের আদর্শ। বোধহয় বৌদ্ধযুগেই সেই আদর্শের অবনতি হলো। 'সর্বং দুঃখং সর্বমনাত্মং নির্বাণং শান্তম্'—বৌদ্ধধর্মের এই মন্ত্রধ্বনি মানুষের জীবনভোগী পূর্ণতাকে গ্রাস করে নিল। রামায়ণ সেযুগের নয়। কাজেই যখন মধুমাসে বনস্থলী নবোঢ়া বালার মতো সজ্জিত হতো, তির্যক্‌যোনির মানবেতর প্রাণীরা পর্যন্ত রাগরঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠত, যখন মুনিকুটিমের দ্বারপ্রান্তে সহকারশাখা মুকুলিত হতো, স্বর্ণচাঁপার শাখায় শাখায় গন্ধচাপল্য শুরু হয়ে যেত, তখন অজিনাসনে-উপবিষ্ট, নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো ধ্যানলীন মুনিমানসে চন্দ্রোদয়ারম্ভে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মতো তপোবনবিরোধী বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে মধু-মাসেরই বা দোষ কি, মকরকেতনেরই বা অপরাধ কি? তখন রুদ্রাক্ষের মালা স্খলিত হয়, দণ্ডকমণ্ডলু ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, ললামভূতা নারীকে প্রকৃতির মতো ছলনাময়ী জেনেও শ্মশানবাসী যোগী তাকেই আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন উৎকট রিরংসার তপ্ত

আবেগে। তখন অমরাবতীর লোকোত্তর সাধনা মর্ত্যের ভোগবতীর প্লাবনে কোন্ দিগন্তে ভেসে যায়। নিষ্কাম অনাসক্তির স্থলে আসক্তি, ত্যাগের স্থলে কাম, ব্রহ্ম-বিদ্যার স্থলে মীনকেতন-বিজয়গাথা, 'বৈরাগ্যশতকে'র স্থলে 'শৃঙ্গারশতক' ভস্ম-অপমান-শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। গৃহী, যতি, কুমারী, কুলবধূ, সন্তানের জননী, রাক্ষসী, বানরী, অপ্সরা, স্বর্গের ঈশ্বরী—কেউ-ই অঙ্গহীন দেবতার অদৃশ্য শরক্ষেপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। প্রেমের সেই অরুণরাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন মানসিকতাকে কীভাবে রঙিন করে তোলে রামায়ণে সেই কথাচিত্রগুলি বড় মনোরম। লেখক সুধাংশুরঞ্জন রামায়ণে রামায়ণে-বর্ণিত সেই প্রেম-কামের চিত্রগুলিকে অতি অপূর্ব ভঙ্গীতে এঁকেছেন। গ্রন্থটি আধুনিক কালের লেখকের লেখনীপ্রসূত, তাঁর লক্ষ্যও আধুনিক পাঠক-পাঠিকা। কাজেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিমায় আধুনিক কালের স্পর্শ লাগলে দোষের কথা নয়। তাই রামায়ণে যা ছিল নিছক কামোপভোগের চিত্র (রাবণ-রম্ভা সংবাদ), লেখক তাকে দেহপ্রমাথী পৃথুলতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরে একপ্রকার সূক্ষ্ম মানসবৃত্তির তুরীয় তীর্থেই তার অভিনিষ্ক্রমণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর এ রীতিটি আমি প্রশংসা করি। পুরাকথাকে এ যুগের মানুষের মনের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হলে তার কিছু কিছু রূপান্তর ঘটা স্বাভাবিক—লেখক সাফল্যের সঙ্গে সেই রূপান্তর ঘটিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে সমগ্র কথামূর্তি ও ভাবরসের গোত্রান্তর ঘটে নি। তাঁকে এই জন্য কোনো কোনো স্থলে রামায়ণের বর্ণনাকে কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে হয়েছে, কিন্তু তাতে বক্তব্যের স্বাদুতা আরও বেড়ে গেছে। সর্বোপরি তাঁর রচনারীতি অতি চমৎকার হয়েছে। ক্লাসিক পরিবেশে তৎসম শব্দবহুল ঘনাপিনদ্ধ বর্ণনায় মহাকাব্যের প্রাচীন পটভূমিকা বহুস্থলেই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে নেশা ধরে যায়। আমরাও যেন শতশতাব্দীর যবনিকা তুলে কখনও অযোধ্যায়, কখনও কোশলে, কখনও পুষ্কর হ্রদে, পম্পা সরোবরে, সুমেরু পর্বতে, কখনও কৈলাস, মাল্যবান, ঋষ্যমূক গিরিশিখরে উপস্থিত হই। কখন যে সেকালের সঙ্গে একালের ভেদরেখা লুপ্ত হয় তা বুঝতেই পারি না।

এ গ্রন্থ থেকে যে আনন্দ লাভ করেছি, পাঠক-পাঠিকাকে সেই আনন্দের ভোজে আহ্বান করি। ইতি—

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্তব্য

সুদূর পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা বৈগুণ্যে প্রেমের বহিরঙ্গ ও প্রকাশ-কলাভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও নরনারীর প্রেমাবেগের মূল ধাতুটি অপরিবর্তিত ও অক্ষত রয়ে গেছে আজও। যে প্রেম অজস্রের মধ্যে এককে কখন কিভাবে বেছে নেয় তা কেউ বলতে পারে না, যে প্রেম সর্বতোভাবে অনুভূত হয়েও কখনো চরম তৃপ্তির প্রান্তবিন্দুতে নিঃশেষে আত্মলোপ করে না, বরং তার পুরাতন জীবনবৃত্তের মধ্যে নিত্য নূতন বৈচিত্র্যের তরঙ্গ তুলে সে বৃত্তটিকে ক্রমশঃ প্রসারিত করতে করতে পরিশেষে এক সমুদ্রসুলভ বিশালতা দান করে, অন্তহীন আস্বাদনের দুর্মর এষণায় এক উচ্ছ্বসিত কামনাবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে নিয়ত, সে প্রেম মানব-জীবনের সর্বাপেক্ষা এক বলিষ্ঠ অনুভূতিরূপে এক অপার দুজ্ঞের্য় রহস্যে আবৃত হয়ে আছে আজও। আজও নরনারী ভালবাসে পরস্পরকে। কোনো পুরুষ তার বাঞ্ছিত নারী বা কোনো নারী তার বাঞ্ছিত পুরুষের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক অন্ধ আসক্তি ও আসঙ্গলিপ্সার আবেগ বর্ণগন্ধের এক অদম্য অমিত উচ্ছ্বাসে পুষ্পিত হয়ে ওঠে তার হৃদয়বৃন্তে।

মূল রামায়ণ মহাকাব্যের আখ্যানভাগটি জুড়ে রামসীতার প্রেম প্রধান উপজীব্য-রূপে বিরাজিত হয়ে থাকলেও তার মধ্যে আরও যে কয়েকটি প্রেমসম্পর্ক স্বল্প রেখায় অঙ্কিত হয়েছে, আমি সেই স্বল্পরেখাঙ্কিত প্রেমসম্পর্কগুলিকে এক সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ শিল্পরূপ দান করার প্রয়াস পেয়েছি আমার 'রামায়ণী প্রেমকথা' গ্রন্থখানিতে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজকবি ম্যাথু আর্নল্ড 'টু মার্গারেট' কবিতায় এক একটি মানবাত্মাকে সমুদ্রমধ্যস্থিত এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন মাঝে মাঝে চন্দ্রালোকিত কোনো রাত্রির শান্তমদির অবকাশে সেই সব বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দ্বীপগুলি এক আত্মিক সেতুবন্ধনের মাধ্যমে ক্ষণকালের জন্য মিলিত হয় পরস্পরে। এই মিলনই প্রেম। আবার আমরা যদি মানবাত্মাকে আপন আপন সত্তার স্বাতন্ত্র্যে পুঞ্জীভূত এক একটি নিঃসঙ্গ নির্জন পাহাড়রূপে কল্পনা করি তাহলেও দেখব সেই সব প্রস্তরকঠিন পাহাড়ের বুক দিয়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে তরলিত আসক্তি ও আসঙ্গলিপ্সার এক বেগবান ধারা। প্রবলতায় শতত উত্তাল, গতিশীলতায় অন্তহীন, সংগ্রামশীল প্রাণশক্তির অদম্য উচ্ছ্বাসে সতত বেগবান এই ধারা অন্য একটি প্রেমের ধারা অথবা সত্তার সমুদ্রে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত অসংখ্য বাধা

বিপত্তির পাহাড় প্রান্তর অতিক্রম করে নিরন্তর ছুটে চলে দিক হতে দিগন্তের পথে। একটি প্রাণের বন্যা অন্য একটি প্রাণের বন্যার সঙ্গে মিলিত না হলে মানুষ তার অন্তরাত্মার চূড়ান্ত মূল্য কখনও খুঁজে পায় না। অপর প্রাণের মধ্যে আপন প্রাণাবেগের প্রবহমানতা, অপর আত্মার আধারে আপন আত্মার মূল্যবোধই হলো প্রেম। কলিংউড তাই বলেছেন, Love is the seeking and maintenance of one's own value in the mind of another.

উৎপত্তিস্থল বা উৎসদেশ যাই হোক না কেন, সব প্রেমেরই মূল উদ্দেশ্য হলো এক এবং সে উদ্দেশ্য হলো প্রেমাস্পদের মনে আপন আত্মার চরম মূল্যপ্রাপ্তি এবং আপন আত্মার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু উদ্দেশ্য এক হলেও সব প্রেমের গতিপ্রকৃতি এক নয়। বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদ যেখানে সহজলভ্য, বিধিনিষেধের কণ্টকে পথ যেখানে সমাকীর্ণ নয়, প্রেম সেখানে এক সৃষ্টিশীল আনন্দে সতত উচ্ছল, তরঙ্গসুলভ গতিভঙ্গিতে সাবলীল। কিন্তু যেখানে বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদ দুর্লভ, নানারূপ বাধাবিপত্তিতে পথ সেখানে জটিল ও আকীর্ণ, প্রেম সেখানে স্বভাবতই এক সংগ্রামশীল উদ্বেলনে সতত চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ।

রামায়ণী প্রেমকথা গ্রন্থটিতে যে সব প্রেমকাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে প্রকৃতিগত দিক থেকে সেগুলিকে প্রধানতঃ বৈধ অবৈধ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। বিশ্বামিত্র ও মেনকা, ইন্দ্র ও অহল্যা, অঞ্জনা ও পবনদেব, রাবণ ও রম্ভা প্রভৃতি কাহিনীবর্ণিত প্রেমগুলি সমাজ ও শাস্ত্রসম্মত নয় বলে এগুলিকে অবৈধ প্রেম বলা হয়ে থাকে। দেহলালসা থেকে উদ্ভূত এই সব প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেহতৃপ্তি। কিন্তু গুণগত প্রকৃতি বা উদ্দেশ্য যাই থাক, এক আশ্চর্য বিবর্তন-ধর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় এই সব প্রেমগুলিতে। যে প্রেম তার প্রাথমিক স্তরে ছিল তরলিত কামনার এক অন্ধ আবেগমাত্র, পরে তা চরম রতিতৃপ্তি লাভ করে একমাত্র রতিসুখসারে পরিণত হবার পর জৈব ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে অবশেষে আত্মিক মিলনের অতীন্দ্রিয়লোকে উত্তীর্ণ হয়। অবশ্য সব প্রেমই একই সঙ্গে অল্পাবিস্তর দেহানুগ ও দেহাতীত, ইন্দ্রিয়ানুগ ও ইন্দ্রিয়াতীত। পদ্মপুষ্পসুলভ এক উত্তরণাভিলাষ সব প্রেমেরই ধর্ম। দেহগত ইন্দ্রিয়লালসার পঙ্কিল আবর্তে জন্মগ্রহণ করে যে প্রেম সেই প্রেমই পদ্মের মতো সে আবর্তের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে তার শুচিশুভ্র পাপড়িগুলিকে মুক্ত আকাশ আর উদার সূর্যালোকের পানে মেলে দেয়।

অজ ও ইন্দুমতি, লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলা, বিশ্রবা ও কৈকসী প্রভৃতি যে সব দাম্পত্য ও সমাজসম্মত প্রেমকাহিনীগুলি এ গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে সেই সব কাহিনীবর্ণিত প্রেমগুলির মধ্যে তথাকথিত সমাজবিগর্হিত ও অবৈধ প্রেমগুলির মতো এক সংগ্রামশীল বেগবত্তা ও উচ্ছ্বাসময় প্রবলতা না থাকলেও তাদের গতিপ্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বে বলা হয়েছে, 'অহেরিব প্রেমণঃ স্বভাব কুটিলা গতি'

অর্থাৎ প্রেম যত বৈধ বা শাস্ত্রসম্মতই হোক না কেন, প্রেম কখনো সোজা চলে না সব সময় ; তার গতিপথ সাপের মতই বক্রকুটিল। তার গতিপথের এই বক্রকুটিলতাই প্রেমকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য দান করে চির আস্বাদ্যমান করে তোলে তাকে। এখানে প্রেমাস্পদকে কাছে পেয়েও সাময়িক বিচ্ছেদব্যথা ও মান অভিমানের আঘাতে হৃদয়বৃন্তে প্রস্ফুটিত প্রেমের কুসুম আন্দোলিত হয়েছে বারবার, তার সাবলীল সাধনায় মাঝে মাঝে ব্যাহত হওয়ায় প্রেম তার আপন গভীরে এক কৃত্রিম অন্তরাবর্তন সৃষ্টি করে তারই মধ্যে আবর্তিত হয়েছে।

রামায়ণী প্রেমকথায় সন্নিবেশিত প্রেমকাহিনীগুলির নায়কনায়িকার মনে প্রেমানুভূতি সঞ্চারে ও লালনে বহিঃপ্রকৃতি সহায়তা করেছে বিশেষভাবে। কোনো উতল বসন্তের মদির অপরাহ্ণে যখন অস্তাচলগমনোম্মুখ সূর্যের বর্ণচ্ছটাগুলির দ্বারা পরিচুম্বিত হয়েছে রক্তাশোকের শাখাগ্রভাগগুলি, মারুতহিল্লোলের সোহাগী স্পর্শে রোমাঞ্চ জাগে কজ্জলপ্রভ কোনো সরোবরের স্বচ্ছশীতল বুকে, আসঙ্গলিপ্সু কোনো বনকুরঙ্গ যখন তার কামনাতপ্ত ওষ্ঠাধরের দ্বারা তার অভিমানিনী সঙ্গিনীর নয়ন কণ্ডুয়ন করে দেয়, তখন সবচেয়ে নিষ্কাম নিস্পৃহ মানুষের বৈরাগ্যধূসর অন্তরাকাশেও লাগে কামনার রং ; তাদের শান্ত চিত্তের স্তব্ধ অবকাশে জাগে অনঙ্গদেবের অভ্যস্ত পদধ্বনি।

প্রকৃতির বিশাল পটভূমিকায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের অনুভূতিগুলি লালিত হওয়ায় তারা সহজেই প্রকৃতির উদার অকৃপণ সহানুভূতিলাভে ধন্য হতে পেরেছে আর তার ফলে তাদের প্রেমচেতনা ক্রমশঃ প্রচারিত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতা ও বৈধতা অবৈধতার সমস্ত সীমারেখা পার হয়ে এক মহাজাগতিক চেতনায় অন্তর্লীন হয়ে যায়। তখন তারা তাদের প্রেমাস্পদকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে তার চিন্তার মধ্যে নিজেদের কেন্দ্রীভূত না করে দিগন্তললাটিকা, 'সমুদ্রমেখলা', 'অরণ্যকুন্তলা', স্তনিতভূধর বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে তাদের প্রেমাস্পদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য কল্পনা করে। তাদের প্রেমকে এক মহাজাগতিক মহিমা ও মর্যাদা দান করে।

অজ ও ইন্দুমতী



মৈত্রমুহূর্তে অর্থাৎ উদয়মুহূর্তে থেকে তৃতীয়মুহূর্তের মধ্যে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র যখন চাঁদের সঙ্গে মিলিত হয় সেই শুভলগ্নে আয়তীমতী জীবৎপুত্রিকা পুরকামিনীরা হরিদ্রা ও কালেয় নামক গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গরাগ করে স্নান করালেন ইন্দুমতীকে। তারপর হরিদ্বর্ণের মধুদ্রুম কুসুমের মালা দিয়ে বিন্যস্ত করে দিলেন তাঁর ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ। সিঁথিতে শ্বেতসর্ষপযুক্ত দূর্বাঙ্কুর দিয়ে নীলকান্তমণিসমন্বিত স্বর্ণমেখলা ও কৌশেয় বসনে আবৃত করে দিলেন তাঁর ত্রিবলী রেখাঙ্কিত নধর নাভিদেশ।

লোধ্র কুসুমের শ্বেতপরাগ বিলেপনে চর্চিত হলো ইন্দুমতীর রক্তাভ কপোলতল। অঞ্জনে শোভিত হলো তাঁর নীলকঞ্জপ্রভ নয়নদ্বয়। অলক্তরাগে রঞ্জিত হলো তাঁর পদ্ম-কোষতুল্য পদযুগল।

তারপর ক্ষত্রিয় বালিকার বিবাহকালোচিত একটি বাণ দেওয়া হলো তাঁর হাতে।

এমনি করে শতগুণে বেড়ে গেল সর্বাঙ্গসুন্দরী ইন্দুমতীর দেহ সৌন্দর্য।

সখিরা পরিহাস করে বললেন, এই অপ্রতিম অনিন্দ্যসুন্দর রূপ কার ভাগ্যে লাভ হবে কে জানে!

এক কৃত্রিম ও সলাজ ক্রোধভরে হাতের ফুলহার দিয়ে সখিদের প্রহার করলেন ইন্দুমতী।

এদিকে তখন বিদর্ভ রাজদরবারে স্বয়ংবর সভা[1] বসে গেছে। বিভিন্ন রাজ্য হতে অসংখ্য রাজা ও যুবরাজ এসেছেন অসামান্যা রূপসী রাজকন্যা ইন্দুমতীর পাণি-পার্থী হয়ে। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন স্বর্গের দেবতারা।

এতক্ষণ যে গুঞ্জনে মুখরিত হয়েছিল সভাস্থল, ইন্দুমতী প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে।

সুমধুর নূপুরনিক্কণে পথের প্রতিটি ধূলিকণাকে ধন্য ও অনুরণিত করে স্বর্ণবেত্র-ধারিণী অভিজ্ঞা দ্বারপালিকার পশ্চাদ্বর্তিনী হয়ে মরাল গমনে বরমাল্য হাতে প্রবেশ করলেন ইন্দুমতী। স্তম্ভিত রাজন্যবর্গের সমবেত লালসাতুর দৃষ্টির দ্বারা লাঞ্ছিত হলো তাঁর অঙ্গলতিকা। তাঁকে দেখে মনে হলো, মেঘলাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্র অথবা দুরন্ত ভ্রমরদলবেষ্টিত কোনো নবোদ্ভিন্ন কুসুম-কলি।

এক একজন রাজপুরুষের সামনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে প্রতিহারী তাঁর বিস্তৃত পরিচয় দান করতে লাগলেন এবং সম্ভ্রমানত মস্তকে এক অটল ও মর্যাদামণ্ডিত গাম্ভীর্যে স্থির হয়ে তাই শুনতে লাগলেন ইন্দুমতী। কিন্তু কারো পানে একটিবারের জন্যও মুখ তুলে চাইলেন না তিনি।

অবশেষে একজন রাজার পানে মুখ তুলে চাইলেন। মধুরভাষিণী অন্তঃপুরপালিকা তাঁর পরিচয় দিলেন, ইনি হচ্ছেন কোশলাধিপতি ইক্ষ্বাকু-কুলমণিমহারাজ রঘুর আত্মজ অজ; দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য যাঁর বিক্রম, কন্দর্পতুল্য যাঁর রূপ। তোমার সর্বাংশে অনুরূপ।

সুনন্দার কথা শেষ হতে না হতেই পেলব চম্পককলিতুল্য অঙ্গুলি দ্বার বিচিত্রা পুষ্পসংযুক্ত কাঞ্চনবর্ণরঞ্জিত ও মণিমুক্তাশোভিত বরমাল্যখানি তুলে ধরলেন ইন্দুমতী এবং অনিন্দ্যসুন্দর অজের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। তাঁর রোমাঞ্চিত অঙ্গলতিকায় প্রতিফলিত হয়ে উঠল হৃদয়নিহিত গূঢ় অনুরাগ।

এদিকে ইন্দুমতীর মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহারাজ অজ। প্রেমবিমোহিত দৃষ্টির বৈদ্যুতী প্রবাহে মুহূর্তে হৃদয় বিনিময় হলো উভয়ের। অনন্তকালীন প্রেমের চিরচঞ্চল রহস্য যেন মূর্ত হয়ে ধরা দিল ক্ষণকালের এই পরিচয়ের মধ্যে। অনুরাগরঞ্জিত হৃদয়ের অব্যক্ত আকুল এক আসক্তি বাঙ্ময় হয়ে উঠল দুজনের নীরব চোখের নিগূঢ় ভাষাময়তায়।

এক চাপা অসন্তোষ ও ঈর্ষার গুঞ্জন উঠল সভামধ্যে।

এদিকে বিদর্ভরাজ ব্যস্ত হয়ে দ্রুত গিয়ে বরণ করে নিলেন প্রার্থিত বরকে।

শুভ পরিণয়োৎসব শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো বরকন্যাকে।

রাত্রি গভীর হলে এবং পুরকামিনীরা একে একে সকলে চলে গেলে ঘরের মধ্যস্থিত কাঞ্চন প্রদীপটিকে ইন্দুমতীর মুখের কাছে নিয়ে কি একবার দেখে নিলেন মহারাজ অজ। তারপর আলোক শিখাটিকে ক্ষীণ করে দিয়ে মুক্ত বাতায়ন পাশে চলে গেলেন।

বাইরে চাঁদের আলোর মধ্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন অজ। দেখলেন দীপাবলী-শোভিত মহানগরীর প্রান্তে শুক্লপক্ষের শঙ্খধবল জ্যোৎস্নার তরলিত প্রবাহে নিঃশেষে ভেসে যাচ্ছে যেন সপ্তপর্ণ বনের সমস্ত সবুজ আর নিবিড়নীল দিগ্‌বলয়ের রেখা। জ্যোৎস্নায় সেই মদির তরলতায় রতিক্লান্ত কোন এক শ্বেত পারাবতদম্পতীর চোখে এসেছে তন্দ্রাঘন এক নেশা।

মহারাজ অজ ভাবলেন, পল্লবঘন সপ্তপর্ণ বনের ঐ সবুজ ছায়াঘেরা পথ দিয়ে আজ দিনের বেলায় যখন তিনি স্বয়ংবর সভায় আসছিলেন তখন ভাবতেই পারেন নি এত রাজার মধ্যে তাঁরই গলে বরমাল্য দেবেন ইন্দুমতী এবং যাবার সময় তিনি বিজয়গৌরবে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ইন্দুমতীকে ঐ পথ দিয়ে।

কতবার কত কামপ্রমত্ত মুহূর্তে নারীদেহের প্রতি একটা জৈবিক আসক্তি অনুভব করেছেন অজ তাঁর অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে। কিন্তু প্রেম কাকে বলে তা কোন দিন বোঝেন নি অথবা বুঝতে চেষ্টা করেন নি। একথা আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না মহারাজ অজ, সে কোন দৃষ্টি যা দিয়ে মানুষ অজস্রের মধ্যে একজনকে আপন বলে চিনে নেয়, সে কোন হৃদয়ের দুর্বার বিদ্যুৎ যা এক মধুর অথচ অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে কাছে টেনে নেয় তার অন্তরতমকে।

ক্ষীণ দীপালোকে ইন্দুমতীর মুখখানিকে তুলে ধরলেন অজ।

ইন্দুমতী কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারলেন না তাঁর কথার।

ক্ষীণ দীপালোকটিকে আবার ক্ষীণতম করে দিলেন মহারাজ অজ। তারপর আবার চলে গেলেন সেই বাতায়ন পাশে। জীবনে এ এক বিরাট রহস্য ও পরম বিস্ময়। তাঁর মনে হলো, প্রেম হচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন বনজ্যোৎস্নার মতোই কুহেলিকাময় যার মধুরতা শুধু মৃদু রোমাঞ্চ জাগায় দেহমনের প্রতিটি রোমকূপে, কিন্তু যা কখনো দিবালোকের মতো স্বচ্ছ নয়, যার স্বপ্নছায়ামদির মোহকে অনুভূতির নিবিড়তা দিয়ে উপভোগ করতে হয়; কিন্তু বুদ্ধির প্রখরতা দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না যার স্বরূপকে।

জীবনে অনেক রাজ্য জয় করেছেন মহারাজ অজ। কিন্তু আজ একটি মানুষের অন্তররাজ্য জয় করে তার প্রেমের সিংহাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করা সমগ্র পৃথিবী জয় করার থেকে শতগুণে কঠিন বলে মনে হলো তাঁর।

পরদিন বেলা প্রথম প্রহর শেষ না হতেই বরকন্যাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন বিদর্ভরাজ।

রথ সঙ্গে এনেছিলেন মহারাজ অজ। মণিমুক্তাখচিত সেই উজ্জ্বল স্যন্দন-সহযোগে ইন্দুমতীকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন অযোধ্যার পথে।

কিন্তু নগর প্রান্তের সেই বিশাল সপ্তপর্ণ বনের কাছে যেতেই ব্যাহত হলো তাঁর গতি। যে সব রাজারা স্বয়ংবর সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন, বিফল-মনোরথ সেই সব রাজারা একযোগে আক্রমণ করলেন মহারাজ অজকে। ইন্দুমতীর রূপে উন্মত্ত তাঁরা সকলে। যে অমূল্য রূপসৌন্দর্য লাভে বঞ্চিত হলেন তাঁরা চিরতরে সে সৌন্দর্য তাঁরা ভোগ করতে দেবেন না অন্য কাউকে। তাই মহারাজ অজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে অকালবৈধব্যের এক নিদারুণ যন্ত্রণায় স্বয়ংবরা ইন্দুমতীর সারা জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে চান তাঁরা।

প্রথমটায় বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন মহারাজ অজ। আক্রমণোদ্যত অসংখ্য রাজাকে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা মুহূর্তে বুঝতে পারলেও কর্তব্য ঠিক করে উঠতে পারলেন না নিজে।

আজ কালরাত্রি। কালরাত্রির দিন কোনো বিবাহিতা নারীকে স্পর্শ করলে সে চিরদুর্ভাগিনী হয়। সে নিষেধ উপেক্ষা করে নিবিড় আলিংগনে ইন্দুমতীকে বুকে টেনে নিয়ে অসংখ্য চুম্বনে তাঁর রক্তাভ কপোলফলককে চিত্রিত করে বললেন, আমি রথ থেকে নেমে একা যুদ্ধ করব শেষ পর্যন্ত। তুমি এই রথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাও ইন্দুমতী। যুদ্ধে আমি না বাঁচলেও তোমার মনে আমি চিরদিন বেঁচে থাকব। ওরা আমাকে হত্যা করলেও তোমার মন থেকে সরাতে পারবে না কোনোদিন।

সমস্ত লজ্জা ও সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় হয়ে উঠলেন ইন্দুমতী। বললেন, আমি ক্ষত্রিয় রমণী, আমার প্রেম ও পত্নীত্বের মর্যাদা কেমন করে রক্ষা করতে হয় তা আমি

জানি মহারাজ। আমি শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করব আপনাকে। তারপর মরতে হয় একসঙ্গে দুজনে মরব।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। অজের কাছে যে গন্ধর্ব বাণ ছিল, ধনুতে সেই বাণ যোজনা করতেই তার থেকে তিন কোটি গন্ধর্ব বার হয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলল সমস্ত রাজাদের।

ইন্দুমতীকে নিয়ে বিজয় গৌরবে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন রণদীপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ অজ।

সরযূ নদী পার হয়ে নগরপ্রান্তে শালবনে রথ প্রবেশ করতেই অযোধ্যায় অসংখ্য শঙ্খ বেজে উঠল একসঙ্গে।

কালরাত্রির পরদিন এলো ফুলশয্যা। এমনি করে রক্তরঙীন অস্তরাগরেখার মতো ইন্দুমতীর পূর্বরাগের আবেগ শুভ পরিণয়ের মধ্য দিয়ে লাভ করল এক গভীর পরিণতি।

আরও মহিষী ছিল মহারাজ অজের। কিন্তু এবার থেকে ইন্দুমতী হয়ে উঠলেন তাঁর যথাসর্বস্ব।

এ নিয়ে একদিন অজের কাছে মৃদু অনুযোগ করলেন ইন্দুমতী। শান্ত অথচ বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমার প্রতি আপনি অতিমাত্রায় আসক্ত বলে মনে হচ্ছে মহারাজ। কিন্তু আপনার আরও যে সব মহিষী আছেন তাঁদের প্রতিও আপনার একটা কর্তব্য আছে। আমার ভয় হচ্ছে আপনি সে কর্তব্য ক্রমশঃ বিস্মৃত হয়ে পড়ছেন।

মহারাজ অজ স্বীকার করে নিলেন এ অনুযোগকে। বললেন, তোমার এ অনুযোগ সত্য ইন্দুমতী। আজ আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে, পরিণয়ের মধ্য দিয়ে প্রেম প্রগাঢ়তা লাভ করে সত্য, কিন্তু পরিণয় কখনো প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। তাদের সঙ্গে আমি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি সত্য, কিন্তু আজও কোনো বিশুদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি আমার ও তাদের মধ্যে। তাদের অভিভাবকদের অনুরোধে আমি তাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করে ঘরে এনেছি। কিন্তু তাদের কেউ তোমার মতো অজস্রের মধ্যে তার একমাত্র প্রেমাস্পদরূপে বেছে নিতে পারে নি আমায়। তাই বোধহয় আমি তোমার প্রতি এত বেশী আসক্ত ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী বললেন, তা হলেও তাঁদের প্রতি আপনার একটা কর্তব্য আছে মহারাজ। আমাকে আপনি ভালবাসেন বুঝলাম। কিন্তু আমার প্রতি প্রেমাতিশয্যবশতঃ কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা আপনার উচিত নয়।

তখন সকরুণ নয়নে ইন্দুমতীর পানে চাইলেন মহারাজ অজ। কাতরকণ্ঠে বললেন, তুমি আমায় কি বলতে চাইছ ইন্দুমতী, আমি বুঝতে পারছি না। আমার কেবলি

ভয় হচ্ছে হয়ত তুমি আমায় কঠিন কিছু বলবে।
তাই যদি বলি তবে ক্ষতি কি মহারাজ। কঠিনের আঘাত পেয়ে আমাদের প্রেম সমস্ত দুর্বলতা হতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠুক—এটাই কি আমাদের কাম্য নয় ?
নীরবে মাথা নত করে রইলেন মহারাজ অজ। ইন্দুমতীর মুখ থেকে কোনো এক নিষ্ঠুর কথা শোনবার জন্য দুঃসহ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন।
ইন্দুমতী বললেন, একটি বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করব আমি। আমার অন্তঃপুরের মধ্যে নির্জনবাসে থাকব আমি নিষ্ঠার সঙ্গে। এই একটি বৎসরের মধ্যে আমাদের কোনোদিন দেখা হবে না। আমারঅন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেব না আপনাকে।
বজ্রাহতের মতো বিমূঢ় ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহারাজ অজ। ইন্দুমতীর এই নিষ্ঠুর আদেশবাক্যকে অবাধে মেনে নেবার যেমন প্রবৃত্তি নেই তেমনি তাকে খণ্ডন করে তাঁর সম্যক বিরোধিতা করারও কোনো শক্তি নেই তাঁর।
তাই নীরবে নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে রইলেন অজ।
তখন সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে। সূর্যাস্তবিধুর গোধূলির ধূসর ছায়া নেমে এসেছে বিশাল রাজোদ্যানের শল্লকীতরু শাখার উপরে, মৃদু বীচিবিক্ষুব্ধ সরোবরের বুকে।
ইন্দুমতী বললেন, অবাধ মিলনাতিশয্য হতে বহু দুর্বলতা ও আবিলতার সৃষ্টি হয় প্রেমের মধ্যে। বিরহের তাপে বিশুদ্ধ ও বিদূরিত হবে সে সব আবিলতা ; পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের প্রেম।
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন অজ। তাঁর মনে হলো, পা দুটো কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তিনি। সমগ্র সসাগরা পৃথিবী হতে মূল্যবান ইন্দুমতীর অন্তরের যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন একদিন, সে সিংহাসন আজ বিপন্ন ও বিকম্পিত এবং সেখান থেকে নির্মমভাবে নির্বাসিত হচ্ছেন তিনি।
ইন্দুমতী বললেন, এই একটি বৎসর আপনি যথাযথভাবে সঙ্গ দান করবেন অন্যান্য মহিষীদের। সকলের প্রতি সমান কর্তব্য পালন করবেন। আমি দেখিয়ে দিতে চাই, আমার প্রেম সংকীর্ণ আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে দেয় না তার প্রেমাস্পদকে ; তাকে বৃহতের মধ্যে মুক্তি দেয়। প্রসারিত করে আত্মাকে যাতে সে তার সেই প্রসারিত আত্মার আলোকে নূতন করে দেখতে পারে জগতের সব মানুষকে।
ইন্দুমতী কথা শেষ করে থামলেন।
যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন অজ।
নীরবে তাঁর ডান হাতখানি স্বামীর দিকে প্রসারিত করে দিলেন ইন্দুমতী।
সেটিকে টেনে নিয়ে বারবার চুম্বন করলেন অজ। সেই হাতের চম্পককলিকা-তুল্য আঙুলগুলিকে তাঁর অবারিত অশ্রুধারাকে রোধ করবার জন্য চেপে ধরলেন দু চোখের উপর।
একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসলেন ইন্দুমতী। বললেন, অবোধ শিশুর মতো অকারণ

ব্যথাভারে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তুলবেন না মহারাজ। বিরহ কখনো দুঃখের নয়। মিলনের মতোই মানব জীবনে বিরহ এক সহজ সত্য। তাকে সহজ ভাবেই মেনে নিতে হবে।

প্রকৃতিজগতে একবার চেয়ে দেখুন, প্রভাতে মধুর সৌরকরস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়েছিল যে কমল, এখন সূর্যের বিরহে সে তার নয়নপল্লব মুদ্রিত করছে। ঐ দেখুন চুম্বনরত চক্রবাকমিথুন অন্ধকার আসন্ন দেখে দুঃসহ বেদনায় কাতর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

মিলনের আনন্দের মতো বিরহের এ বেদনাকে সহ্য করতেই হবে। প্রকৃতি জগতে যেমন রৌদ্রবৃষ্টি, দিবারাত্রি ও আলো-অন্ধকার, মানব জীবনে তেমনি এই বিরহ-মিলন এক অমোঘ চক্রাবর্তনে আবর্তিত হয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে মানুষের মনের। বিরহ না থাকলে একমুখী ও একদেশদর্শী হয়ে জীবনধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে মানুষের মন।

তাছাড়া সকল বিরহই হচ্ছে মৃত্যুর এক ক্ষুদ্রতর রূপ। ধীরে ধীরে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্য দিয়ে মৃত্যুজনিত অনন্ত বিচ্ছেদবেদনাকে সহ্য করবার তিল তিল শক্তি সংগ্রহ করি আমরা।

না না, আমি তা কিছুতেই পারব না ইন্দুমতী। তোমার মৃত্যুশোক কোনোদিন সহ্য করতে পারব না আমি।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন মহারাজ অজ।

কিন্তু অন্ধকারে তাঁর মুখখানাকে ঠিক মতো দেখতে পেলেন না ইন্দুমতী। উদ্গত ক্রন্দনে ভেঙে-পড়া মহারাজ অজকে সেই ঘনায়মান অন্ধকারে একা ফেলে রেখে অন্তঃপুরে চলে গেলেন ইন্দুমতী। গিয়ে তাপসীর বেশ ধারণ করলেন।

তাপসীর বেশে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হলো না অনিন্দ্যসুন্দরী ইন্দুমতীর অসাধারণ রূপলাবণ্য। একদিন ইন্দুমতীর কণ্ঠের চন্দ্রহার তাঁর চন্দনচর্চিত বক্ষের উপর লহরে লহরে গড়িয়ে পড়ে স্তনদ্বয়ের স্থূল ও সমুন্নত পার্শ্বদেশকে শোভিত করত। এখন সে চন্দ্রহার ত্যাগ করে সূর্যতাপবিশুষ্ক ভ্রমরকৃষ্ণ পদ্মবীজ দিয়ে গাঁথা জপমালা পরলেন কণ্ঠে।

এর আগে অপরাহ্ণ হতেই দাসীরা গন্ধদ্রব্য দ্বারা কেশবিন্যাস করে দিত ইন্দুমতীর। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতী তখন লাক্ষারাগে অধরোষ্ঠ ও কুঙ্কুম দিয়ে স্তনদেশ রঞ্জিত করতেন। একদিন তাঁর যে নিতম্ব মণিময় রসনায় শোভিত ও উজ্জ্বল হয়ে থাকতো, আজ তা মুঞ্জরচিত মেখলার কঠিন বন্ধনে পিষ্ট ও ম্লান হয়ে উঠল। একদিন যে রাজনন্দিনী ও রাজবধূ ইন্দুমতী অমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নকালে সামান্য কবরীস্খলিত একটি ফুলের আঘাতেও ব্যথা অনুভব করতেন, আজ ভূমিতলে হীন

পল্লবশয্যায় আপন ভুজলতায় মাথা রেখে শুয়ে পড়েন তিনি।
ইন্দুমতীর এই স্বেচ্ছাকৃত তপশ্চর্যায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরের সকলে। কিন্তু প্রতিবাদ করবার সাহস পেলেন না কেউ। সংযতবাক ও গম্ভীর ইন্দুমতী কঠিনতর গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে উঠলেন ক্রমশঃ।
এদিকে মহারাজ অজ কিন্তু কিছুতেই মনকে শান্ত ও সংযত করতে পারলেন না ইন্দুমতীর বিরহে। নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলেন না কোনো কাজে। তাঁর কাছে শূন্য ও অন্ধকার বলে মনে হলো সমস্ত জগতসংসার।
ইন্দুমতীর কথামত এক একজন মহিষীর কাছে একটি করে ঋতু যাপন করতে লাগলেন মহারাজ অজ। বাঞ্ছিত বল্লভসংলাভে এক অপরিসীম উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলেন মহিষীরা।
দিনের প্রথম দিকে রাজকার্য পরিচালনা করার পর কোনো এক নির্দিষ্ট মহিষীর অন্তঃপুরে চলে যান অজ। সেখানকার কৃত্রিম জলাশয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস পাখি খেলা করে। প্রতিটি সুরম্য ও প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বারুণীসেবনে মত্ত বরনারীরা নৃত্যগীত করে প্রীত করবার চেষ্টা করে মহারাজ অজকে।
মালব রাগ যেমন বিষাদ জাগায় মনে, কৌশিক রাগ তেমনি অনুরাগ বৃদ্ধি করে। তাই তারা কৌশিক রাগে গান করে। মধুর অথচ নিলাজ চটুল নর্তনে ফেটে পড়ে। মহারাজ অজ কিন্তু মালব রাগ গাইবার আদেশ দেন তাদের। যে বিষাদ প্রিয়জনের বিরহ বেদনাকে সযত্নে লালিত করে, ললিত করুণ মালব রাগের প্রতিটি সুরমূর্ছনায় মূর্ত হয়ে ওঠে সে বিষাদ। তাই মালব রাগ শুনতে ভাল লাগে তাঁর।
এভাবে আর বেশীদিন কাটাতে পারলেন না অজ। ইন্দুমতীর বিরহ ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তাই তিনি স্থির করলেন অমাত্যদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে মৃগয়া উপলক্ষে দূর বনে গিয়ে কাটিয়ে দেবেন বৎসরের বাকী দিনগুলো।
কিন্তু তার আগে ইন্দুমতীর সঙ্গে একবার দেখা করার প্রয়োজন বোধ করলেন।
দৌত্যকার্যে সুপটু কোনো দাসীর হাতে মনের কথা জানিয়ে একখানি লিপি পাঠালেন অজ। তারপর ইন্দুমতীর অন্তঃপুরের দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।
কিছুক্ষণ পর দাসী ফিরে এসে ইন্দুমতীর উত্তর-সম্বলিত এক প্রতি-লিপি দান করল তাঁর হাতে।
হতাশ হয়ে বসে পড়লেন মহারাজ অজ। ইন্দুমতী জানিয়েছেন, সংকীর্ণ প্রেমাসক্তি হতে যে কর্তব্যবোধকে বড় করে তুলে ধরবার জন্য তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠুর আদেশ দান করেছিলেন, সেই কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে মহারাজ হীন প্রেমমোহের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। মিথ্যা ও সংকীর্ণ প্রেমাসক্তি হতে প্রকৃত প্রেম কত বড়, কত মহৎ তা বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রেমের এই মহত্তর উপলব্ধির জন্যই কাছাকাছি থেকেও অনেক দূরে সরে যেতে বলেছিলেন তিনি মহারাজকে। কিন্তু অজ দূরে চলে যাচ্ছেন শুধু ইন্দুমতীর অনেক কাছে সরে আসবার জন্য।

ইন্দুমতী লিখেছেন আমার সমস্ত উদ্দেশ্যকে আপনি ব্যর্থ করে দিলেন মহারাজ। আমার ব্রত সাধনার সমস্ত একাগ্রতা, আমার তপস্যার সমস্ত তিতিক্ষার কোনো অর্থই রইল না আর। যদিও আপনি মৃগয়ার নামে বনে যাচ্ছেন তথাপি আপনার মন অনুক্ষণ আমার কাছেই পড়ে থাকবে। সেখানে গিয়ে সব কিছুর মধ্যে কেবলি আমাকেই দেখবেন, কেবলি আমার কথা ভাববেন। এমনি করে বিশ্বজগতের মাটি ও মানুষের সকল সম্পর্ক হতে নিজেকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিয়ে আমার চিন্তার মধ্যে সমস্ত প্রাণ মনকে কেন্দ্রীভূত করে এতখানি ছোট করে তুলবেন আপনি নিজেকে, এ আমি কল্পনাতেও আনতে পারি নি। একথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ি মহারাজ।

একটি বছরের মধ্যে মাত্র আর ছয় মাস বাকি আছে। এই ছয় মাসের বিরহ যদি সহ্য করতে না পারেন, তাহলে আমার মৃত্যু হলে আমার অনন্ত বিরহকে কেমন করে সহ্য করবেন মহারাজ? আপনার প্রেমে পরিমাণগত বিশালতা ও গভীরতা আছে, একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু তাতে গুণগত মহত্ত্ব নেই এক বিন্দু, একথা ভেবে দুঃখ অনুভব করি।

একান্তই যদি রাজপ্রাসাদে থাকতে না পারেন তাহলে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন এই কয় মাসের জন্য। কিন্তু যারই হাতে রাজ্যভার দিয়ে যান, রাজকার্যে এতটুকু যদি ত্রুটি ঘটে কোনোদিন তাহলে আপনাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।

আরও একটা কথা।

ইন্দুমতী লিপিখানি শেষ করতে গিয়ে পরিশেষে লিখেছেন, বনে গিয়ে আমাকে চারিদিকে বনপ্রকৃতির সঙ্গে এক করে দেখবেন। তাহলে কোনো অশান্তিই থাকবে না। অরণ্যের ছায়াঘন স্নিগ্ধতায় বনস্পতির সবুজ বিস্তারে ও বিটপীলতার মৌন কমনীয়তার সঙ্গে আমার রূপগুণকে যুক্ত করে ও আমাকে বড় করে দেখবেন। কিন্তু তা না করে চারিদিকের প্রকৃতি থেকে আমাকে ও আমার প্রেমকে যদি পৃথক করে দেখেন, তাহলে আপনি এবং আমি দুজনেই ছোট হয়ে যাব। আমাকে আপনি যত খুশি ভালবাসতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আমাকে এমনভাবে খণ্ড করে ও ছোট করে দেখবার কোনো অধিকার নেই আপনার। আমার বিনীত প্রার্থনা আমাকে যেন কোনোক্রমেই ভুল বুঝবেন না।

লিপিখানি পাঠ করে দাসীকে কাতরকণ্ঠে মিনতি জানালেন অজ, একবার কি এখন দেখা হবে না তার সঙ্গে?

মাথা নত করে সসম্ভ্রমে উত্তর করল দাসী, এখন সায়ংকাল উপস্থিত। দিবারাত্রির এই সন্ধিক্ষণে শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় পদ্মাসনে বসে সন্ধ্যাহ্নিক করেন মহারাণী। দেখা করে কোনো ফল হবে না মহারাজ।

দাসীর কথা শেষ হতেই ক্ষোভে ও রাগে সহসা গর্জন করে উঠলেন মহারাজ অজ। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগলো তাঁর।

গম্ভীর গর্জনে চীৎকার করে বললেন অজ, তোমার রাণীমাকে বলো, তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না। হয় আমি মৃগয়া থেকে আর ফিরব না, না হয়তো ফিরলেও তার সঙ্গে দেখা করব না। তার এই ধৃষ্টতাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না আমি।

দুটি আঙুল দিয়ে দুটি কর্ণকুহর চেপে ধরল দাসী।

অজ বললেন, আরো বলবে তার এই সব জপ তপ, ব্রত ও ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করি না আমি। তার ভণ্ডামি আমি এখন বুঝতে পেরেছি। আসলে আমাকে কোনো কারণে বরমাল্য দান করলেও মন দিয়ে রেখেছে অন্য কোনো পুরুষকে। আজ আমি তার কাছে অবাঞ্ছিত। আজ তার এই তাপসীর বেশধারণ অবাঞ্ছিতকে এড়াবার এক হীন অপকৌশলেরই নামান্তর। তার এই তপশ্চারণা আমার প্রতি এক ঘৃণ্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সভয়ে চীৎকার করে উঠল দাসী, একথা কানে শোনাও মহাপাপ মহারাজ।

পরদিন সকাল হতেই রথ প্রস্তুত করবার আদেশ দিলেন অজ।

বাইরে ঘোষণা করলেন দূর বনে মৃগয়া করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কোথায় কোন্ বনে কতদিনের জন্য, সে কথা কেউ জানল না। তিনি নিজেও জানেন না তা। যে প্রেম মানুষকে ঘরে বাঁধে, সেই প্রেম অনির্দিষ্ট অন্তহীন পথে ঠেলে দিয়েছে তাঁকে। জীবনে কোনো আগ্রহই নেই তাঁর।

ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়ে ইন্দুমতীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করছেন তিনি। ইন্দুমতী কোনোদিন ক্ষমা করবেন না তাঁকে। ইন্দুমতীর প্রেমকে হারিয়ে কিছুতেই বাঁচতে পারবেন না তিনি।

বনে গিয়ে কিন্তু মনের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন অনুভব করলেন মহারাজ অজ। যা ভয় করেছিলেন তা আর হলো না।

নর্মদা নদীর তীরে ঘন বনে বহু কৃষ্ণসার মৃগ পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের হাতে একটি মৃগও শিকার করলেন না অজ। কেবল আপন মনে ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলেন চারিদিকে।

সেখান থেকে মলয়পর্বতের নিম্নদেশে চন্দন ও লবঙ্গ বনতলে কিছুকাল বাস করলেন অজ। দিনে দিনে ইন্দুমতীকে অনেকটা ভুলে গেলেন। চারিদিকের নিসর্গসৌন্দর্যের সুনিবিড় সংস্পর্শে মনের পরিধিটা যতই প্রসারিত হতে লাগল, ইন্দুমতীর স্মৃতিটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠতে লাগল তত। বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যোপলব্ধির অপরিমেয় গভীরতায় বিলীন হয়ে যেতে লাগল সমস্ত বিরহ বেদনা।

অজ দেখলেন, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু স্বাধীন ও স্বয়ংসিদ্ধ। কারোরই জীবনের আনন্দ অন্য কোনো বস্তুর উপর নির্ভর করছে না। ঋজুশীর্ষ প্রতিটি বনস্পতি তার শাখাবল্লরী আন্দোলিত করে বনমর্মরে গান করছে মনের আনন্দে। উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ অটল অনমনীয় গাম্ভীর্যে নিয়ত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুভ্র ফেনপুঞ্জ-

বিহসিত সমুদ্র আপন সত্তার স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। নিপুণা নটীর মতো শিঞ্জিত নূপুরে আপন মনে নেচে চলেছে প্রতিটি নদী। কোনো মধুকরের অপেক্ষা না করেই প্রতিটি প্রস্ফুটিত ফুল হাসছে।

এরা কেউ কারো পথ চেয়ে বসে নেই। তিনিও আর ইন্দুমতীর কথা ভাববেন না। জীবনে বাঁচার আনন্দের জন্য ইন্দুমতীর উপর নির্ভর করবেন না।

আর একটা জিনিষ উপলব্ধি করলেন অজ। প্রেম জীবনকে পূর্ণতা দান করে, একথা সত্য। কিন্তু জীবন প্রেম হতে অনেক বড়। সৌন্দর্য ও প্রেমের আস্বাদনের দ্বারা আমরা জীবনকেই নূতনরূপে সম্ভোগ করি। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য সব কিছুর থেকে বড় হচ্ছে জীবন!

জ্যোৎস্নাবিধৌত চন্দন বনে যখন মলয় বাতাস খেলা করতে থাকে, ওদিকে বায়ুতাড়িত লবঙ্গ গাছ হতে কেশর ঝরে পড়ে, তখন অজের মনে হয় তিনিও যেন জোৎস্নার মতোই পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট বিমল হাসিতে ফেটে পড়েন। তখন ভাবতে থাকেন, সৌন্দর্য শুধু মানুষের দেহেই নেই, প্রেম শুধু মানুষের মনে নেই। বিশ্ব প্রকৃতির যে-কোনো বস্তুর মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। যে-কোনো বস্তুকেই মানুষ ভালবাসতে পারে।

ফিরবার পথে বহু গ্রাম ও জনপদ পেলেন অজ। গ্রামবাসীরা কত দরিদ্র; কিন্তু সরল অনাড়ম্বর তাদের জীবন সমস্ত রকমের জটিল চেতনা হতে মুক্ত। কাছে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দান করলেন অজ।

এর আগে রাজসভায় বসেও বহু দরিদ্রকে অনেক কিছু দান করছেন অজ। কিন্তু সে দানের মধ্যে দয়ার ছদ্মবেশে এক মানসিক ভাববিলাস ছিল লুকিয়ে; সত্যিকারের কোনো সমবেদনার লেশমাত্র ছিল না। সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থভাবে জনজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করে দেবার কোনো সকরুণ প্রবণতা ছিল না সে দানের মধ্যে।

আজ সত্যি সত্যিই জীবন ও জগৎকে নূতনরূপে দেখতে শিখলেন অজ।

আজ প্রশান্ত আত্মোপলব্ধির সুগভীর স্বচ্ছতায় জীবনের যে সমগ্ররূপ দেখতে পেলেন অজ তার কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হলো তাঁর। তাঁর মনে হলো, জীবনের এই অখণ্ড ও মণ্ডলাকার রূপের কথা ভুলে গিয়ে তার শুধু একটা খণ্ড অংশকেই সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিলেন তিনি।

ইন্দুমতীর কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন অজ। কখন বসন্ত এসে দিকে দিকে ফেটে পড়েছে কিংশুক ও কৃষ্ণচূড়ার উচ্ছ্বসিত হাসিতে, মঞ্জুলমঞ্জরী আম্র-মুকুলের গন্ধে আর নবোদ্ভিন্ন আরক্ত পল্লবনিচয়ে, সেদিকে এতদিন কোনো খেয়ালই করেন নি।

সত্যই কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন মহারাজ। রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন ইন্দুমতী একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে

পারেন নি। ভাবতেই পারেন নি এতদিনের বিরহ বেদনার যত কিছু সন্তাপ এই স্বয়ংগ্রহাশ্লেষ সুখের স্নিগ্ধ সমাগমে বিলীন হয়ে যাবে নিঃশেষে।

দেহে মনে কোথাও এতটুকু উচ্ছলতা নেই মহারাজ অজের। প্রশান্তগম্ভীর মুখমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সমাহিত সংযত চিত্তের ভাবাবস্থা।

উত্তম বস্ত্রালংকারে ভূষিতা ইন্দুমতী বললেন, আমার ব্রতসাধনা এতদিনে সার্থক হয়েছে মহারাজ।

অজ বললেন, আজ আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর ইন্দুমতী। তোমাকে তখন বুঝতে পারি নি ; তোমার প্রেম সত্যিই মহৎ। তোমার সেই মহৎ প্রেমের স্পর্শে আমি আমার আত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আর সেই আত্মোপলব্ধির আলোকে দেখতে পেয়েছি জীবনের প্রকৃত রূপ।

সঙ্গে করে স্বামীকে তাঁর অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন ইন্দুমতী।

অজ বললেন, যে প্রেম বিরহের দ্বারা প্রতিহত হয় না এমনি করে, সংযমের দ্বারা শাসিত হয় না, সে প্রকৃত প্রেম নয়।

অপরাহ্নের দিকে একটি বছর পর প্রাসাদ উদ্যানের সেই সরোবরের সোপানশ্রেণীতে গিয়ে বসলেন দুজনে। দীর্ঘদিন পর বিধিনিষেধের সমস্ত অর্গল আজ মুক্ত, সংযমের সমস্ত বাঁধ আজ অপসারিত। আজকের এই দিনটি বড় মধুর বলে মনে হলো দুজনের কাছে।

এক নিবিড়তম মিলনোচ্ছ্বাসে কথায় কথায় হাসিতে ফেটে পড়তে লাগলেন দুজনে। ইন্দুমতীর কী একটি কথায় সোনার শতদল নিয়ে অজ তাঁকে মৃদু প্রহার করলেন ও তাঁর দেহকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে এক নিষ্ঠুর চুম্বনের দ্বারা পিষ্ট করে দিলেন তাঁর অধরোষ্ঠকে।

ইন্দুমতী ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সরোবরের জলে। অজও তাঁকে ধরবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁদের উচ্ছল কলহাসিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ক্রৌঞ্চকলরব-মুখরিত পদ্মপরাগগন্ধী সরোবরের কজ্জলায়িত জলরাশি। জলকেলির পর উঠে দুজনেই কল্পতরুপ্রসূত রক্তাভ সুরা পান করলেন।

সুরাপানে দেহে মনে বিকার দেখা দিতে লাগল প্রথমে ইন্দুমতীর। ক্রমে অঙ্গ যখন অবশ হয়ে উঠল, ঘূর্ণিত হতে লাগল তাঁর নেত্র, বিজড়িত হয়ে এল বাক্যস্ফুরণ, অজ তখন শিথিলতনু ইন্দুমতীকে ধরে মণিময় প্রস্তরনির্মিত রতিমন্দিরে প্রবেশ করলেন। শরতের শুভ্র মেঘশয্যায় চন্দ্র যেমন রোহিণীকে নিয়ে শয়ন করেন, তেমনি স্বর্ণ-পালংকের উপর সুদৃশ্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় ইন্দুমতীর পাশে শয়ন করলেন অজ।

দশ মাস দশ দিন পর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন ইন্দুমতী। অজ তার নাম

রাখলেন দশরথ। বিপুল আনন্দে নৃত্যগীতসহকারে এই রাজতনয়ের জন্মমহোৎসব পালন করল রাজ্যের প্রজারা। বাদ্যমান দুন্দুভির সঙ্গে মিশ্রিত হলো গভীর শঙ্খধ্বনি, স্বরলংযন্ত্রের সঙ্গে সূক্ষ্মমধুর বীণাধ্বনি। সন্তানক কুসুমের মালা দ্বারা শোভিত হলো স্বর্ণতোরণ। পুত্রগর্বে গরবিনী ইন্দুমতী যদির এক্ষণায় উপেক্ষা করতে লাগলেন মহারাজ অজকে।

মহারাজ অজ ভাবলেন, দিনে দিনে ইন্দুমতী যেন দূরে সরে যাচ্ছেন তাঁর কাছ হতে। আজ তার জীবনে সন্তানই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড়। যৌবনবতী সুন্দরী ইন্দুমতীর মদমত্ত রক্তের সমস্ত রঙীন উচ্ছ্বাস তার স্তনদ্বয়ের মাতৃদুগ্ধের মধ্যে লাভ করেছে যেন এক শুচি-শুভ্র প্রগাঢ়তা।

ইন্দুমতী বললেন, আমাদের নিবিড়তম মিলনমুহূর্তের চরমতম তৃপ্তি এক দুর্লভ রক্তপদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে এই সন্তানের মধ্যে। এই সন্তান হচ্ছে আমাদের মিলিত সত্তা। এর জীবনপদ্ম আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে প্রাণনালীর বীজ, আমার রক্তমাংস হতে নিয়েছে দেহের জৈবিক ধাতু। এর মধ্যে দিয়ে আপনি আমাকে পাবেন নূতন রূপে। নূতন রূপে আমি পাব আপনাকে।

এমনি করে দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। কখনো স্খলিত কম্পিতলীলাগতি দ্বারা, কখনো নির্মল হাস্যচ্ছটায়, কখনো বা অর্থশূন্য অসংলগ্ন শব্দস্ফুরণে পিতামাতাকে প্রীত করতে লাগলেন সেই শিশু।

একদিন জ্যোৎস্নালোকিত একটি বসন্ত সন্ধ্যায় প্রাসাদ উদ্যানে বসে থাকতে থাকতে অজ ও ইন্দুমতী দুজনেই কামবিমোহিত হয়ে উঠলেন সহসা। পূর্ণচন্দ্র-প্রতিবিম্বিত মারুতহিল্লোলবিকম্পিত পদ্মপরাগগন্ধী সেই সরোবরের জলে দুজনেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরালদম্পতীর মতো কেলি করতে লাগলেন একমনে।

সেই মুহূর্তে সূর্যসমপ্রভ দেবর্ষি নারদ দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাতটবর্তী কোনো এক স্থানে দেবাদিদেব মহাদেবকে বীণাযন্ত্রসংযোগে আরাধনা করবার জন্য সেই সরোবরের উপর দিয়ে আকাশপথে গমন করছিলেন। সেই বীণাযন্ত্রের শীর্ষদেশে ছিল স্বর্গীয় পারিজাত কুসুমগ্রথিত একছড়া সুরভি মালা। সহসা মধুগন্ধা সেই দিব্যমালিকা বায়ুভরে স্থানচ্যুত হয়ে উড়ে এসে পড়ল জলকেলিরতা ইন্দুমতীর বিশাল স্তনাগ্রভাগে। নিমেষ মধ্যে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো অসাড় ও মলিন হয়ে পড়লেন ইন্দুমতী। আশ্চর্য বিকার দেখা গেল তাঁর দেহে।

এদিকে ইন্দুমতীর এই আকস্মিক ভাবান্তরে বিস্মিত হয়ে মহারাজ অজও তাঁর কাছে গেলেন। ইন্দুমতীর অঙ্গ তখন অবশ হয়ে উঠেছে। হাতের মুঠোয় সেই মালাটি কোনোরকমে ধরে বললেন, নারদঋষির বীণাচ্যুত এই পারিজাত মালা। অশুচি অবস্থায় কোনো মানুষ স্পর্শ করলেই তার মৃত্যু ঘটবে। আমি স্বর্গে চলে যাচ্ছি। আমার সময় হয়েছে। আপনি এখন রাজকার্য পরিচালনা করুন। জীবনাবসানের পর স্বর্গে মিলিত হবো আমরা।

করুণ কান্নায় ভেঙে পড়লেন অজ। ইন্দুমতীর দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তাঁর শিথিল হাতের মুঠো হতে মালাছড়াটি কেড়ে নিয়ে নিজের কণ্ঠে পরলেন অজ। নীরবে অজকে বুকে টেনে নিলেন ইন্দুমতী। খবর পেয়ে মহামুনি বশিষ্ঠ ছুটে এলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের স্মরণীয় দুটি প্রতিমূর্তিরূপী আলিঙ্গনাবদ্ধ সেই রাজ-দম্পতিকে দেখে অশ্রুরোধ করতে পারলেন না বশিষ্ঠ।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তা



প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে শুধু অঙ্গদেশ নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই যেন জ্বলছে। গ্রীষ্ম অপগত হয়ে কখন বর্ষা এসেছে; তবু রক্ত কুরুবক বা কদম্ব গাছে ফুল ফোটে না। নদীর জলে ঢেউ দেয় না। দক্ষিণের সুমেরু পর্বত হতে মলয় বাতাস বয়ে আসে না। বর্ষার মেঘহীন নীলাকাশ হতে জল বর্ষিত হয় না; সূর্য শুধু অগ্নিবৃষ্টি করে।

রাজপ্রাসাদের একটি শীতল কক্ষের গবাক্ষ থেকে রাজকুমারী শান্তা চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন আর দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যায়। মাঝে মাঝে কাঁদতে ইচ্ছা করে শান্তার। মনে হয় তাঁর অফুরন্ত অশ্রুর প্লাবন দিয়ে দগ্ধ পৃথিবীর সব জ্বালা জুড়িয়ে দেন। সারা রাত্রির মধ্যে একটুও ঘুম আসে না তাঁর। শুক্লা তিথিতে চাঁদের আলোয় জ্বালা অনুভব করেন আর কৃষ্ণাতিথিতে মেঘহীন আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র এক একটি অগ্নিস্ফুলিংগ হয়ে বিঁধতে থাকে যেন তাঁর বুকে।

একদিন সকালে দাসীর কাছে অদ্ভুত একটা কথা শুনলেন শান্তা। শুনে বিস্মিত এবং বেদনার্ত দুইই হলেন। রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এই ভয়ংকর অনাবৃষ্টির জন্য রাজা লোমপাদকেই দোষ দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, রাজকন্যা ঋতুমতী হওয়া সত্ত্বেও রাজা অনূঢ়া রেখে দিয়েছেন তাঁকে। ঋতুমতী কন্যাকে অনূঢ়া রেখে দেওয়া ভ্রূণহত্যার মতোই মহাপাপ। রাজা কোনো পাপ করলে রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের উপর সে পাপ অর্শায়। তাই আজ রাজার পাপেই রাজ্যের এই ঘোর দুরবস্থা।

বেদনায় অস্থির হলো শান্তার হৃদয়। সখীদের সব বিদায় করে দিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এক নিদারুণ প্রখরতায় তাঁর বুকের ভিতরটা জ্বলছে। কিন্তু শুধু মন জ্বললেই হবে না, যে জ্বালায় সমস্ত দেশ জ্বলছে সেই জ্বালা সারা অঙ্গে মেখে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যেতে চান তিনি। শান্তা ঠিক করে ফেললেন, আজই গভীর রাত্রিতে সকলের অলক্ষ্যে জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

সহসা শান্তা দেখলেন, রাজা লোমপাদ স্বয়ং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ঘরের বাইরে। শশব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে পিতার চরণবন্দনা করলেন শান্তা। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি যা বলবেন আমি তা জানি মহারাজ। আমি বুঝতে পেরেছি আমার জন্যই দেশের এই ঘোর দুরবস্থা। তাই আমি আর এই অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না।

কাছে সরে গিয়ে শান্তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে রাজা বললেন, না মা, আমি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলতে এসেছি তোমায়। জ্যোতিষীরা বলছেন, এই ভয়ংকর অনাবৃষ্টির হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর একটি মাত্র উপায় আছে এবং সেই উপায়ের সার্থকতা নির্ভর করছে একমাত্র তোমার উপর।

অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলেন শান্তা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি আগেই বলেছি পিতা, আমার এই অভিশপ্ত জীবনে আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমায় কি করতে হবে বলুন। দেশকে বিপদ হতে উদ্ধার করবার জন্য

আমি আমার এ জীবন যে-কোনো মুহূর্তে হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারি।
আশ্বস্ত হলেন রাজা লোমপাদ। তারপর খুশি হয়ে বললেন, তার প্রয়োজন হবে না মা। তুমি হয়ত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নাম শুনে থাকবে। বিভাণ্ডক মুনির একমাত্র পুত্র মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ। নর্মদা নদীর তীরে তাঁর তপোবন। মুনির ঔরসে কোন্ এক হরিণীর গর্ভে হতে তাঁর জন্ম হয় বলে তিনি রূপে গুণে ঋষিকুমারতুল্য হলেও মাথার দুই পাশে দুটি ক্ষুদ্র মৃগশৃঙ্গ আছে। রাজজ্যোতিষীরা ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলেছেন, সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এ রাজ্যে না আনলে অনাবৃষ্টি ঘুচবে না। আমি তাই মনস্থ করেছি তাঁকে এখানে সসম্মানে এনে তোমার সঙ্গে তাঁকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করব।
শান্তাও অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, এ তো সুখের কথা মহারাজ। এর জন্য আপনি কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন? আমি দেশের মঙ্গলের জন্য পশুশৃঙ্গযুক্ত ঋষিকুমার কেন স্বয়ং পশুকেও বিবাহ করতে পারি। আপনি কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করুন।
হৃষ্টমনে ফিরে যাচ্ছিলেন রাজা লোমপাদ। তবু একবার ঘুরে এলেন। শান্তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমার শুধু একটা বিষয়ে কুণ্ঠা হচ্ছিল মা। তুমি বিবাহযোগ্যা হয়েছ বলে আমি স্বয়ংবর সভার কথা ভাবছিলাম। কত রূপবান রাজপুত্র তোমার পাণিপ্রার্থী। কিন্তু তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করে পশুশৃঙ্গযুক্ত একজন তপস্বীকে গ্রহণ করতে কী করে বলব তোমায় তাই ভাবছিলাম।
শান্তা একটুখানি হাসলেন। এক সকরুণ মূর্ছনায় রক্তরাঙা সে হাসি। তাঁর ঘনকৃষ্ণ বিশাল অক্ষিযুগলের দুই কোণে সেই হাসির দুটি ক্ষীণ রেখা কাঁপতে লাগল। তিনি মুখ তুলে বললেন, আপনি আমায় এতদিন ধরে যে শিক্ষা দিয়েছেন সে কি মানুষকে তার উপরের রূপ দেখে বিচার করবার শিক্ষা?
আনন্দ ও লজ্জায় মুখ থেকে কথা বেরোল না লোমপাদের। তিনি বুঝলেন, শান্তা সাধারণ মেয়ে নয়। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র পাঠ করে তার নীতিজ্ঞান হয়ে উঠেছে প্রখর। মাথা হেঁট করে রাজা সেখান থেকে রাজসভায় চলে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন মন্ত্রীদের সঙ্গে।

সেদিন রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হলো শান্তার। এক বড় রকমের দুশ্চিন্তার ভার হতে মুক্ত হলেন তিনি। অনেক দিন ধরে আকাশে মেঘ দেখেন নি শান্তা। সবুজের চিহ্ন দেখতে পান নি মাটিতে। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই শ্যামলবরণ মেঘে মেঘে ছেয়ে উঠবে ঐ জ্বলন্ত তাম্রবর্ণ আকাশখানা। শীতল বৃষ্টিধারা ঝরে পড়বে তাপদগ্ধ মাটির উপর। দিকে দিকে শুকিয়ে যাওয়া প্রাণ সজীব হয়ে উঠবে আবার। আনন্দে চোখে জল এলো শান্তার।
স্বেচ্ছায় সব ভোগ সুখ ত্যাগ করলেন শান্তা। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যতদিন না সেই পুণ্যাত্মা ঋষিকুমার এসে পৌঁছবেন এই রাজ্যে, নবজলধারায় সিক্ত না হয়ে উঠবে

এ দেশের তৃষ্ণার্ত ভূমি ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।
কিন্তু কিভাবে আনা যায় তা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন রাজা লোমপাদ। অনেকে বলল, জন্মের পর হতে কোনো নারী দেখেন নি ঋষ্যশৃঙ্গ। স্ত্রী পুরুষে ভেদ জানেন না তিনি। সুতরাং কোনো সুন্দরী নারী দেখে তাঁর পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বভাবিক। বিভাণ্ডক মুনির অনুপস্থিতিতে আশ্রমে গিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করে আনবার জন্য রাজ্যের সুন্দরী বারবনিতারা মনোহর বেশভূষা পরে রওনা হলো।
শান্তা কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এই ব্যবস্থায়। উদ্দেশ্য পূরণ করতে চান না তিনি। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি এক কঠোর ব্রতচারিণীর বেশে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন সেই ঋষিকুমারকে। বৃদ্ধ বিভাণ্ডককে লুকিয়ে তাঁর শেষ বয়সের সম্বল একমাত্র সন্তানকে চুরি করে নয়, গুণের দ্বারা পিতাকে মুগ্ধ ও বিনয়ের দ্বারা বশীভূত করে তাঁর কাছ থেকে তাঁর পুত্রকে ভিক্ষা করে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। নারীদেহের লোভনীয়তা, রূপের জৌলুস ও অলংকারের আতিশয্য দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের মনকে কৌশলে ভুলিয়ে আনতে চান নি তিনি; তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অখণ্ড অন্তরের অনন্ত প্রেমসাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁর হৃদয়কে জয় করে আনতে।
কিন্তু তিনি যা চেয়েছিলেন তা আর হলো না। লজ্জায় তাঁর মনের কথা বলতে পারেন নি কাউকে। তাছাড়া মনের একটা গোপন আশা আর আনন্দ একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেল শান্তার। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গই পৃথিবীতে একমাত্র পুরুষ যিনি জন্মের পর হতে কখনো কোনো নারীমুখ দেখেন নি, কোনো নারীদেহ স্পর্শ করেন নি। এই ধরনের এক পুরুষকে প্রথম পাবার সৌভাগ্য হবে তাঁর। তিনিই হবেন ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে প্রথম নারী যাকে তিনি প্রথম দেখবেন; প্রথম স্পর্শ করবেন; প্রথম ভালবাসবেন।
নবজাত শিশুর মতো সরল পূতচিত্ত এক পুরুষ এসে তাঁর শুচিশুদ্ধ দেহের আজন্ম-সঞ্চিত শক্তি আত্মার সমস্ত সম্পদ সুষমা দিয়ে তিলে তিলে পূর্ণ করে তুলবে তাঁকে। একথা ভাবতেই অনাস্বাদিতপূর্ব এক গর্ব ও গৌরব অনুভব করতেন শান্তা।
এখন আর কোনো উপায় নেই। অভিমানে তাঁর চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাঁর এই নিবিড় অব্যক্ত অভিমান, নিষ্ফল বেদনার কথা কাকে তিনি বলবেন। এখন আর বলেও কোনো ফল হবে না।
পর পর তিনটি দিন কেটে গেল। দিনেতে আতপান্ন আর রাত্রিতে কিছু ফলমূল আহার করে স্বর্ণপর্যঙ্ক ছেড়ে ভূমিতলে শয়ন করতে লাগলেন শান্তা।
সহসা একদিন গভীর দ্বিপ্রহরে অসংখ্য শঙ্খ বেজে উঠল একসঙ্গে। মুহুর্মুহু হুলু-ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সমস্ত আকাশ বাতাস। এক বিরামহীন ব্যস্ততায় উন্মত্ত হয়ে উঠল সমগ্র রাজধানী। সেই আশ্চর্য ঋষিকুমার এসে গেছেন। একজন সখি এসে খবর দিল স্বয়ং রাজা লোমপাদ অমাত্যদের নিয়ে নগরপ্রান্তে এগিয়ে গেছেন তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে নিয়ে আসতে।

চারিদিকে সবাই ছুটোছুটি করছে। প্রাসাদশীর্ষ ও গবাক্ষপথ হতে রাজঅন্তঃপুরবাসিনীরাও একদৃষ্টে পথপানে চেয়ে আছেন। একমাত্র শুধু শান্তার মধ্যেই কোনো চঞ্চলতা নেই।

শুয়ে ছিলেন। সখির কথায় উঠে বসলেন শান্তা। তারপর স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে দেওয়ালের উপর টাঙ্গান একটি মৃগশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। রাজা নিজে একদিন এ মৃগটিকে বন হতে শিকার করে এনেছিলেন। ঐ শৃঙ্গযুক্ত একটি অদ্ভুত মানুষের অংকশায়িনী হতে হবে তাঁকে। ভাবতেই ভয়ে শিউরে উঠলেন শান্তা।

আরও হয়তো অনেক কথাই ভাবতেন শান্তা। কিন্তু এক প্রবল মেঘগর্জনে সচকিত হয়ে উঠলেন সহসা। বাইরে চেয়ে দেখলেন, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমেছে আকাশের প্রতিটি দিগন্তে। স্নিগ্ধ বাতাস বইতে শুরু করেছে। একটু পরেই বৃষ্টি আসবে। বহুআকাঙ্ক্ষিত বহু প্রতীক্ষিত প্রাণসঞ্জীবনী বৃষ্টিধারা।

মুহূর্তে সমস্ত ভয় ভাবনা কোথায় উবে গেল শান্তার। ভয় পরিণত হয়ে উঠল ভালবাসায়। ভাবনা হলো প্রেমসাধনা। যাকে একটু আগে ভয় করছিলেন এখন তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হলো সব চাইতে বেশী। বক্রকুটিল মৃগশৃঙ্গকে মনে হলো, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বস্তু। ধূসর মেঘপুঞ্জে, তাম্রবর্ণ পর্বতশিখরে, শ্যামল বৃক্ষশাখায় শুধু আশ্চর্য সুন্দর এক মৃগশৃঙ্গ দেখতে লাগলেন যেন তিনি।

তিনদিন রাজা লোমপাদের বিশেষ অতিথি রূপে রইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তিন দিনই থেকে থেকে প্রবল বর্ষণ হলো। চতুর্থ দিনে ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে শান্তাকে সম্প্রদান করলেন রাজা। বিয়ের যৌতুক স্বরূপ রাজধানীর বাইরে কয়েকটি গ্রাম দান করলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে।

বীভৎস কিছু একটা দেখবার ভয়ে শুভদৃষ্টির সময় চোখ খুলছিলেন না শান্তা। এদিকে শান্তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পানে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। শ্যামবর্ণা শান্তা খুব একটা সুন্দরী নন, কিন্তু তাঁর চোখ মুখ বড় সুন্দর। মৃগলোচনা শান্তার ভ্রূভংগিমাটি বড় লীলায়িত। রুক্ষকঠোর ব্রতচারিণী আলুলায়িতকেশা বিশালাক্ষী শান্তার এক আশ্চর্য রূপের রহস্যে সমস্ত মন প্রাণ যেন নিঃশেষে ডুবে গেল ঋষ্যশৃঙ্গের। এর আগে যে সব সুন্দরী নারী তিনি দেখেছেন অর্থাৎ যারা তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে, তারা বড় চঞ্চল আর চটুল।

শান্তার মতো তারা সৌম্য শান্ত এবং গম্ভীর নয়। তাদের রূপ বিস্ময় আর এক জারজ লালসা জাগিয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গের মনে। শান্তার রূপ এক গভীর প্রেমবোধ জাগাল তাঁর অন্তরে। তারা মায়াবিনী, হাতছানি দিয়ে দূরে টেনে নিয়ে যায়। শান্তা প্রেমপ্রদায়িনী, প্রেমোপলব্ধির গভীরে নিয়ে গিয়ে মন প্রাণকে সংহত করে। সেই সব নারীদের দেখে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে; আজ শান্তাকে দেখে আবার ঘর বাঁধতে ইচ্ছা হলো তার।

এদিকে ভয়ে ভয়ে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে শান্তাও মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি যা ভয় করছিলেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর মনে হলো যে কোনো রাজপুত্র হার মেনে যাবে ঋষ্যশৃঙ্গের রূপের কাছে। তপ্ত কাঞ্চনের মতো গৌরকান্তি। এক অপরূপ জ্যোতিতে সমস্ত মুখমণ্ডল স্বতোদ্ভাসিত। ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ চূড়ার আকারে মাথার উপর বাঁধা। কপালের দুপাশে অতিশয় ছোট আকারের মৃগ-শৃঙ্গতুল্য দুটি পদার্থ। তার জন্য মুখশোভা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি তাঁর।

তাঁর ভুল ধারণার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলেন শান্তা।

পরদিন কালরাত্রি বলে দুজনকেই পৃথক থাকতে হলো। কোনো কথা হলো না।

ফুলশয্যার দিন সকাল হতে ফুল নিয়ে সখিদের সঙ্গে খেলা করতে লাগলেন শান্তা। দুদিন আগে সারা দেশে কোথাও ফুল পাওয়া যাচ্ছিল না। আর আজ সখিরা কোথা হতে অজস্র ফুল নিয়ে এসে শান্তার ঘরখানিকে ভরে দিয়েছে। আজ চারিদিকে গাছে গাছে সবুজের সমারোহ আর ফুলের সুষমা। স্বামীর প্রতি এক গভীর প্রণয়াসক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক নিবিড় শ্রদ্ধা অনুভব করছিলেন শান্তা।

সন্ধ্যা হতে নিজের ঘরে স্বামীর প্রতীক্ষায় একমনে বসেছিলেন শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গ ঘরে ঢুকতেই তাঁর পায়ে মাথা রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

ব্যস্ত হয়ে শান্তার চিবুকে হাত দিয়ে তাঁকে তুলে নিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তপস্বিনীর বেশে শান্তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি আমায় প্রণাম করে লজ্জা দিও না। তোমার স্থান তো আমার পায়ে নয়, তোমার স্থান বুকে। তুমি আমার শ্রীচরণের দাসী নও, তুমি আমার অন্তর-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

ব্রীড়াবনত মুখ না তুলেই অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে শান্তা বললেন, আপনি তো শুধু আমার স্বামী নন, আপনি আমাদের সমগ্র দেশের স্বামী, এক মহাতেজা পুণ্যাত্মা পুরুষ যিনি এই বন্ধ্যা বিশুষ্ক দেশকে ফলে ফুলে ভরে দিয়েছেন, মৃত্যুর মাঝে এনেছেন জীবনের প্রবাহ, শূন্যতার মাঝে পূর্ণতা।

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়েই ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, কিন্তু রাজকন্যা হয়েও তোমায় এমন ব্রতচারিণী দেখছি কেন আর্যা?

কারণ রাজঐশ্বর্যের দ্বারা কখনো ঋষিকুমারের অন্তর জয় করা যায় না, তাঁকে তপস্যার দ্বারা তুষ্ট করতে হয়। সাধনার দ্বারা তাঁকে আপন করে নিতে হয়। কঠোর ব্রতচারণার দ্বারাই তাঁকে কাছে পাওয়া যায় এই ছিল আমার ধারণা।

লজ্জায় মুখখানা তেমনি নামিয়ে রইলেন শান্তা।

শান্তার লজ্জাবনত মুখখানিকে তুলে ধরলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। বললেন, আর তোমার সে সাধনার প্রয়োজন নেই শান্তা। এবার আমি তোমায় সালংকারা ও উত্তম বেশভূষায় ভূষিতা দেখতে চাই।

মুহূর্তে সেই পুরনো অভিমানটা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল শান্তার বুকের মধ্যে। তিনি

আস্তে আস্তে ঋষ্যশৃঙ্গের আলিংগন থেকে নিজেকে মুক্ত করে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবতে লাগলেন, তবে কি সেই বারবনিতাদের সংস্পর্শে এসে দেহমনের শুচিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের? নির্লোভ নিষ্কলুষ চিত্তে জেগেছে ঐশ্বর্যের লালসা?

ঠিক এই ভয়ই করছিলেন শান্তা। নিবিড় হতাশায় ও অভিমানে চোখে জল এলো তাঁর। ব্যর্থ হলো তাঁর এতদিনের ব্রতসাধনা।

রাজদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হলো। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত।

বিছানায় শুতে যাবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ এসে অনুরোধ করলেন শান্তাকে। শান্তা কোনো কথা বললেন না। বাইরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জ্বলতে থাকা মখমল পোকা দেখতে লাগলেন একমনে।

শান্তার এই ভাবান্তরে কিছুটা বিস্মিত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কিন্তু তার কোনো কারণ জানতে চাইলেন না। নীরবে গিয়ে একা শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে একবার তাকালেন শান্তা। বৈদুর্যমণি-খচিত স্বর্ণপালংকের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা। তার উপর অসংখ্য ফুল ছড়ানো। পাশে গন্ধতৈলপূর্ণ একটি স্বর্ণপ্রদীপ। বিছানার একপাশে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন ঋষ্যশৃঙ্গ।

একবার শান্তা ভাবলেন, সমস্ত রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়বেন। নিবিড় নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণে ঢলে পড়বেন ঋষিকুমারের বিস্তৃত বুকে। ভাবলেন, বারবনিতাদের প্রলোভনে হয়তো কেবলমাত্র মনের উপরিপৃষ্ঠটাই কিছুটা বিচলিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের; কিছু চিত্তের শুচিতা বা অন্তরের মহত্ত্ব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি তাঁর।

তবু মনকে বোঝাতে পারলেন না শান্তা। সুন্দর ফুলশয্যাকে মনে হলো কলুষিত কণ্টক শয্যা।

জানালার ধারে সেই জায়গাটিতে এসে বসে পড়লেন। তন্দ্রা এসেছিল শেষ রাত্রিতে। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ তার আগেই ঘুম থেকে উঠে চলে গেছেন।

আজ সকাল থেকে আকাশ বেশ নির্মল। স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছে সারা পৃথিবী।

আজ ঋষ্যশৃঙ্গের কথামতো নিজেকে উত্তম বেশভূষায় ভূষিত করলেন শান্তা। সারা অপরাহ্ণ ধরে পরিপাটি করে কেশবিন্যাস করলেন সখিদের সাহায্যে।

সারাদিন রাজদরবারেই থাকতে হলো ঋষ্যশৃঙ্গকে। অন্তঃপুর দিয়ে একবারও আসবার সময় পেলেন না। দূর গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে অজস্র লোক আসছে দলে দলে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে।

প্রদোষকাল উত্তীর্ণ হতেই শান্তা শয়নকক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রাজোদ্যানের পিয়াশাল বনে তখন অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। ঝিল্লীস্বনিত অন্ধকার বনে জোনাকী

জ্বলছে। মনে মনে ঠিক করলেন শান্তা, আজ সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবেন ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ এলেন ঠিক রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হলে। ঘরে ঢুকেই একবার শুধু শান্তার পানে অথপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি একবার দেখে নিলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আজ আর শান্তাকে কোনো অনুরোধ করলেন না শুতে যাবার জন্য।

এদিকে ঋষ্যশৃঙ্গ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বটা জেগে উঠল শান্তার মধ্যে। একদিকে প্রবল আত্মাভিমান আর অন্যদিকে আত্মসমর্পণের এক প্রণয়াকুলিত ব্যাকুলতা। কি করবেন কিছু ভেবে পেলেন না শান্তা। পালংকের দিকে একবার এগিয়ে গেলেন।

একবার ভাবলেন স্বামীর বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে তিনিও অমনি করে ঘুমিয়ে পড়বেন। দেহের চেয়ে মন কি বড় নয়! ক্ষণিকের ভুলে দেহটা অশুচি হয়ে পড়লেও মনটা ঋষ্যশৃঙ্গের আজও সরল ও নিষ্কলুষ রয়ে গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারলেন না শান্তা। আত্মসমর্পণের সমস্ত ব্যাকুলতাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে সেই আত্মাভিমানটাই জয়ী হলো তাঁর মধ্যে। ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে চলে এলেন। যে দেহ বারবনিতারা একবার স্পর্শ করেছে সে দেহকে তিনি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবেন না।

মুক্ত বাতায়নপথে আকাশের তারা দেখা যায়। রাত্রি তখন গভীর। মাথার উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। বাইরে তেমনি নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এক দুঃসহ দ্বন্দ্বে অন্তরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল শান্তার। তাঁর এই মনের কথা কার কাছে বলবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যদি রাজার কাছে সব কথা বলে দেন তবে তিনি কোন্ মুখে দাঁড়াবেন রাজা লোমপাদের কাছে? কী কৈফিয়ৎ দেবেন তাঁর পুরনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের?

সকলে ভাববে স্বামীকে পছন্দ হয় নি শান্তার। অথচ তাঁকে নির্বিবাদে মনে-প্রাণে গ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। শান্তা বিশ্বাসঘাতিনী।

তাঁর এই নিঃসঙ্গ বেদনা ও নিবিড় মান-অভিমানের কথা কাউকে জানাতে পারবেন না শান্তা। তাঁর এই দুঃখ কেউ বুঝবে না। তাই যে কথা কেউ জানল না, সে কথাকে দূরে আকাশের প্রতিটি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিতে চাইলেন শান্তা। যে দুঃখ তাঁর কেউ বুঝল না, সে দুঃখকে অতলান্ত অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে দিতে চাইলেন নিঃশেষে।

পরদিন ঋষ্যশৃঙ্গ রাজাকে বললেন, আমাকে যে গ্রাম আপনি দান করছেন, আমি তার প্রান্তে একটি মনোরম তপোবন রচনা করে সেখানে অধ্যয়ন ও তপস্যার মধ্য দিয়ে শান্ত সরল জীবন যাপন করতে চাই।

ব্যস্ত ও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাজা লোমপাদ, কিন্তু কেন ঋষিবর, আপনার,

প্রতি আমাদের কর্তব্যে কি কোনো ত্রুটি অনুভব করেছেন ?

একটুখানি মৃদু হেসে শান্তকণ্ঠে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, না মহারাজ, আপনি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত বা বিচলিত হবেন না। আমি আজন্ম তপোবনেই মানুষ। তাই তপোবনের জন্য মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনাদের যত্নের কোনো ত্রুটি নেই। তবু রাজপ্রাসাদের ভোগ ঐশ্বর্য আর আমার ভালো লাগছে না।

রাজা লোমপাদ বুঝলেন, রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আর রাখা যাবে না। তাই তিনি নিরস্ত হয়ে বললেন, তবে যদি একান্তই যেতে চান তাহলে শান্তাকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে যান মুনিবর। শান্তা আমার একমাত্র সন্তান। তাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সত্যিই অতীব কষ্টকর হবে। তবু সে আপনার ধর্মপত্নী, সর্বত্র আপনার সহগামিনী হওয়াই তার কর্তব্য।

ধর্মপত্নী হলেও আমি তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করতে চাই না মহারাজ। স্ত্রী হলেও তার একটা আত্মমর্যাদা আছে। স্বামীত্বের দাবী নিয়ে সে মর্যাদা আমি কোনোদিন ক্ষুণ্ন করব না।

ঋষ্যশৃঙ্গের কণ্ঠে কোথায় যেন একটা চাপা বেদনার সুর ছিল। রাজা লোমপাদ তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। তখনো পর্যন্ত শান্তা কিন্তু কিছুই জানেন না। ঋষ্যশৃঙ্গ ঠিক করলেন, আজ রাত্রে শোবার সময় সব কথা বলবেন শান্তাকে। বলবেন, তিনি একাই যেতে চান।

আজ শয়নমন্দিরে একটু সকাল সকাল ঢুকলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার একটু পরেই। দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি তখনো শেষ হয় নি। গাঢ় হয়ে ওঠে নি তখনো রাজোদ্যানের আরণ্যক অন্ধকার। আজ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর দেখাচ্ছিল ঋষ্যশৃঙ্গের মুখখানা। আজ যেন কোনো একটা শক্ত কথা বলবার জন্য অন্তরে বাইরে কঠিন হয়ে এসেছেন তিনি।

অন্যদিনকার মতো আজও শান্তা ঠিক সেই বাতায়নপাশেই বসেছিলেন। সামনের অন্ধকার না আকাশের তারা কি দেখছিলেন তা ঠিক বোঝা গেল না। সেদিকে ভালভাবে না তাকিয়েই ঋষ্যশৃঙ্গ গম্ভীর ভাবে বললেন, আমায় বিদায় দাও শান্তা। আমি কালই প্রাসাদ ত্যাগ করে তপোবনে চলে যাচ্ছি।

চমকে উঠলেন শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গের দিকে মুখ তুলে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন ?

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমরা ঋষি। যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপের মধ্য দিয়ে সরল আশ্রম জীবন যাপন করাই আমাদের পক্ষে বিধেয়। তাই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে আর বৃথা কালক্ষেপ করতে চাই না।

শান্তা বললেন, তাহলে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। একা যাবার কথা ভাবছেন কেন ?

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আজীবন তুমি রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত। সহসা এ-

জীবন ত্যাগ করে আমার সঙ্গে আশ্রম জীবন যাপন করতে গেলে যে ক্লেশ হবে সে ক্লেশ তুমি সহ্য করতে পারবে না শান্তা।

শান্তা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, শত ক্লেশ হলেও আমি তা হাসিমুখে সহ্য করব ঋষিপুত্র। আমি আপনার ধর্মপত্নী। আপনার ধর্মকর্মে অংশ গ্রহণ করা আমার একান্ত কর্তব্য।

আর কোনো কথা বললেন না ঋষ্যশৃঙ্গ। আসল কথাটাই বলতে পারলেন না। বলতে পারলেন না, শান্তা কেন অভিনয় করছে তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে। অন্তর দিয়ে যাকে গ্রহণ করতে পারে নি, দেহ দিয়ে যাকে স্পর্শ করতে পারে নি, লৌকিক জগতে তার ধর্মপত্নী সেজে এই হীন অভিনয় করার অর্থ কি।

যে প্রেমে সাযুজ্য নেই, প্রেমাস্পদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিয়ে প্রেমের গভীরতর আস্বাদ পাবার কোনো আকুলতা নেই, শুধু সামীপ্যের মধ্যে দিয়ে সে প্রেমকে কেমনভাবে উপভোগ করবেন শান্তা।

শান্তাও ঠিক খুলে বলতে পারলেন না ঋষ্যশৃঙ্গকে, তাঁদের বাইরের এই লৌকিক সম্পর্কটাকে কেন তিনি সত্যিকারের একাত্মতার রস দিয়ে সিক্ত করে নিতে পারছেন না।

তবু যাবার জন্য জেদ ধরলেন শান্তা।

তিন চার দিন পরই দুটি রথ ও বহু লোকজন ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে চম্পানগরীর বাইরে কৌশিকী নদীর ধারে একটি বনে রেখে এলো। সেখানে মনোরম একটি তপোবন নির্মাণ করা হয়েছে। অদূরেই গ্রাম।

ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তা দুজনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দুজনেই ভাবলেন এতদিন বিরাট রাজপ্রাসাদের মাঝে ও বহু লোকজনের মধ্যে তাঁরা দুজনে পরস্পরের কাছে আসতে পারছিলেন না। তাই তাঁদের প্রেম গভীর হয়ে ওঠবার সুযোগ পাচ্ছিল না। আজ এই ছোট্ট কুটিরের স্বল্প পরিসরের মধ্যে দুজনের অবিরাম ও নিবিড় সাহচর্যের মধ্যে তাঁদের প্রেম এক আশ্চর্য প্রগাঢ়তা লাভ করবে। যে কথা এতদিন কেউ কাউকে বলতে পারেন নি, সে কথা আজ বলে হালকা হয়ে উঠবেন দুজনে।

* * * *

তখন অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে। চারিদিকের তমাল বনের ঘনশ্যামল ছায়া পড়েছে কৌশিকীর স্বচ্ছ সুন্দর জলে। নদীর জলে তৃপ্তির সঙ্গে স্নান সেরে এলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তারপর কিছু ফলমূল আহার করলেন।

এদিকে দাসদাসীদের সকলকে বিদায় দিয়ে শান্তা একাই মনের মতো করে পর্ণকুটিরটিকে সাজিয়ে তুললেন। ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না।

শান্তা ভাবলেন, সমস্ত অভিমান ভুলে গিয়ে আজ নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবেন

ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। যে অভিমান এতদিন বুকে পাথরের মতো শক্ত হয়ে জমেছিল, শান্তার সহসা মনে হলো তা এখন কৌশিকী নদীর জলের মতোই স্বচ্ছতরল ও সাবলীল হয়ে উঠেছে ; শান্ত শ্যামল তমাল বনের হাওয়ার মতোই সে অভিমান হয়ে উঠেছে শান্তলঘু এবং সরল।

নিজের হাতে মাটির একটি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বাললেন শান্তা। এদিকে নিজের হাতে যজ্ঞাগ্নি জ্বাললেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কুটিরের মধ্যে একটি সরল ও সুন্দর পল্লবশয্যা প্রস্তুত করলেন শান্তা। তারপর এক নিবিড় প্রতীক্ষায় বসে রইলেন ঋষ্যশৃঙ্গের জন্য। এতদিন ধরে যাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, আজ তাকেই গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর মন।

কিন্তু স্তব্ধ অন্ধকার বনভূমিকে আলোকিত করে রাত পর্যন্ত হোম করে যেতে লাগলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। সংসারের সব কাজ সেরে সমানে স্থির হয়ে নীরবে বসে রইলেন শান্তা। বসে বসে বেদমন্ত্রের ধ্বনি শুনলেন। প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে কেমন করে আহুতি দেয় তা দেখলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম ঋষিরূপ দেখলেন শান্তা। দেখে যেমন মুগ্ধ হলেন, তেমনি একটা কথা ভাবতে লাগলেন। প্রশ্ন জাগল মনে, কি ফল এই সব সাধন ভজন ও তপশ্চর্যার ? ঋষির অর্থ হলো, যিনি সত্যকে দেখতে পান। তাই যদি হয়, কেন তবে ঋষি হয়েও সেই সব বারবিলাসিনীদের রূপে মোহগ্রস্ত হয়ে ছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ ? কেন তবে নারীদেহের প্রথম স্পর্শে জারজ লালসার শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সারা দেহ ?

ঋষিরা যদি সত্যকে দেখতে পেতেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ যদি প্রকৃত ঋষি হতেন তাহলে সেই সব বারবনিতাদের একবার দেখে আবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন না তিনি। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন শান্তা। তারপর বিছানার একপাশে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিছুই বুঝতে পারেন নি।

সহসা একটা আলোড়নে ঘুম ভেঙে গেল শান্তার। রাত্রি তখন গভীর। চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন শান্তা, ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে সবল আলিংগনে জড়িয়ে ধরে মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। ক্ষীণভাবে জ্বলতে থাকা মৃদু প্রদীপালোকে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখপানে একবার চাইলেন শান্তা। নিশীথরাত্রির নক্ষত্রদলপিষ্ট নরম অন্ধকারের মতো একবার ঈষৎ কেঁপে উঠল তাঁর দেহটা। পরক্ষণেই সে দেহ হয়ে উঠল পাথরের মতো নিথর এবং কঠিন।

ঋষ্যশৃঙ্গকে সজোরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন শান্তা। তারপর সব কিছু খুলে বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন মনে মনে।

কিন্তু শান্তা কিছু বলবার আগেই দৃঢ় ও গম্ভীর কণ্ঠে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, এবার আমি তোমার ছলনা বুঝতে পেরেছি। আসল কথা, আমি হরিণীর গর্ভজাত এবং আমার কপালে ক্ষুদ্র দুটি শৃঙ্গ আছে বলে আমায় তোমার পছন্দ হয় নি। কিন্তু

তুমি তো আমার সব কিছু জেনেই আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে মত দিয়েছ। তোমার মনের এই আসল কথাটা কেন তুমি আগে জানাও নি? কেন তুমি এইভাবে আমার সঙ্গে তোমার বাবার সঙ্গে প্রতারণা করলে?

শান্তা কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, তোমাকে ভালবেসে সুখী হতে চেয়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম তোমায় সহধর্মিণী করে সংসারে থেকে ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করব। কিন্তু যে ভালবাসার খাতিরে আমার বৃদ্ধ পিতা ও পিতৃভূমি ত্যাগ করে তোমাকে গ্রহণ করলাম আমি, সে ভালবাসাকে আমার নির্মম অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করলে তুমি।

সহসা দলিতা ফণিনীর মতো গর্জন করে উঠলেন শান্তা। কোনো এক দমকা হাওয়ার প্রহারে জর্জরিত শান্ত মৃদু দীপালোকের মতো এক অস্বাভাবিক প্রখরতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ দুটো। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কে বলেছিল তোমায় বৃদ্ধ পিতা ও পিতৃভূমিকে ত্যাগ করে আসতে? কার রূপের মোহে ও কাকে ভালবেসে তুমি আশ্রম ত্যাগ করে এসেছ?

যে রূপ-পারবশ্য হতে মুক্ত হবার জন্য সাধনা করেন ঋষিরা সেই রিপুর বশে কয়েকটি নারীদেহের জারজ লালসাকে দমন করতে না পেরেই তুমি এখানে এসেছ। যে ঋষি মুহূর্তের জন্য ধ্যানস্থ হয়ে ত্রিকালের কথা জানতে পারেন, সেই ঋষি হয়েও তুমি সামান্য কয়েকটি ছলনাময়ী বারবনিতার মনের আসল কথাকে জানতে না পেরে তাদের পিছনে পাগলের মতো ছুটে গিয়েছ।

কথাটার কোনো উত্তর দিতে পারেন না ঋষ্যশৃঙ্গ। শুধু দুহাতে মুখ ঢেকে অব্যক্ত লজ্জার এক অস্ফুট যন্ত্রণায় শিউরে উঠলেন।

শান্তা বললেন, যে-কোনো কারণেই তুমি এসে থাক, তুমি আমাদের অশেষ উপকার করেছ। তোমার পাদস্পর্শে আমাদের অভিশপ্ত রাজ্যের তাপদগ্ধ মাটির বুকে নেমে এসেছে বহু আকাংক্ষিত বৃষ্টির সুধা। বন্ধ্যা দেশ হয়ে উঠেছে সুজলা সুফলা। তোমার এই উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ বাবা আমায় সম্প্রদান করেছেন তোমাকে। এই উপকারের জন্য আমি তোমায় আমার দেহের সেবা, অন্তরের আনুগত্য, আমার পার্থিব সম্পদ, আমার যথাসর্বস্ব তোমায় দান করতে পারব; কিন্তু একটা জিনিস তোমায় আমি কোনোদিনই দিতে পারব না—সে আমার প্রেম। তুমি চাইলে তোমায় আমার প্রাণ দেব; কিন্তু আমার প্রেম কোনোদিন দিতে পারব না। প্রয়োজন হলে এক মুহূর্তে আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেব; কিন্তু আমার হৃদয় কোনোদিন তোমায় দিতে পারব না।

কোনো কথা না বলে নীরবে নিশ্চুপে ঘর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন ঋষ্যশৃঙ্গ।

শান্তা একবার ভাবলেন, ঋষশৃঙ্গ যত দোষই করে থাকুন, তাঁকে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনা উচিত। এই ভীষণ অরণ্যে একা থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পরক্ষণেই রাগে ও অভিমানে কঠিন হয়ে উঠলেন শান্তা।

তবু একবার কুটির হতে বেরিয়ে গেলেন শান্তা। কিন্তু চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিমিষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু কোনো এক সাথীহারা মানুষের গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো পাতা ঝরার খস খস শব্দ শুনতে পেলেন চারিদিকে।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। রাত্রির ঠিক এই কালটিতে সমগ্র পৃথিবী যেন হতচেতন হয়ে স্তব্ধশীতল এক ক্লান্তির কোলে ঢলে পড়ে। সারারাত্রি ধরে চীৎকার করে করে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে ঝিল্লীর দল। দূর আকাশে স্তিমিত হয়ে এসেছে নক্ষত্রের আলো। মন্থর হয়ে উঠেছে শিশিরসিক্ত আরণ্যক হাওয়ার হিল্লোল।

এক ভয়ংকর নিঃশব্দতায় জমাট বেঁধে ওঠা শ্বাসরুদ্ধ তমাল বনের মতোই বুকের ভিতরটাকে ভারী বলে মনে হলো শান্তার। হাওয়ায় শীতের আমেজ। তবু এক অস্বস্তিকর উষ্ণতা অনুভব করছিলেন শান্তা সারা দেহের প্রতিটি ধমনীতে।

তিন দিন তিন রাত্রি কঠোর ব্রতচারিণীর বেশে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিলেন শান্তা।

এই তিনটি দিনের মধ্যে একবারও চন্দনে চর্চিত হলো না তাঁর অংগ। নীল মুক্তাহারে শোভিত হলো না গলদেশ। সুগন্ধি প্রসাধনে বন্ধ করলেন না তাঁর আলুলায়িত কেশপাশ। অলক্তরসে রঞ্জিত হলো না তাঁর পদযুগল।

অনাহারে অনিদ্রায় শুয়ে শুয়ে শুধু ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন শান্তা। আর মাঝে মাঝে অধীর আগ্রহে মুখ তুলে দ্বারদেশে কার প্রতীক্ষায় চাইতে লাগলেন। তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস, ঋষ্যশৃঙ্গ চিরদিনের মতো তাঁকে ত্যাগ করে যাবেন না। নিশ্চয় ফিরে আসবেন।

নির্জন বনপ্রদেশের প্রতিটি পল্লবমর্মরকে মানুষের পদশব্দ বলে ভুল হতে থাকে শান্তার। এক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় সচকিত হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণ।

তিন দিন পর পথে বেরিয়ে পড়লেন শান্তা। লতাগুল্মে আচ্ছন্ন ও কণ্টকে আকীর্ণ সে পথ। পায়ে পায়ে বাধা ঠেকছিল শান্তার। তাছাড়া অনাহারে অতিশয় দুর্বল বোধ করছিলেন। কৌশিকী নদীর জল ও বনের ফল খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এমনি করে বহুদূর যাওয়ার পর আর একটি গভীর ও বিশাল বনে এসে পৌঁছলেন শান্তা। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত। কম্পিত বনচ্ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে শেষ শরতের পাণ্ডুর সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে তৃণভূমির উপর। শীর্ণকায়া শান্তা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় বসলেন। সহসা কোনো অদৃশ্য মানুষের অনুচ্চ

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন শান্তা। চারিদিকে চেয়ে কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শান্তা। এক অভূতপূর্ব দৃশ্যে আনন্দে বেদনায় ও বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সারা দেহ। দেখলেন একটি পিয়াশাল গাছের তলায় একটি শান্ত হরিণীকে নিবিড় আলিংগনে আবদ্ধ করে ঋষ্যশৃঙ্গ বসে রয়েছেন। আর অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে মাঝে মাঝে আপনার মনে কি সব বলছেন।

কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না শান্তা। যেখানে ছিলেন সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ সেই হরিণীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমিই আমার মা। মোহবশে পিতাকে ত্যাগ করেছি। তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তুমি যেন আমায় কখনো ত্যাগ করো না। আমি তোমার গর্ভজাত, তোমার মাতৃত্বের অভিজ্ঞানস্বরূপ আমার মাথায় দুটি শৃঙ্গ। পৃথিবীর সব মানুষ তাই আমায় ঘৃণা করে। আমার শক্তিকে লোকে ভয় করে, আমার সামর্থ্যকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু কেউ আমায় ভালবাসতে পারে না।

শান্তার মাথাটা ঘুরছিল। গলা ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল তাঁর। মিথ্যা বলছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। এত বড় মিথ্যাটাকে কোনোমতেই সহ্য করতে পারবেন না তিনি। তিনি কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। অবরুদ্ধ অশ্রুকে অতিকষ্টে দমন করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ আবার বলতে লাগলেন—প্রেমকে পরমার্থ বলে জ্ঞান করে যাগ-যজ্ঞ ও সাধন-পূজন ত্যাগ করে নূতন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলাম। সে প্রেম আমায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ আমি সব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব। আজ পার্থিব অপার্থিব কোনো বস্তুর কোনো অবলম্বনই আমার নেই। আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।

হরিণীটি উঠে দাঁড়াতে ঋষ্যশৃঙ্গও উঠে দাঁড়ালেন বিচলিত হয়ে। বললেন, আজ আমি আলো চাই না। সুখ সম্পদ, জ্ঞান সত্য, ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষ কোনো কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই মাতৃজঠরের সেই শান্ত শীতল অন্ধকার যা সমস্ত ভালো মন্দ, সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে নির্বিশেষ চেতনার এক আবরণ দিয়ে মানুষের দেহ মনকে ঢেকে রাখে। তুমিই হচ্ছ আমার আদি এবং অকৃত্রিম মুক্তি, একমাত্র তুমিই হচ্ছ অদ্বৈত সত্য।

শান্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্তাকে তখনো দেখতে না পেয়ে আচ্ছন্নের মতো বলে চললেন, জগতে অদ্বৈত সত্য বলে কিছু নেই। সকল বস্তুর মধ্যেই আছে দ্বৈতের দ্বন্দ্ব।—সুখের সঙ্গে সঙ্গে আছে দুঃখ, মুক্তির পিছনে আছে বন্ধন, প্রেমের সঙ্গে আছে প্রত্যাখ্যান।

এবার আর থাকতে পারলেন না। কেঁদে উঠলেন শান্তা আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে

আশ্চর্য হয়ে গেলেন ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তা তুমি! আর আমায় লজ্জা দিও না শান্তা, এবার আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। আজ আমি সমস্ত জীবন মৃত্যুর ঊর্ধ্বলোকে এক চিরশান্তি ও চিরমুক্তির জন্য চলে যাচ্ছি।

শান্তা কোনো কথা বলতে পারলেন না। ঋষ্যশৃঙ্গের পায়ের উপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন কাঁদতে কাঁদতে। ধীরে ধীরে শান্তাকে তুলে নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, তুমি তো কোনো অন্যায় করনি শান্তা। বরং যে অন্যায় আমি করেছিলাম তুমি তা ধরিয়ে দিয়ে আমার অশেষ উপকারই করেছ। তুমি আমায় বিদায় দাও শান্তা।

শীর্ণ দুটি হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে শান্তা বললেন, আজ আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। কে বলেছে আমি তোমায় ঘৃণা করি! পৃথিবীর সকলে তোমায় ঘৃণা করলেও আমি তোমায় ঘৃণা করতে পারব না। আমি তোমায় যা বলেছি ভালবাসি বলেই বলেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ নির্বাক হয়ে শান্তার মুখপানে চেয়ে রইলেন।

শান্তা বললেন, আমার ভালবাসা রুদ্রের মূর্তিতে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিল তোমার মনকে। আমার ভালবাসার উপরকার কঠোরতাটাকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে এসেছ তুমি। ভিতরে তা কতখানি খাঁটি কতখানি কোমল তা ধৈর্য ধরে দেখ নি।

তুমি আমায় ক্ষমা কর শান্তা।

শান্তা বললেন, আমার প্রকৃত দুঃখটা কি তা না জেনে আমার উপর রাগ করেছ তুমি। বাবার কাছে তোমার কথা শুনে তোমায় না দেখেই পূর্বরাগ সঞ্জাত হয়েছিল আমার অন্তরে। আমার গোপন ইচ্ছা ছিল, আমি তপস্বিনীর বেশে নিজে গিয়ে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তোমায় নিয়ে আসব। সত্য কথা বলে তোমার পিতার কাছ থেকে তোমায় ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম আমি, চুরি করে নয়। আমার কুমারী জীবনের প্রেম সাধনার বিনিময়ে তোমার ঋষিজীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনার সত্যকে আমি জয় করে আনতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শুধু হাতে তোমার কাছ থেকে কিছু নেব না। অজস্র বৃষ্টিধারার সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে তুমি আমাদের রাজ্যের মাটি ও মানুষকে বাঁচাবার আগে আমি আমার হৃদয়ের রক্তরস ও প্রেমের অমৃত দিয়ে তোমার পা দুখানিকে ধুয়ে দেব।

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন শান্তা।

কিন্তু কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। সামান্য কয়েকটি বারবনিতা তোমার মনকে মোহমুগ্ধ ও দেহকে কলুষিত করে তোমার পিতার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে এলো তোমায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, একথা আগে বল নি কেন শান্তা? আমি আমার দোষ স্বীকার করছি। আমি সেদিন সত্যই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। জন্ম থেকে নারী দেখি নি বলে স্ত্রী পুরুষের ভেদ জানতাম না। তাই জীবনে প্রথম কয়েকটি মোহিনী

নারীমূর্তি দেখে স্বাভাবিকভাবেই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লাম আমি। ধ্যানস্থ হয়ে ভালমন্দ বুঝবার অবকাশ পাই নি।

শান্তা বললেন, এইজন্যই তোমার উপর আমার অভিমান। এইজন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বারবনিতার দ্বারা উচ্ছিষ্ট তোমার দেহ মনকে কখনই স্পর্শ করব না আমি। আমার এই হিমশীতল অভিমানের স্পর্শে আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা পাথরের মতো শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে গিয়েছিল সেদিন। আমি তাই দিয়ে আঘাত করেছিলাম তোমায়। কিন্তু তুমি বুঝতে পার নি, সে আঘাত আমার প্রেমেরই আঘাত, আমার হৃদয়ের এক অভিনব অভিব্যক্তি।

একটুখানি মৃদু হাসলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, আজ আমি এক নূতন শিক্ষা লাভ করলাম শান্তা। জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা মিথ্যা নয়। মিথ্যা হতো যদি সেদিনের সেই বারবনিতাদের মোহ, তাহলে তোমার এই প্রেমের মহাসত্যকে আজ লাভ করতে পারতাম না শান্তা। তারা চঞ্চলা চটুলা নদী, তুমি হচ্ছ স্থির অচঞ্চল এক সমুদ্র। তারা আমায় প্রলুব্ধ করে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায় নি। তারা আমায় তোমার কাছেই এনেছে। তাদের মোহের স্রোতে সেদিন গা ঢেলে দিয়েছিলাম বলেই আজ তোমার এই প্রেমের গভীরতাকে আস্বাদন করতে পারছি। নিজেকে ধন্য মনে করেছি আজ।

এক অপরিসীম আনন্দের আবেগে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখপানে চাইলেন বিশালাক্ষী শান্তা। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, তোমাকে পেয়ে আমিও ধন্য ঋষিপুত্র।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমরা ঋষি। জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে সত্যের সন্ধান করাই আমাদের কাজ। কিন্তু আজ জানলাম, প্রেমের মধ্যেও আছে এক মহাসত্যের মহিমা। এ সত্য লাভ করতে না পারলে ব্যর্থ হয়ে যায় অন্য সব সত্যের সন্ধান। অপরিপূর্ণ রয়ে যায় জীবনের সকল সার্থকতা।

কথা বলতে বলতে তরল অন্ধকার নেমে এসেছে কখন পিয়াশাল বনে কেউই তা বুঝতে পারেন নি। পাখিরা গাছে গাছে ফিরে এসে কলরব করতে শুরু করে দিয়েছে কখন কেউ তা এতক্ষণ শুনতে পান নি। ঋষ্যশৃঙ্গ একটি হাত ধরে শান্তাকে বললেন, চল আশ্রমে ফিরে যাই।

দুজনেই তখন ক্ষুধায় কাতর ও দুর্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত। তবু দুজনে পরস্পরকে অবলম্বন করে অন্ধকার বনপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন ধীর পায়ে।

বিশ্বামিত্র ও মেনকা



আগে এইখানে এই পুষ্কর হ্রদের বুকে ছোট ছোট ঢেউয়ের শিরাগুলি প্রায়ই ফুলে ফুলে উঠত। চারিপাশের তৃণগুচ্ছে ও কল্পতরু শাখার পাতায় পাতায় কাঁপন লেগে থাকত সব সময়। মাথার উপরে অনেক দূরে শ্যামালতার পরিপক্ক ফলের মতো তাম্রাভ আকাশের কোলে স্বর্ণাভ আলো দোল খেত। এখানকার বাতাস চঞ্চল শিশুর মতো অশান্ত স্পন্দনে নিয়ত ছুটে বেড়াত।

কিন্তু আজ মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্রের তপোপ্রভাবে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে সব। যে দিন হতে এই পুষ্কর হ্রদের তীরে তপস্যা করতে এসেছেন বিশ্বামিত্র, সেদিন হতে চারিদিকের সমস্ত বস্তুও যেন ধ্যাননিমীলিত হয়ে পড়েছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। এক অবিচল অটল স্তব্ধতায় প্রস্তরীভূত হয়ে উঠেছে যেন এখনকার জল স্থল অন্তরীক্ষ।

আজ এখানে জলের বুকে কোনো ঢেউ নেই, বাতাসে হিল্লোলিত চঞ্চলতা নেই, বৃক্ষ-লতা বা তৃণগুল্মের মধ্যে কোনো দোলা নেই, আলোর মধ্যে কোনো কম্পন নেই।

তপস্যারত বিশ্বামিত্রকে দেখে ভীতিবিহ্বল হয়ে উঠেছে শ্বাসরুদ্ধ পৃথিবী। নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে উঠেছে সমস্ত জীবন ও জড়প্রকৃতি।

তপস্যারত বিশ্বামিত্রকে দেখলে সত্যিই ভয় হয়। তাঁর মস্তকে জটাজাল কালসর্পাকৃত চূড়ার মতো উন্নত করে আবদ্ধ; কর্ণদ্বয় দ্বিগুণীকৃত রুদ্রাক্ষের মালায় অবতংসযুক্ত। পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম। সম্মুখস্থ প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিশিখায় তাঁর গৌরকান্তি জ্যোতিষ্মান।

তিনি বীরাসনে স্থির হয়ে বসে আছেন। তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ নিশ্চল। সরল ও সমুন্নত স্কন্ধদ্বয় সন্নতভাবে অবস্থিত। করযুগল ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে সন্নিবেশিত।

এই হোমাগ্নিশিখার অতিপ্রখর প্রভাবে ভীত হয়ে উঠেছে সমগ্র ভূলোক ও দ্যুলোক। সমস্ত জলদেবতা বনদেবতারা ভয়ে কোথায় লুকিয়ে পড়েছেন। বনপ্রদেশে ফুলের পাপড়িগুলি ভালো করে আর ফোটে না, ভয়ে ভ্রমর গুঞ্জন করে না, মৃগশিশু আর খেলা করে না।

কঠোর তপস্যার দ্বারা একে একে দেবলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করবেন বিশ্বামিত্র, এই সংবাদে সুদূর স্বর্গলোকও ভীত ও ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে যেন আতাম্র আকাশ। কম্পিত হয়ে উঠেছে স্বর্গের সিংহাসন। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন দেবতারা। বিষাদের এক ঘন ছায়া নেমে এসেছে চির আনন্দময় স্বর্গের সংগীত সভায়। তাই আজকাল প্রায়ই তাল কেটে যায় অপ্সরাদের নৃত্যের ছন্দে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একবার যোগবিরত হলেন বিশ্বামিত্র। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সময় প্রতিদিন তিনি বীরাসন ত্যাগ করে পাদাগ্রভাগে ভর দিয়ে

দাঁড়িয়ে পবিত্র স্বর্গগঙ্গাসলিলের অঞ্জলি দ্বারা অর্ঘ দান করে শুদ্ধ মনে গায়ত্রীর উপাংশু জপ করেন। তারপর উপযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনার পর নামগান করতে থাকেন।
সেদিন কিন্তু আর গায়ত্রী জপ করা হলো না বিশ্বামিত্রের। বীরাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতেই কিসের একটা মধুর শব্দে চোখ মেলে উপরের দিকে চাইলেন। দেখলেন সূর্যাস্তকালে চারিদিকের শোভা বড় মনোরম। দূর দিকচক্রবালে মেঘের ঋজুকুটিল প্রান্তভাগগুলি রক্ত, পীত, কপিশ প্রভৃতি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অস্তগামী সূর্যের লোহিত আভায় মনে হচ্ছে যেন উজ্জ্বল কাঞ্চনদ্রবে সিক্ত হয়ে উঠেছে নবপল্লবশোভিত তরুবীথিকা।
কিন্তু এই সব সুন্দর দৃশ্যের উপর একবার দৃষ্টিপাত করবার সময় বা প্রবৃত্তি নেই বিশ্বামিত্রের। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রগুলিকে এমনভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছেন তিনি, যাতে বাইরের জগতের কোনো শব্দ বা দৃশ্যের কোনো উদ্দীপন কোনোরূপ চেতনার সৃষ্টি করতে না পারে তাঁর মধ্যে।
বিশ্বামিত্রের কাছে সমস্ত সৌন্দর্য হচ্ছে মায়া। হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন যেমন সবিতৃদেব, তেমনি সৌন্দর্যের মায়া দ্বারা আবৃত থাকে সত্যের রূপ। সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়লে সত্যকে লাভ করতে পারা যাবে না কখনো। তাই কখনো কোনো সুন্দর বস্তু মন ভোলাতে পারে না মহাযোগী বিশ্বামিত্রের।
আবার সেই শব্দটা কানে এসে বাজল। চকিত হয়ে উঠলেন বিশ্বামিত্র। শব্দটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ছলাবিলাসিনী কোন্ এক নিপুণা নটীর সুমধুর নূপুরশিঞ্জায় ছন্দিত হয়ে উঠেছে যেন এক অপরূপ নৃত্যকলা। তার অলক্তলাঞ্ছিত চরণের নূপুরশিঞ্জামুখরিত পদাঘাতে আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করে জলের বুকে ঢেউ জাগিয়ে সমস্ত জড়বস্তুকে স্পন্দিত করে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে সেই নটী।
কিন্তু কোথায় সেই নটী?
সচকিত হয়ে যেদিকেই তাকান বিশ্বামিত্র, তাঁর মনে হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে লুকিয়ে সে যেন ছলনা করছে তাঁর সঙ্গে। আর হাসছে। নৃত্যের তালে তালে উঠছে মদস্রাবী হাসির কলরোল।
বিশ্বামিত্রের মনে হলো, বিশ্ব চরাচরের যে সব বস্তু এতক্ষণ স্থাণুর মতো অটল স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে ছিল, এখন তারা সব সচল হয়ে নাচতে ও হাসতে শুরু করে দিয়েছে সহসা। এখন তাঁর মনে হলো, এ জগতের সব কিছু গতিশীল ও নৃত্যশীল। যে সব অণুপরমাণু দিয়ে এই বিশ্বের বস্তুনিচয় গঠিত, এক উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায় স্খলিত হয়ে পড়ছে তারা সহসা।
একবার তাঁর মনে হলো, তাঁর রোষবিস্ফারিত লোচনবহ্নি দিয়ে মুহূর্তে ভস্মীভূত করে দেবেন সেই কামিনীকে। তার উদ্ধত উন্মত্ত স্পর্ধার সমুচিত শাস্তি দেবেন এমনি নির্মমভাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন বিশ্বামিত্র। মুহূর্তে সংবরণ করে নিলেন সমস্ত ক্রোধোচ্ছাস। ভাবলেন ক্রুদ্ধ হয়ে কোনো বস্তুকে অভিশাপ দিলে বিনষ্ট হবে তাঁর তপস্যার ফল।

এমন সময় সহসা এক নৃত্যপটীয়সী সুন্দরী রমণী করজোড়ে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেয়ে দেখলেন বিশ্বামিত্র, স্বর্গের অপ্সরার মতো তার বেশভূষা। মদির তার কটাক্ষ। মদোন্মত্ত তার হাসি। পদ্মগন্ধবিনিন্দিত তার দেহসৌরভ। তার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অত্যুজ্জ্বল বিভায় সমাগত সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে আচ্ছন্ন দশদিক সমুদ্ভাসিত।

কে তুমি অপরিণামদর্শিনী নারী, আমার তপস্যায় বিঘ্ন সাধন করতে এসেছ?

কণ্ঠে কিছু তিক্ততা ও কঠোরতা মিশিয়ে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্র। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছ, তোমার এই হীন কর্মের কী ভীষণ পরিণাম? মনে রেখো, প্রতিফলনের কথা বিবেচনা না করেই যে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে পশুর অধম।

বিশ্বামিত্রের দুষ্প্রেক্ষ্য ভ্রূভঙ্গ পানে বংকিম কটাক্ষপাত করে কী একবার দেখে নিল সেই উন্মত্তমদা কামিনী। তারপর পর্যাপ্ত কুসুমস্তবকের ভারে নম্রীভূত লতার মতো আপন পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে অবনত দেহসম্ভারকে নত করে তাঁকে প্রণাম করে বলল, আমি আমার কর্মের প্রতিফল জেনেই স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি মুনিবর।

বিশ্বামিত্র তেমনি গম্ভীরভাবে বললেন, কে তুমি, আগে তোমার পরিচয় দাও, তুমি দেবকন্যা না গন্ধর্বকন্যা।

তার শুভ্রবিহসিত মুখমণ্ডল বিষাদে মলিন হয়ে উঠল সহসা। মুহূর্তে কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল তার বিলোল কটাক্ষ। শান্তকণ্ঠে কামিনী উত্তর করল, আমি স্বর্গের অপ্সরা মেনকা।

বজ্রের মতো গর্জন করে উঠলেন বিশ্বামিত্র, আমি তপস্বী, তুমি অপ্সরা। আমার সকাশে কি হেতু তোমার আগমন? সত্য পরিচয় দাও। সত্যকে গোপন করবার চেষ্টা করো না, কারণ আমি ধ্যানস্থ হলেই তোমার গূঢ়তম অভিলাষ ও গোপনতম এষণাও জেনে নিতে পারব।

নতজানু হয়ে করুণ কণ্ঠে মেনকা বললেন, না প্রভু, আমি বিন্দুমাত্র কোনো কিছু গোপন করব না আপনার কাছে। তাতে আমার পক্ষে যে শাস্তি সমুচিত বলে বিবেচনা করবেন আপনি, তাই বিধান করবেন আমার উপর।

স্থির হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বামিত্র।

মেনকা বললেন, আপনার তপস্যার কঠোরতায় ও একাগ্রতায় শংকিত হয়ে দেবগণ আপনার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্যই আমায় পাঠিয়েছেন এখানে।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে নীরবে চিন্তা করলেন বিশ্বামিত্র। বললেন, তা আমি আগেই

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি ঘটনাক্রমে আমার যোগাবিরতির সময় এসে পড়েছ। অন্যথায় আমি যদি ধ্যানস্থ থাকতাম, তাহলে কেমন করে তুমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমার ?

তেমনি নতজানু অবস্থায় শান্তকণ্ঠে মেনকা বললেন, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন প্রভু। আমি আমার নৃত্যগীতাদি দ্বারাই আপনার ধ্যানভঙ্গ করতাম।

তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠলেন বিশ্বামিত্র, তুমি ভুল করছ অপ্সরি, তুমি জান না, কী কঠোর তপস্যায় আমি ব্রতী হয়েছি। আমার কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। যে পাতা গাছ হতে আপনা হতে ঝরে পড়ে সেই স্বতশ্চ্যুত বৃক্ষপত্রের সামান্য রসটুকু পান করে জীবন ধারণ করি আমি।

বিশ্বামিত্রের মুখপানে আশ্চর্য হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন মেনকা। শত আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনেও বিন্দুমাত্র কমে নি তাঁর দেহের অনলপ্রভ বিভূতি। বরং তা আরও বেড়ে গেছে। তপোশুদ্ধ সেই বিভূতির কাছে নিজের রূপৈশ্বর্যকে ম্লান বলে মনে হলো মেনকার।

বিশ্বামিত্র বললেন, আমার সমাধিস্থ ভাব বড় নিবিড় আর নিশ্ছিদ্র। সেখানে কোনো মতে প্রবেশ করতে পারত না তোমার নৃত্যগীতের কোনো ধ্বনি। আমার রুদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারে ব্যাহত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসত তোমার সমস্ত তরল প্রয়াস।

মেনকা বললেন, আমি স্বীকার করছি আপনার ঐশী শক্তি। কিন্তু দেব, সবিশেষ বিনয়ের সংগে বলতে বাধ্য হচ্ছি আমার উন্মাদনা শক্তিও বড় প্রবল। আমার যে নৃত্যের ছন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে স্বর্গের দেবসভা সেই নৃত্যের ছন্দে নৃত্যচঞ্চল হয়ে উঠত এই মর্ত্যলোকের প্রতিটি ধূলিকণা। আমার নৃত্যশীল চরণের নূপুর-নিক্কণে বিশ্বচরাচরের স্থাবর জংগম প্রতিটি বস্তুও দোলায়িত হয়ে উঠত এক মধুর ছন্দোমত্ততায়। এইভাবে আপনার আসন উঠত টলে এবং আপনার ধ্যানভঙ্গ হত তার ফলে।

সহসা রোষস্ফুরিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্র, তারপর ?

মেনকা উত্তর করলেন, তারপর আপনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিতেন আমায়।

কিন্তু কেন ? এবার রোষ নয়, এক নিবিড় বিস্ময়বিমুগ্ধতা ফুটে উঠল বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে। কেন তুমি স্বর্গের নন্দন কানন ছেড়ে শাপদগ্ধ হয়ে মর্ত্যের ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যেতে এসেছিলে অপ্সরি ! যে দেবতাদের তুমি তোমার নৃত্যগীত দ্বারা যুগ যুগ ধরে প্রীত করে এসেছ সেই দেবতারা কেন তোমার এই নির্মম নিষ্ঠুর আদেশ দান করলেন এবং কেনই বা তুমি নত মস্তকে অপ্রতিবাদে মেনে নিলে এই ভয়ংকর আদেশ ?

বিশ্বামিত্রের মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে নীরবে বসে রইলেন মেনকা। তাঁর কথার কোনো উত্তর দিলেন না।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তবু আজ সায়ংকৃত্য সম্পন্ন বা সামগান করা হয় নি

বশ্বামিত্রের। প্রদীপ জ্বালা হয় নি সমাধি কুটিরে। শুধু থেকে থেকে অসংখ্য জোনাকির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলছে সারা বনভূমি জুড়ে। মস্তকে অন্ধকারের এক একটি বিপুল জটাজাল নিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন প্রশান্তগম্ভীর দ্রুমদল।

বিশ্বামিত্র আবার বললেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও অপ্সরি।

এতক্ষণে চমক ভাঙল মেনকার। মেনকা বললেন, স্বর্গে অপ্সরার জীবন আমার আর ভালো লাগে না মুনিবর। অনন্তকাল ধরে চটুল দেহৈশ্বর্য ও হীন বিলাসলাস্যের দ্বারা অসংখ্য দেবতাদের প্রীত করা আমি আর একেবারেই পছন্দ করি না। দিনের পর দিন কাউকে নৃত্যগীত, কাউকে হাস্যময় সংলাপ, কাউকে নিবিড় সঙ্গদানের মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করে যাওয়াই হচ্ছে আমার কাজ। এ কাজ আর আমি চাই না। আমি চাই না স্বর্গের নন্দন কানন, তার চেয়ে মর্ত্য আমার কাছে ঢের ভালো। আমি অমরত্ব চাই না; মৃত্যু চাই। বিশেষ করে সে মৃত্যু যদি আসে আপনার মতো একজন পুরুষশ্রেষ্ঠর কাছ থেকে।

মেনকার কথায় এবার আরও বিস্মিত হলেন বিশ্বামিত্র।

মেনকা বললেন, এতদিন স্বর্গে বহু দেবতা দেখেছি। আজ মর্ত্যে একজন মানুষ দেখে ধন্য হলাম।

বিস্ময়ে বাক্‌স্ফূর্তি হলো না বিশ্বামিত্রের মুখ থেকে।

মেনকা আবার বলতে লাগলেন, হে মানবশ্রেষ্ঠ, আপনি এমনি একজন বিরাট পুরুষ যিনি স্বর্গ মর্ত্যের সমস্ত ব্যবধানকে লুপ্ত করে দিতে চলেছেন; আপন পুরুষকারের দ্বারা বিধিনির্দিষ্ট জন্মবিধানকে অস্বীকার করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে চলেছেন আপনি। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আপনি এমনি একজন তপস্বী যাঁর তপস্যার কঠোরতায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে সমস্ত দেবকুল।

বলতে বলতে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন মেনকা আর তা শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন বিশ্বামিত্র।

মেনকা বললেন, হে তাপস, আপনার পবিত্র অভিশাপবহ্নিতে দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়ে আপনার তপোভূমির ধূলিকণার সঙ্গে মিশে থাকাও পরম ভাগ্যের কথা। এতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে সে মৃত্যু আমার হবে মহৎ। কারণ সে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি পাব আমার এই অবাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত জীবন থেকে চিরমুক্তি।

সহসা চমক ভাঙল বিশ্বামিত্রের। দেখলেন তাঁর পদতলে আনত হয়ে তাঁর কাছে শাস্তি ভিক্ষা করছে মেনকা। মেনকা বলছে, হয় আমায় শাস্তি দিন তা না হলে আবার যথাস্থানে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

আচ্ছন্নের মতো জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বামিত্র, কোথায়?

মেনকা বললেন, স্বর্গ ছাড়া আর যাবার আমার জায়গা কোথায় প্রভু!

বিশ্বামিত্রের মুখে চোখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ফুটে উঠল। কিন্তু তা দেখা গেল না। শুধু তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল, সেখানে তোমায় আর আমি যেতে দেব

না। তোমার মোহিনী মূর্তি ও মধুর বাক্‌ভংগিমার দ্বারা আমাকে কামচঞ্চল করে গিয়ে দেবতাদের তুমি প্রীত করবে, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

ধীরে ধীরে মেনকার একটি হাত ধরলেন বিশ্বামিত্র।

সহসা বিশ্বামিত্রের এই চিত্তবিকার দর্শনে চমকে উঠলেন মেনকা। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সমগ্র বনভূমির অরণ্যসমাহিত অন্ধকার।

করুণ কণ্ঠে মেনকা বললেন, একি করলেন ঋষিবর, আমাকে স্পর্শ করে কেন আপনি আপনার এতদিনের কঠোর তপস্যার ফল বিনষ্ট করলেন?

কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে মেনকাকে আরও কাছে টেনে নিলেন বিশ্বামিত্র।

কোমলাঙ্গী মেনকার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কেঁপে উঠল একবার। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়রাবিমিশ্রিত এক বেদনার শিহরণে কুঞ্চিত হয়ে উঠল পুষ্কর হ্রদের শান্ত জলের বুক।

বিশ্বামিত্র বললেন, তোমার কৃতকর্মের জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে অপ্সরা।

মেনকার হাত ধরে তাঁকে কুটিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন বিশ্বামিত্র।

মেনকা একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এখনো আপনার সায়ংকৃত্য ও সামগান সারা হয় নি।

বিশ্বামিত্র বললেন, তা না হোক।

অবশেষে সমস্ত চঞ্চলতা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের প্রশস্ত বুকের উপর নিথর নিস্পন্দের মতো ঢলে পড়লেন মেনকা।

মেনকার মনের পরিচয় আগেই পেয়েছেন বিশ্বামিত্র। এবার সারারাত ধরে তাঁর অপরূপ দেহসৌন্দর্যের সুরভিত নির্যাস পান করতে লাগলেন তিনি। পান করতে করতে মত্ত হয়ে উঠলেন ভীষণভাবে।

বিশ্বামিত্রের সেই নির্লজ্জ মত্ততা দর্শনে লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করল যেন দূর আকাশের নক্ষত্রদল। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে রইল স্তব্ধ ও উচ্চকিত দ্রুমদল।

সকাল হতে দুজনে বেরিয়ে এলেন কুটিরের মধ্য হতে। মেনকা একবার বললেন, এবার আমি যাই।

মেনকাকে নীরবে গাঢ় আলিংগনে আবদ্ধ করে তার ললাটে একটি চুম্বন করলেন বিশ্বামিত্র।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিশ্বামিত্রের মুখপানে চেয়ে রইলেন মেনকা। আর কোনো কথা বলতে পারলেন না।

মেনকার কিন্তু সত্য সত্যই আর যাবার ইচ্ছা ছিল না। এই নির্জন বনস্থলীর মাঝে শান্ত সুখী এক আশ্রমজীবনের প্রতি কোথায় যেন একটা গূঢ় আকর্ষণ ছিল তাঁর মনে।

বিশ্বামিত্র ও মেনকা দুজনেই দেখলেন, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সম্পূর্ণ এক নূতন রূপ

ধারণ করেছে যেন। তাঁরা দুজনেই অনুভব করলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ নূতন জীবন সূচনা করছে যেন আজকের এই নবপ্রভাত।

মধুস্রাবী পক্ষিকুলকণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে সমগ্র বনভূমি। চারিদিকে প্রস্ফুটিত পুন্নাগ কুসুমসৌরভে আমোদিত হয়ে উঠেছে বাতাস। দূরে মেরুপ্রদেশের যে সমুচ্চ শৃঙ্গদেশগুলি তারকাসুর ভেঙে নিয়ে গিয়ে তার বিহারশৈল রচনা করেছে, আজ বহুদিন পর রঙীন সূর্যাশ্বগুলি বড় মনোরম ভংগীতে বিচরণ করছে যেন সেখানে আবার। বহুদিন পর যেন অজস্র স্বর্ণকমল ফুটেছে শেতাব্জসুন্দর মন্দাকিনীর জলে।

নূতনভাবে বসবাস করার জন্য পরম আগ্রহে আর একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করলেন বিশ্বামিত্র।

অপ্সরার বেশভূষা ত্যাগ করলেন মেনকা। তারপর ঋতুসম্ভূত নানারকমের কুসুম-ভূষণ পরিধান করে গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হলেন। এই সরল অনাড়ম্বর প্রসাধনে দ্বিগুণ বর্ধিত হলো তাঁর দেহসৌন্দর্য।

স্বহস্তরচিত কুসুমভূষণে সজ্জিত হয়ে মেনকা যখন নত হয়ে প্রণাম করতেন বিশ্বামিত্রকে তখন তাঁর অলকদাম নিহিত গন্ধচূর্ণে কেমন যেন নেশা লাগত বিশ্বামিত্রের মনে। তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরে বুকের কাছে টেনে নিতেন মেনকাকে।

ইন্দ্রিয়ের যে সব দ্বারগুলি রুদ্ধ করে রেখেছিলেন এতদিন, এবার সেগুলি একেবারে উন্মুক্ত করে দিলেন বিশ্বামিত্র। দীর্ঘ অবদমনের পর আজ মেনকার দেহের মধ্য দিয়ে জগতের রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণকে উপভোগ করবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়। আজ সারা জগতের সমস্ত রূপ, রস এসে যেন একত্রিত হয়েছে মেনকার দেহের মধ্যে।

প্রায়ই দুচোখ ভরে মেনকার দেহটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন বিশ্বামিত্র। তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর হাত বুলিয়ে কী যেন অনুভব করতে থাকেন।

কখনও তাঁর দেহের আঘ্রাণ নেন। মঞ্জুভাষিণী মেনকার মধুর কণ্ঠ শোনবার জন্য সদাজাগ্রত ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে তাঁর কর্ণকুহর। মেনকার অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠকে সংযুক্ত করে যখন নিবিড়ভাবে চুম্বন করেন বিশ্বামিত্র, তখন মনে হয় মেনকার দেহসৌন্দর্যের সমস্ত রসনির্যাসটুকুকে তিনি শুধু আস্বাদনই করছেন না, বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছেন তা নিঃশেষে পান করবার জন্য।

জপতপ যে আজ কাল বিশ্বামিত্র একেবারে করেন না তা নয়। তবে দিনরাত্রির মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই কেটে যায় মেনকাকে নিয়ে।

একদিন দ্বিপ্রহরে যজ্ঞের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করতে গিয়ে ফিরে এলেন বিশ্বামিত্র। আশ্রমের মধ্যে গৃহকর্মে নিরত ছিলেন তখন মেনকা।

অকালে ফিরতে দেখে কাজ ফেলে ছুটে এলেন মেনকা। আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অসুস্থ ?

বিশ্বামিত্র মেনকার মুখচুম্বন করে বললেন, না মেনকা, তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি ক্ষণিকের জন্যও থাকতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি সর্বত্রই শুধু তোমাকেই দেখছি। সর্বক্ষণ মনে পড়ছে শুধু তোমারি কথা।

কথাটা শুনে মেনকা কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলেন না। শান্তকণ্ঠে তিনি শুধু বললেন, মনকে একটু সংযত ও শক্ত করুন আর্য। অতখানি বিচলিত হওয়া শোভা পায় না আপনার পক্ষে।

বিশ্বামিত্র করুণকণ্ঠে বললেন, কিছুতেই তা পেরে উঠছি না মেনকা। অন্তরীক্ষের নীলিমায় ও জলের স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত দেখছি তোমার মুখ, অরণ্যের হাওয়ায় শুনছি তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস। পাখির গানে ধ্বনিত হচ্ছে তোমার কণ্ঠ। ফুলের গন্ধে পাচ্ছি তোমার দেহসৌরভ। শুধু তাই নয় মেনকা, আজকাল যজ্ঞাগ্নির কুণ্ডলায়িত ধূমরাশির মধ্যে ভেসে ওঠে তোমার নৃত্যের ছন্দ। যজ্ঞকালে যখন উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরাত্ত এই ত্রিবিধ স্বরসংযোগে বেদবাক্যের ওংকার ধ্বনি আরম্ভ করি, তখন সে ধ্বনিকে ছাপিয়ে ওঠে তোমার সঙ্গীতের ধ্বনি।

সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলেন মেনকা। অসময়ের মেঘের মতো বিষাদের কালো ছায়া নেমে এলো তাঁর উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, এইজন্যই কামিনী-কাঞ্চনকে সাধনার ঘোর পরিপন্থী বলা হয় ঋষিবর। কিন্তু আপনি কেন একথা ভুলে যাচ্ছেন যে, গৃহের মধ্যে থেকেও অনেক তপস্বী সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের তপস্যায়। তাঁদের দাম্পত্য-সম্পর্ক বিশেষ সংযত হওয়ার জন্য তা কোনো বিঘ্নই সৃষ্টি করতে পারে নি তাঁদের তপস্যায়। কিন্তু আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার পর থেকে আপনি যে একজন ঋষি বা তপস্বী একথা একেবারে ভুলে যেতে বসেছেন।

একটু থেমে বিশ্বামিত্রের মুখপানে একবার বিশেষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন মেনকা। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, আপনার তপোবন আজ একজন ভোগী বিলাসীর গৃহে পরিণত হয়েছে। আজকাল প্রায়ই পুষ্পেরসনির্মিত মদ্যপানে গোলাপী নেশায় আঘূর্ণিত হয়ে থাকে আপনার নয়নযুগল। এক উগ্র কামচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে আপনার মন-প্রাণ।

মেনকাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ জোরে হেসে উঠলেন বিশ্বামিত্র। বললেন, তোমার এই মৃদু ভৎর্সনা আমার বড় মধুর লাগছে অপ্সরি!

মেনকা বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বলতে লাগলেন, আমায় আপনি সত্যসত্যই ভালবাসেন। আমার প্রতি আপনার এই প্রেমের জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু এই প্রেমের জন্য আপনি সাধনার পথ হতে বিচ্যুত হবেন, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

প্রেম মিথ্যা তা বলছি না। কিন্তু প্রেমের থেকে আরও বড় সত্য আছে জীবনে ঃ

সেই বৃহত্তর সত্য লাভের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে যে প্রেম সে প্রেমে মংগল নেই। কারো পক্ষেই কখন শুভ হতে পারে না সে প্রেম।

কিঞ্চিৎ রুষ্ট হলেন যেন বিশ্বামিত্র। বললেন, আমায় যত পারো ভর্ৎসনা করো, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি আমায় নীতি উপদেশ শোনাতে এস না। কী জানো তুমি প্রেম সম্পর্কে ?

মেনকা আর কোনো কথা বললেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, সে সত্য যত বড়ই হোক, প্রেমের সত্যকে না জানলে তা জানা যায় না। একদিক দিয়ে এই প্রেম সবচেয়ে বড় সত্য। বিশ্বসৃষ্টির সকল রহস্যের মূলে রয়েছে এই প্রেম।

কথাটা হয়ত ঠিক বুঝতে পারলেন না মেনকা। তাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বামিত্রের মুখপানে।

বিশ্বামিত্র বললেন, এই জগতে ও জীবনে মাত্র দুটো সত্য আছে—রাগ এবং দ্বেষ, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ। এই রাগ ও দ্বেষ হতেই উদ্ভব হয়েছে জীবন ও মৃত্যুর, প্রেম ও অপ্রেমের। এদের মধ্যে প্রেমই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ। এই প্রেমবোধের তাড়নাতেই জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা। নিজের অভিন্ন পরমাত্মাকে বিভক্ত করেছিলেন নারী ও পুরুষে।

সহসা কথা থামিয়ে চারিদিকে চেয়ে কী একবার দেখে নিলেন বিশ্বামিত্র। দ্বিপ্রহর পার হয়ে কখন অপরাহ্ণ এসেছে, শান্ত ঘন হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও ছিন্নভিন্ন বনছায়া, —কথায় কথায় দুজনে এমনই মত্ত হয়ে উঠেছেন যে সেদিকে কেউ একবার ফিরেও তাকান নি।

বিশ্বামিত্র বললেন, শুধু মানুষের জীবনে নয়, সমগ্র জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগতেও সব সময়ের জন্য চলেছে প্রেমের লীলা। এই প্রেমের নেশাতেই পরস্পরকে আকর্ষণ করে মহাশূন্যে ভাসছে গ্রহনক্ষত্রের দল। ঐ দেখ, প্রেমে আকুল হয়ে এক জায়গায় কখনো স্থির হয়ে থাকতে পারছে না বাতাস, ফেনিল নূপুর পরে নদী ছুটে চলেছে সমুদ্র-সংগমাভিমুখে ! প্রেমে মাতোয়ারা প্রতিটি বৃক্ষপত্র এক অপরূপ ছন্দভংগিমায় নিয়ত নৃত্যশীল। আরও দেখ, নিবিড় প্রেমালিংগনে আবদ্ধ হয়েই অণুপরমাণুগুলি গড়ে তুলেছে প্রতিটি বস্তুকে। অদম্য প্রেমের তাড়নাতেই ফুলের পরাগকেশর গর্ভকেশরে মিলিত হয়ে উৎপন্ন করে আশ্চর্য সুন্দর এক একটি কুসুমাবয়ব।

বেশী দূরে যেতে হবে না, কোনো এক মদচঞ্চল উতল মুহূর্তে গভীর প্রেমাবেশে তোমার পিতামাতা যদি মিলিত না হতেন তাহলে তোমার সৃষ্টি হ'ত না মেনকা। প্রেমের অভাব ঘটলেই পরস্পর হতে স্খলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সম্মিলিত অণু-পরমাণুর দল আর তার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় জীব; বিকৃতি প্রাপ্ত হয় বস্তু।

মেনকাকে আবার আলিংগন করে মৃদুভাবে একটি চুম্বন করলেন তাঁর ওষ্ঠে।

বিশ্বামিত্রের সব কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না মেনকা। কিন্তু তাঁর দুরন্ত যুক্তি-

গুলিকে খণ্ডন করবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। তাই নীরব হয়ে রইলেন বাধ্য হয়ে।

বিশ্বামিত্র বললেন, প্রেমের সহযোগেই সুন্দর হয়ে ওঠে এ জগতের সব বস্তু। আমি যদি তোমায় ভালো না বাসতাম তাহলে তোমার এই সুন্দর দেহাবয়বকে অসুন্দর মনে হ'ত আমার। হৃদয়ে যাদের প্রেম নেই তাদের কাছে ফুলের কোনো সৌন্দর্য নেই, চন্দ্রালোকের মধ্যে কোনো মাধুর্য নেই, সংগীতের সুরের মধ্যে কোনো মাদকতা নেই। প্রেম আছে বলেই মনে হয় মধুময় এই পৃথিবীর ধূলি। মধু ঝরে পড়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে।

যেদিন প্রেম থাকবে না, সেদিন অচল হয়ে উঠবে এই বিশ্বসৃষ্টি। সেদিন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কোনো কিছুই বেঁচে থাকবে না। সেদিন স্বর্গমর্ত্যব্যাপী সৃষ্টিহীন এক মহাশূন্যতায় নির্গুণ নিরাকার স্রষ্টা নিঃসঙ্গ বেদনায় কেঁদে কেঁদে ফিরবে।

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। তবু কিছুমাত্র পরিবর্তন হলো না বিশ্বামিত্রের। বিন্দুমাত্র স্তিমিত হলো না তাঁর দুরন্ত প্রেমাবেগ।

একদিন মেনকা সহসা বুঝতে পারলেন, গর্ভসঞ্চার হয়েছে তাঁর মধ্যে। এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণে সমস্ত দেহ মন দুলে উঠল মেনকার। তাঁর ক্ষীণ কটির নিম্নভাগে নধরস্ফীত নাভিদেশের চারিদিকে বারবার হাত বুলিয়ে কী যেন অনুভব করে দেখতে লাগলেন মেনকা। তাঁর এই দেহাবয়বের মধ্যে তাঁরই কাছ থেকে তিল তিল রক্ত মাংস নিয়ে দিনে দিনে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে গড়ে উঠছে একটি দেহমন্দির আর সেই দেহমন্দিরের মধ্যে বিগ্রহের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ নূতন একটি জীবন যার মধ্যে এক অপরূপ সার্থকতা লাভ করবেন তিনি—একথা ভাবতে ভাবতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন মেনকা।

উল্লাসিতাঙ্গী মেনকা সে আনন্দের বেগকে নিজের অন্তরে আর ধরে রাখতে পারলেন না। তাই ছুটে গিয়ে কথাটা বললেন বিশ্বামিত্রকে।

কথাটা শুনে কিন্তু মোটেই খুশি হতে পারলেন না বিশ্বামিত্র। শোনার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর এই আকস্মিক ভাব পরিবর্তনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন মেনকা।

যে সব কথা কোনোদিন ভাবেন নি বিশ্বামিত্র, আজ সেই সব কথা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন, এতদিন অর্থাৎ এই দীর্ঘ দশটি বছর ধরে প্রেমের সত্যকে জানতে গিয়ে মেনকার প্রেম ও সৌন্দর্যে বিভোর হয়েছিলেন। এর উপর আবার যদি সন্তানস্নেহে জড়িয়ে পড়েন তাহলে সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু ঘটবে তাঁর ঋষিজীবনের।

আজ সহসা যেন চমক ভাঙল তাঁর। তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো সত্যই চূড়ান্তভাবে

মহৎ নয়। কোনো একটি সত্যকে জানার সঙ্গে সঙ্গে নূতনতর আর একটি সত্যের সন্ধানে সাধনা করাই জীবনের প্রকৃত ধর্ম।

কাঁদতে কাঁদতে বিশ্বামিত্রের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লেন মেনকা। করুণকণ্ঠে বললেন, কী, কথা বলুন, নীরব কেন? এত বড় আনন্দের দিনে কেন আপনি এমন বিষাদগম্ভীর হয়ে উঠলেন সহসা?

মেনকার দেহমনের মধ্য দিয়ে যে সত্যকে জানতে ও আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন বিশ্বামিত্র, সে সত্যকে জানার সঙ্গে সঙ্গে মেনকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাঁর কাছে।

কিছুক্ষণ পর বিশ্বামিত্র শান্তগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এবার তুমি যাও মেনকা। আমার প্রেমসাধনা শেষ হয়েছে এবার। এবার থেকে নূতনতর এক সাধনায় নিয়োজিত করতে চাই নিজেকে।

মেনকা কাতরকণ্ঠে বললেন, তবে কি সব ভুল; তবে কি মিথ্যা স্তোকবাক্যে আমায় ভুলিয়ে রেখে নিজের হীন কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করেছেন দিনের পর দিন?

বিশ্বামিত্র বললেন, বিচলিত হয়ো না মেনকা। কোনো কিছুই মিথ্যা নয়। আমাদের অমর প্রেমের সাক্ষ্য দান করবে তোমার গর্ভস্থ সন্তান। আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে চিরদিন যুক্ত হয়ে থাকবে তোমার নাম। তোমার অপ্সরাজীবন অমরত্ব লাভ করবে আমার সঙ্গে। সাধনার দ্বারা ভবিষ্যতে দেবর্ষি বা ব্রহ্মর্ষি যত বড় ঋষিই হই না, আমার প্রেমিক সত্তাকে প্রমাণ করবে আমাদের এই সন্তান।

চোখের জল মুছে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন মেনকা। তখন সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে।

বহুদিন পর আবার একটি গোধূলি এলো। বিরহবিধুর এক নিষ্ঠুরতায় ধূসর এক গোধূলি। এক অব্যক্ত বেদনায় রক্তরঙীন হয়ে উঠেছে মেঘের প্রান্তভাগগুলি। সাথীহারা শূন্যতার এক স্তব্ধ হাহাকারে আত্মলীন হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস।

শেষবারের মতো বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন মেনকা। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে নীরবে আশীর্বাদ করলেন বিশ্বামিত্র।

ধীরে ধীরে কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন মেনকা। আজ তাঁর চরণে কোনো নৃত্যোচ্ছল চঞ্চলতা নেই। গতিভংগীর মধ্যে নেই কোনো মাদকতা। নয়নে নেই কোনো বংকিম কটাক্ষের জটিলতা।

এদিকে তখন বিষাদগম্ভীর অন্ধকার নেমে এসেছে শান্তনির্জন বনস্থলীতে আর পুষ্কর হ্রদের জলে। সেই অন্ধকারকে ভেদ করে যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠল ঋষি বিশ্বামিত্রের।

ধীরে ধীরে এক নিবিড় ধ্যানে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন বিশ্বামিত্র।

ইন্দ্র ও অহল্যা



মর্ত্যের শুচিশুভ্র কুন্দকলি অথবা স্বর্গের নন্দন কাননের পারিজাত—সকল কুসুমের মধ্যেই কীট আছে। কিরণোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের মধ্যে আছে কলংক। অনিন্দ্যসুন্দর নরনারীর রূপেরও বিরূপতা আছে। যে-কোনো মহৎ চরিত্রের মধ্যে আছে কালিমা কিন্তু আমি এমন এক নারী সৃষ্টি করেছি যার মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো 'হল' বা বিরূপতা নেই। সে হচ্ছে আমার অহল্যা।

স্বর্গের দেবতাদের সভায় একথা একদিন গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন পিতামহ ব্রহ্মা। একজন দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তাকে দেবী না করে মানবী করলেন কেন পিতামহ ? ব্রহ্মা বললেন, নারীজাতির মধ্যে আদর্শ স্থাপন করবার জন্যই আমি তাকে মানবী রূপে সৃষ্টি করেছি। কারণ মর্ত্যের মানবীরা স্বর্গের দেবীকে শ্রদ্ধা করতে পারে ; কিন্তু আদর্শ রূপে কখনো তাকে গণ্য করবে না। মানুষ মানুষের মধ্যেই একজনকে আদর্শ রূপে দেখতে চায়।

অহল্যাকে চোখে না দেখেই তাকে ভালবেসে ফেললেন ইন্দ্র।

ইন্দ্রের মনোভাব বুঝতে পেরে ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, স্বর্গের দেবরাজ হয়ে মর্ত্যের কোনো নারীরূপের মোহে এমন ভাবে বিচলিত হওয়া তোমার উচিত নয় বৎস।

ইন্দ্র বললেন, এ মোহ নয় পিতামহ। এ হচ্ছে আমার প্রেম। সমগ্র দেহ মন হতে উৎসারিত স্বচ্ছ সুন্দর একটি কামনা। তার কথা আপনার কাছে কানে শুনেই তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছি আমি। এ শুধু পূর্বরাগ নয়, এ আমার প্রগাঢ় প্রেম। অহল্যাকে আমায় আপনি দান করুন। তাকে পেয়ে আমি সুখী হব।

ব্রহ্মা বললেন, নারীসঙ্গ কামনায় চিত্ত তোমার চঞ্চল। তুমি কামাবিষ্ট। রূপলাবণ্য দ্বারা যে চিত্ত বিমোহিত, কামনার দ্বারা যে চিত্ত সংক্ষুব্ধ, সে চিত্তে কখনো কোনো মহৎ প্রেম জন্মগ্রহণ করতে পারে না। আর যে প্রেমে মহত্ত্ব নেই, সে প্রেমে মংগল নেই। যে মিলনে প্রকৃত প্রেম নেই, সে মিলনে সুখ নেই। সুতরাং আমার মানস-প্রতিমা অহল্যাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করতে পারি না দেবরাজ।

এক কুটিল ভ্রূভংগরেখায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল দেবরাজের অক্ষিযুগল। পিতামহ ব্রহ্মার কথায় ক্ষুব্ধ হযে উঠল তাঁর মন। এক তীব্র অসন্তোষ ফুটে উঠল তাঁর আয়ত মুখমণ্ডলে। কিন্তু কণ্ঠে কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করে তিনি বললেন, জানতে পারি কি পিতামহ, কে সেই ভাগ্যবান পুরুষ যার হাতে আপনি অহল্যাকে সমর্পণ করে সুখী হবেন ?

ব্রহ্মা বললেন, মহর্ষি গৌতম কোশল রাজ্যে গঙ্গার তীরে এক মনোরম তপোবনে তপস্যা করছেন। তিনি মহর্ষি ; কিন্তু দেবর্ষি ও পরে ব্রহ্মর্ষি হবার জন্য দুস্তর ও সুকঠোর তপস্যায় মগ্ন। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত প্রকারের রিপুপারবশ্য হতে মুক্ত। আমি তাই স্থির করেছি, সেই মহাত্মা গৌতমের হাতেই অহল্যাকে সম্প্রদান করব।

ব্রহ্মার কথার উপর আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না দেবরাজ ইন্দ্র। কিন্তু এক তীব্র

অপমানের জ্বালায় মনে মনে জ্বলতে লাগলেন। তিনি স্থির করলেন, পিতামহ ব্রহ্মা যাই বলুন, তিনি নিজে গিয়ে একবার অহল্যার সঙ্গে দেখা করবেন।

সত্যিই অপূর্ব। অহল্যাকে দেখে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেন না। কোনো কিছু বলতেও পারলেন না।

শ্বেতমর্মরের মতো শুভ্র মসৃণ দেহ নিটোল স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল। উন্নত পীনস্তন। আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ আলুলায়িত কুন্তল। আকর্ণ বিস্তৃত লীলায়িত ভ্রূবিন্যাসে সমুগ্ধ আয়ত উজ্জ্বল অক্ষিযুগল। মন্দগতি মেঘের মতোই গাম্ভীর্যপূর্ণ তাঁর গতিভংগী। পূর্ণচন্দ্রের প্রদীপ্ত মাধুর্য তাঁর মুখমণ্ডলে। সুগন্ধি মুকুলভারে অবনত আম্রশাখার মতো তাঁর স্নিগ্ধমেদুর কুমারীমনের সুবাসিত কমনীয়তা।

ইন্দ্রকে স্তম্ভিত ও হতবাক দেখে আশ্চর্য হলেন অহল্যা।

অহল্যাকে অনূঢ়া দেখে আশ্বস্ত হলেন ইন্দ্র।

অতিথি ভেবে ইন্দ্রকে পাদ্যর্ঘ দান করে শান্ত কণ্ঠে অহল্যা প্রশ্ন করলেন তাঁকে, আপনি কে এবং কি হেতু আপনার এখানে আগমন তা জানতে পারি কি আর্য?

ইন্দ্র বললেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। সুদূর স্বর্গ হতে তোমার কাছে অন্তরের এক আকুল কামনা নিয়ে এসেছি ঋষিকন্যা! যদি তুমি প্রসন্ন হয়ে অভয় দাও, তবেই সে কামনার কথাকে প্রকাশ করব অসংকোচে।

প্রথমটায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন অহল্যা। তারপর আস্তে আস্তে অবিশ্বাসের সুরে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে উপহাস করছেন কেন দেবরাজ? মর্ত্যের এক সামান্যা মানবী কিনা কামনা পূরণ করবে স্বর্গের দেবরাজের? আমার শ্রেষ্ঠতা মাপ করবেন, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। স্বর্গই হচ্ছে সমস্ত নরনারীর চরম এবং পরম লক্ষ্যস্থল। বিরামহীন বাসনার দ্বারা চিরচঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ এই মর্ত্যলোক। এখানে মরণশীল প্রতিটি মানুষের অন্তরে কামনার কখনো অন্ত নেই, তৃষ্ণার তৃপ্তি নেই, বুভুক্ষার নিবৃত্তি নেই। তাই তারা স্বর্গ চায়। স্বর্গ হচ্ছে তাদের কাছে এমন এক স্থান যেখানে গেলে তাদের সমস্ত কামনা বাসনা এক পরমাশ্চর্য পরিতৃপ্তি লাভ করে ধন্য হয়; চিরশান্ত এক অতিমানস চেতনায় লীন হয়ে যায় চিত্তের সমস্ত চঞ্চলতা; মরণশীল প্রতিটি ক্ষুদ্র প্রাণ অমরত্বের এক সুমহান ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। সেই স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হয়ে হীন কামনার ক্রীতদাসরূপে কেন আপনি এই মর্ত্যলোকে নেমে এলেন প্রভু?

নতজানু হয়ে হাতজোড় করে ইন্দ্রের মুখপানে সকরুণ নয়নে চেয়ে রইলেন অহল্যা।

ইন্দ্র বললেন, আমি দেবতা হলেও আমার দেহমন আছে এবং কোনো প্রাণীর মধ্যে দেহমন সংযুক্ত হলেই তার মধ্যে কামনা জাগবে। দেহের ধর্ম হচ্ছে অন্য একটি পরিপূর্ণ দেহের সঙ্গ চাওয়া। মনের ধর্ম হচ্ছে অন্য একটি দরদী মনের সাহচর্য

কামনা করা। পিতামহ ব্রহ্মার কাছে তোমার দেহের অফুরন্ত রূপের ঐশ্বর্য ও গুণের মহত্ত্ব শুনে আমার সমগ্র দেহমন তোমার জন্য এক অদম্য কামনায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে অহল্যা! তোমাকে না পেলে আমার সে কামনার শান্তি হবে না কোনোদিন।

এক অপরিসীম লজ্জার শিহরণে মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে উঠল অহল্যার সারা অঙ্গ। নম্রনত মুখখানা যথাসম্ভব নীচু করে অহল্যা বললেন, আপনি হয়ত জানেন না দেবরাজ, পিতামহ ব্রহ্মা আমায় মহর্ষি গৌতমের হাতে সম্প্রদান করবেন বলে স্থির করেছেন।

ইন্দ্র বললেন, তা আমি জানি।

অহল্যা বললেন, স্রষ্টার দ্বারা যা পূর্বনির্দিষ্ট বা পূর্বপরিকল্পিত, সৃষ্টির কাছে তাই হচ্ছে ভাগ্য। এই ভাগ্যের সীমারেখাকে লঙ্ঘন করবার কোনো অধিকার বা ক্ষমতাই সৃষ্টির নেই। আপনি তা জেনে আমার সঙ্গে কেন ছলনা করতে এসেছেন দেবরাজ?

ছলনা নয় অহল্যা! আমি আমার অন্তরের অনুভূত সত্যকে ব্যক্ত করতে এসেছি তোমার কাছে। এ সত্য হচ্ছে আমার প্রেম। আমার সমগ্র দেহমন হতে উদ্ভূত এক নিবিড় আসক্তি। নির্মম অবহেলায় এ সত্য তুমি পায়ে ঠেলে দিও না।

অহল্যা একটুখানি হাসলেন। বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত আলোকরেখার মতো সে হাসি তাঁর গম্ভীর মুখখানার উপর ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

গম্ভীরমুখে অহল্যা বললেন, কিন্তু দেবরাজ, আপনি যাকে অন্তরের সত্য বলছেন তা আপনার দেহগত এক জৈবিক ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যাকে প্রেম বলছেন তা আমার দেহের প্রতি আপনার এক উচ্ছ্বসিত কামাবেগ। আপনার প্রেমকে স্বীকার করছি। কিন্তু তাকে শ্রদ্ধা করতে পারছি না। এ প্রেমের হয়ত বেগ আছে; গভীরতাও আছে; কিন্তু মহত্ত্ব নেই।

অবাক বিস্ময়ে অহল্যার পানে চাইলেন ইন্দ্র। চেয়ে বললেন, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না অহল্যা।

শমীশাখার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক সূর্যরশ্মি এসে রাঙিয়ে দিল অহল্যার লজ্জারক্ত মুখখানাকে। মৃদু হাওয়ায় ঈষৎ দুলে উঠল তাঁর আলুলায়িত কেশপাশের দুটি চূর্ণ কুন্তল।

অহল্যা বললেন, আমার কথার অর্থ অতি সরল এবং স্পষ্ট দেবরাজ। পিতামহের কাছে আমার রূপের কথা শুনেই আমার রূপের প্রতি অদম্য লালসা জন্মে আপনার মনে। এই হীন রূপলালসা হতেই আপনার প্রেমের উৎপত্তি। আমার প্রতি আপনার যে আসঙ্গলিপ্সা তা হচ্ছে রূপগত আকর্ষণ। তার সঙ্গে গুণগত পরিচয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু রূপলালসাজনিত ক্ষণিকের চিত্তবিভ্রম হতে যে প্রেমের জন্ম তা একান্তভাবে ক্ষণকালীন দেবরাজ। তা কখনই চিত্তের স্থায়ী ভাবে পরিণত হতে পারে না। তাকে প্রেম না বলে কামজ মোহ বলাই শ্রেয়। তা রতি নয়, রাগ। দীর্ঘকাল

ধরে কারো বিভিন্ন সদ্‌গুণের নিবিড় পরিচয় থেকে তার প্রতি যে আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রতি। এই রতি নিষ্কাম ভক্তির সমান, যে ভক্তি দিয়ে আমরা দেবতার পুজো করি।

মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র। সামান্য একজন মানবীর কাছ থেকে এমনভাবে অপমানিত হতে হবে তাঁকে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু বাইরে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না তিনি। ভাবলেন, হয়ত তার রূপের গর্ব করছে অহল্যা। মৃগনাভির গন্ধে ব্যাকুল বনহরিণীর মতো আপন সৌন্দর্যচেতনার সুরভিতে মগ্ন ও মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে অহল্যা। রূপের মদগর্ব এমনি প্রবল হয়ে উঠেছে তার মধ্যে যে নিজেকে ছাড়া সে আর কোনোদিন কাউকে ভালবাসতে পারবে না, অপরের প্রেমের কোনো গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারবে না। আত্মরতি ছাড়া যে অন্য কোনো রতির কথাই জানে না, সত্যিকারের প্রেম কি জিনিস তা অন্তরে যে অনুভব করে নি কোনোদিন, সে অপরের প্রেমের সত্যাসত্য বিচার করতে যায় কোন্ সাহসে।

অনেকক্ষণ পর অহল্যা বললেন, এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, সামান্য একজন মানবী হয়েও আপনার মতো দেবতার প্রেম নিবেদনে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না কেন।

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ইন্দ্র, না বুঝতে পারলাম না, কেন তুমি পরীক্ষা না করেই আমার প্রেমকে অপ্রকৃত ও প্রকারান্তরে অসত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছ। যথাযথ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও বিচারের মধ্য দিয়েই কোনো বস্তুর সত্যাসত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকি আমরা। কিন্তু জ্ঞানলাভের এই সাধারণ রীতিটিকে তুমি লঙ্ঘন করছ অহল্যা।

অহল্যা বললেন, প্রেম হচ্ছে অপার্থিব বস্তু দেবরাজ। বাইরের কোনো জাগতিক বস্তু বা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার সত্যাসত্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবু যদি আপনি ইচ্ছা করেন, আপনার প্রেমের সত্যতা সম্পর্কে যথাযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন।

প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন ইন্দ্র। তারপর বললেন, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি অহল্যা, আমি আমার এই প্রেমের খাতিরে প্রয়োজন হলে ইন্দ্রত্ব ও দেবত্ব ত্যাগ করতে পারি। তোমার অন্তরের সিংহাসনে স্থান পেলে আমি স্বর্গের রাজসিংহাসনকে ত্যাগ করে এই মর্ত্যের মাটিতে এসে ঘর বাঁধতে পারি।

সহসা এক বেদনার্ত বিস্ময়ে চমকে উঠলেন অহল্যা। ইন্দ্রের প্রেম এতখানি খাঁটি হবে ভাবতেই পারেন নি তিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনার প্রেমের সত্যতাকে প্রমাণ করে কোনো ফল হবে না দেবরাজ। কারণ আপনি জানেন, আমাদের মিলন সম্ভব নয়। আপনার প্রেম যত খাঁটিই হোক আমি পিতামহ ব্রহ্মার অবাধ্য হতে পারি না।

ইন্দ্র বললেন, স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি চিরঋণী একথা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে

তার সারাজীবনের সুখ এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা স্রষ্টার কাছে চিরবিক্রীত একথা কিছুতেই স্বীকার করব না আমি।

অহল্যার পানে একবার চাইলেন ইন্দ্র। অহল্যাকে নীরব দেখে আবার বলতে শুরু করলেন, প্রকৃতিজগতে একবার চেয়ে দেখ অহল্যা, ধূলিকণা হতে নীহারিকা পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর একটি করে নিজস্ব গতি আছে, আছে এক একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর প্রতিটি কর্মপ্রয়াসে মূর্ত হয়ে ওঠে এক স্বাধীন ইচ্ছা।

আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগলেন অহল্যা। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। ছায়াঘেরা নির্জন বনভূমির শান্ত অবকাশে মাথার উপর শমীগাছের শাখায় দুটি কপোত কূজন করছে মনের নিবিড় আনন্দে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো স্থির হয়ে ইন্দ্রের দিকে দাঁড়িয়ে রইলেন অহল্যা।

ইন্দ্র বললেন, স্রষ্টা কখনো বলে দেয় না কোন্ কপোতী কোন্ কপোতকে সাথী করে বাসা বাঁধবে, কোন্ লতা কোন্ গাছকে জীবনে একমাত্র অবলম্বন করে জড়িয়ে ধরবে, কোন্ ফুলের গর্ভকেশর কোন্ ফুলের পরাগরেণুকে ধারণ করবে।

তাছাড়া আমাদের প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের পিছনে যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে ন্যায় বা অন্যায় কোনো কর্মের জন্যই আমাদের দায়ী করা চলবে না। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই বিশ্ব সংসারে আছে পাপ ও পুণ্যের অস্তিত্ব, আছে ন্যায় ও নীতির বিধান।

ইন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে সহসা করুণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন অহল্যা, এমন করে জটিল যুক্তিজাল বিস্তার করে আমার চিত্তকে দুর্বল করে দেবেন না দেবরাজ। আমার পিতামাতাকে আমি কোনোদিন দেখি নি। জন্মের পর হতে পিতামহ ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানেই এই নির্জন তপোবনে মানুষ হয়েছি। পিতামহ আমায় মহর্ষি গৌতমের হাতে সম্প্রদান করবেন এ কথা জানার পর হতে আমি মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করেছি দেবরাজ। এরপর দ্বিচারিণী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে ছাড়লেন না ইন্দ্র। বললেন, আর একবার ভেবে দেখ অহল্যা। মহর্ষি গৌতমের পত্নী হয়ে তুমি সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করবে একথা ঠিক ; কিন্তু সুখ পাবে না জীবনে। গৌতম একজন মহাতপস্বী ; জিতেন্দ্রিয়, মিতবাক ও নিয়ত ধ্যানগম্ভীর। সত্য ও অমৃতের উপাসক গৌতমের কাছে পারিবারিক সুখ হচ্ছে তুচ্ছ চিন্তাবিলাস, প্রেম হচ্ছে দুর্বলতা। অনলপ্রভ ব্যক্তিত্বের জ্যোতি তাঁর মুখমণ্ডলে। সূর্যসন্নিভ তাঁর তেজ। ভূমি হতে ভূমার প্রতি দৃষ্টি তাঁর ঊর্ধ্বায়িত। অধ্যাত্মসাধনার অনির্বাণ আগুনে তাঁর অন্তরের যে ধূসর আকাশখানা নিয়ত জ্বলছে, সকাম অনুরাগের কোনো বর্ণচ্ছটা জাগতে পাবে না সেখানে কোনোদিন। তিনি হবেন তোমার ভর্তা, স্বামী, তুমি হবে তাঁর ভার্যা, সেবাদাসী। অণুমাত্র প্রণয়ের কোনো মাধুরিমা থাকবে না তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে।

কোনো উত্তর দিলেন না অহল্যা। দু'হাত দিয়ে মুখখানাকে ঢেকে মৃদু কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে দেখলেন, তাঁর সামনে থেকে কখন অন্তর্হিত হয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র।

অহল্যার মনে হলো, সমগ্র পৃথিবীটাই যেন কাঁদছে। এক নির্জন কান্নার সকরুণ সমারোহ চলেছে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে। এক বিগলিত অন্তর্বেদনার অব্যক্ত মূর্ছনা অনুরণিত হয়ে উঠেছে চারিদিকের অশান্ত বনমর্মরে, কামার্ত পাখির কূজনে আর অশ্রান্ত নদীর কলতানে।

তবু গৌতমকে পেয়ে ইন্দ্রকে একেবারে ভুলে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন অহল্যা। নিজেকে বোঝাতে লাগলেন, বিধির বিধানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বাসনাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলাই হলো মানব জীবনের প্রকৃত ধর্ম। জীবনে যে সত্য অনাগত, যে বস্তু অনায়ত্ত তা শত আকাংক্ষিত হলেও তার প্রতি হতাশ্বাস ফেলে লাভ নেই। তার চেয়ে অবাঞ্ছিত হলেও যে সত্য সহজভাবে জীবনে এসে ধরা দিয়েছে তাকেই সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে গ্রহণ করে নেবেন অহল্যা। এই সত্যের নীরস আবর্তের মধ্যেই তৃপ্তির ফুল ফোটাবেন তিনি।

জাহ্নবীতীরে মিথিলার একটি উপবনে মহর্ষি গৌতমের তপোবনটি বড় চমৎকার। দিনরাত জপ তপ আর যাগ যজ্ঞ নিয়ে থাকেন মহর্ষি গৌতম। আর অহল্যা থাকেন সংসারের কাজকর্ম নিয়ে।

তবু মাঝে মাঝে কোনো উতল বসন্তপ্রভাবে কোনো অবগুণ্ঠিত ফুলের মুখে মধুগন্ধী হাসি ফোটাবার জন্য গুঞ্জন করতে থাকে যখন কোনো মদোন্মত্ত অলি, অথবা কোনো অলস দ্বিপ্রহরে এক শান্ত শমীশাখায় কূজন করতে থাকে কোনো কামার্ত কপোত-দম্পতী অথবা কোনো বর্ণগন্ধমদির অপরাহ্নে যখন দক্ষিণের মলয় বাতাসে মৃদুশিহরিত জাহ্নবীর বুকে জলকেলি করতে করতে কোনো চক্রবাক তার সাথীকে চুম্বন করতে থাকে, তখন দেবরাজ ইন্দ্রের কথা মনে পড়ে অহল্যার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শান্ত বুকের অতলে এক গোপন দ্বন্দ্বের শিহর জাগে।

এতদিনে বুঝতে পারলেন অহল্যা, দেবরাজ ইন্দ্রের কথাই ঠিক। তাঁর অতুলনীয় দেহসৌন্দর্যের কোনোদিন কোনো মূল্য দেবেন না মহাতপস্বী মহর্ষি গৌতম। তাঁর একনিষ্ঠ অবিচল প্রেমের দেবেন না কোনো মর্যাদা।

কতদিন কত মদির বসন্তঅপরাহ্নে তাঁর তিমিরকল্প কেশকলাপকে বিন্যস্ত করে মৃগনাভির দ্বারা কপোলফলককে রঞ্জিত করে ও কাঞ্চীদাম দ্বারা পীনস্তনকে শোভিত করে মহর্ষি গৌতমের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন অহল্যা। কিন্তু কোনো মদচঞ্চল কটাক্ষবিক্ষেপ দ্বারা তাঁর সেই প্রসাধিত দেহসৌন্দর্যকে কোনো স্বীকৃতি দেন নি গৌতম।

আসলে সকল ঋষিই অত্যন্ত স্বার্থপর। ব্রহ্মের ধ্যানে যাদের প্রাণমন নিঃশেষে সমর্পিত, মোক্ষলাভের জন্য যারা নিয়ত যোগনিরত, অপরের দেহমনের প্রতি তাকাবার অবকাশ কোথায় তাদের ?

কিন্তু আশ্চর্য ! গৌতমের এই নীরস ঔদাসীন্য রুক্ষ কঠিন এক প্রেমানুভূতি জাগিয়ে তুলল অহল্যার অন্তরে। এক নির্মম প্রতিকূলতায় প্রতিহত না হয়ে দিনে দিনে তীব্র হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল সে প্রেমানুভূতি।

অহল্যা ভাবলেন, এই প্রেমানুভূতির উত্তাপ দিয়ে ধীরে ধীরে বিগলিত করে তুলবেন গৌতমের হিমশীতল ঔদাসীন্যটাকে। গৌতম তাঁকে ভালো না বাসলেও বিপরীতরতি সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি ভালবেসে যাবেন গৌতমকে।

এমনি করে বহুদিন যাবার পর সহসা একদিন ফুল ফুটল মহর্ষি গৌতমের রুদ্র তপোবনে। ক্রমে সেই ফুল থেকে ফললো ফল। গর্ভলক্ষণ দেখা দিল অহল্যার মধ্যে। মহর্ষি গৌতম কিন্তু নির্বিকার। সুখে দুঃখে নির্বিকারচিত্ত থেকে সংসারের সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে এক অদ্বিতীয় সত্যকে দেখাই তাঁর ধর্ম। এদিকে অহল্যার কিন্তু উল্লাসচঞ্চলতার আর সীমা রইল না।

যথাসময়ে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন অহল্যা। গৌতম তাঁর নাম রাখলেন শতানন্দ। এক বৎসর অতিক্রান্ত হতেই আবার সন্তানসম্ভবা হলেন অহল্যা। কিছুটা বিরক্তি-বোধ করলেন গৌতম। দ্বিগুণ আনন্দ অনুভব করলেন অহল্যা। দেখতে দেখতে অহল্যা হয়ে উঠলেন যেন সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। অন্য মন। চিত্তের সমস্ত চঞ্চলতা যৌবনের সমস্ত প্রগলভতা স্নিগ্ধগম্ভীর এক মাতৃত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল নিঃশেষে।

কিন্তু সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মলয়বাতাস বইতে থাকে যখন মৃদুমন্দ, প্রিয়সখা কন্দর্প সহ ঋতুরাজ বসন্ত এগিয়ে আসতে থাকেন যখন মদালস গতিতে, যেন শুধু অহল্যার নয়, সংযতচিত্ত যোগনিমগ্ন গৌতমের মনটাও কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্য। শান্তস্নিগ্ধ তপোবনের হৃদয়ে দেখা দেয় এক মধুর উন্মাদনা। বৈরাগ্যের মাঝে আসে ক্ষণবিলাসের আবেগ। বিবর্ণ রুক্ষতার মাঝে আসে সকাম বাসনার বর্ণচ্ছটা।

অহল্যা তখন নানারকমের গন্ধদ্রব্য দিয়ে অঙ্গরাগ করেন। অবতংসরূপী নবপল্লব দ্বারা শোভিত করেন তাঁর কর্ণযুগলকে ; চন্দ্রহারতুল্য বকুলমালা পরেন পীনস্তনোন্নত গলদেশে এবং সুবিন্যস্ত কেশকলাপে সংযুক্ত করেন স্বর্ণোজ্জ্বল কর্ণিকার কুসুম।

ঋষিকুমারদ্বয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে চলে গেলেন শিক্ষালাভের জন্য। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করেন অহল্যা। প্রয়োজন না হলে কোনো কথা বলেন না মিতবাক গৌতম।

সেদিন কিন্তু প্রভাতকাল হতেই লঘুপক্ষ বলাকার মতো এক সুমধুর লীলাচপলতায়

চঞ্চল হয়ে উঠল গৌতমের মন। যোগাসনে বসলেন না সেদিন, কারণ বুঝলেন আজ তপস্যায় নিবন্ধ করা যাবে না এ মনকে। পরিহাসচ্ছলে দুই একটি মধুর কথা বলে অহল্যাকে প্রীত করতে লাগলেন গৌতম। অহল্যাও বেশ উপভোগ করতে লাগলেন প্রণয়কলাপতুল্য সেই সব কথাগুলিকে।

একসময় মহর্ষি গৌতম বললেন, ইন্দ্রিয়দ্বার একটু মুক্ত হলেই সে পথে মন নিয়ত বহির্মুখী হয়ে ছুটে চলে। বস্তুজগতের অজস্র উদ্দীপন অনিবারণীয় বেগে আকর্ষণ করে মনকে। তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারকে রুদ্ধ করে উল্টো সাধনের দ্বারা সংহত করতে হয় আমাদের মনকে।

মহর্ষি একটুখানি মৃদু হাসলেন। হেসে বললেন, অন্য বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও তোমার অতুলনীয় দেহসৌন্দর্যের মোহবন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করা খুবই কঠিন অহল্যা। তুমি হচ্ছ অয়স্কান্তমণি; তোমার আকর্ষণকে প্রতিহত করা লৌহের মতো কঠিনতম পদার্থেরও ক্ষমতা নেই।

কৃত্রিম অথচ নিবিড় এক অভিমানে ফুলে উঠলেন অহল্যা। বললেন, আমাকে আপনি দেখে শুনেই ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন মহর্ষি। তা সত্ত্বেও আপনি যদি মনে করেন আমি আপনার ধর্মসাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ তাহলে আপনি আমায় স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করতে পারেন। আপনার মঙ্গলের জন্য পরম আনন্দে আমি মেনে নেব আপনার সে বিধানকে।

আবার একটু হাসলেন মহর্ষি। তাঁর তেজোদীপ্ত শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল এক মধুর বর্ণরাগরেখা। হাসিমুখেই বললেন, কামিনী-কাঞ্চন উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক একথা জেনেও আমি তোমার মতো রূপরম্যা ভাস্বর-দেহিনী এক কামিনীকে গ্রহণ করেছি; তার কারণ এই যে চিত্তবিকারের প্রভূত উপাদান কাছে থাকা সত্ত্বেও যাঁর চিত্ত বিকৃত না হয় বা যিনি ধর্মপথ হতে বিচ্যুত না হন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সাধক।

তবু এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না অহল্যা। কারণ একথা বিশুদ্ধ প্রণয়ের কথা নয়। মহর্ষি গৌতমের কাছে অহল্যার রূপগুণের কোনো স্বকীয় মূল্য নেই। পুত্রসৃষ্টি ও আত্মশক্তির পরীক্ষা এই দুই আপন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁকে শুধু এক হীন ব্যবহারিক মূল্য দান করে থাকেন মহর্ষি গৌতম। অহল্যার রূপযৌবন হচ্ছে তাঁর কাছে এক নির্ভুল কষ্টিপাথর যার মাধ্যমে তাঁর চিত্তের শক্তি ও শুচিতাকে কষিত করে নিচ্ছেন তিনি অহরহ।

কিন্তু মহর্ষির কথায় কোনো প্রতিবাদ করলেন না অহল্যা।

কথায় কথায় এমনিতেই বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে যায়। আম্রমুকুলের গন্ধভরা বসন্তের মধ্যাহ্ন কেমন যেন অলস ও মন্থর হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। জাহ্নবীর জলে স্নান সেরে সমিধ আহরণ করে আনবার জন্য বেরিয়ে যান মহর্ষি। ভৃঙ্গারক হাতে নিয়ে আশ্রম-প্রাঙ্গণে রক্তাশোকমূলে জলসিঞ্চন করতে থাকেন অহল্যা।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তপোবন প্রাঙ্গণে মহর্ষি গৌতমের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্মিত হয়ে চাইলেন অহল্যা। এত শীঘ্র স্নান সেরে ফেরা কখনই সম্ভব নয় মহর্ষির পক্ষে।
আশিঞ্জিতনূপুর গজগামিনী অহল্যা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন প্রাঙ্গণের দিকে। সহসা থমকে স্থাণুর মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, গৌতম নন, মহর্ষির ছদ্মবেশে দেবরাজ ইন্দ্র।
এক অজানা আশংকায় মুহূর্তে পাণ্ডুর হয়ে উঠল অহল্যার মুখখানা। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি পরস্ত্রী, সন্তানের জননী, একথা জেনেও কেন ছলনার আশ্রয় নিয়ে আবার আমার সকাশে এসেছেন দেবরাজ?
ইন্দ্র বললেন, চিনতে যদি পেরেছ তো আমার মনের সব কথা শোনো অহল্যা। তুমি সেবার আমায় প্রত্যাখ্যান করার পর হতে এক তীব্র মর্মজ্বালায় জ্বলছি আমি। অবশ্য যদিও আমাদের এই দেহগত বিরহ তোমার প্রতি আমার প্রেমের প্রগাঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি কিছুমাত্র, যদিও শত যোজন দূরে থেকেও অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হয়ে আছ তুমি আমার অন্তরাত্মার সঙ্গে, যদিও মনে মনে আমাদের চিরমিলন দূরত্বের সমস্ত ব্যবধানকে বিলুপ্ত করে দিয়ে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে আজও, তথাপি শুধু একটিবারের জন্য তোমার দেহের সুধাকে পান করবার জন্য চিত্ত আমার চন্দ্রিকা-বিহ্বল চকোরের মতোই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে অহল্যা।
জলসম্ভূত একখানি মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে উঠলেন অহল্যা। রূঢ়ভাবে বললেন, ছিঃ দেবরাজ! একজন পরস্ত্রী সতীনারীর সঙ্গে আপনার এই হীন রমণেচ্ছাকে আপনি অকৃত্রিম প্রেমের পরকাষ্ঠা বলে অভিহিত করছেন!
কুটিল ও নির্লজ্জ এক হাসি ফুটে উঠল ইন্দ্রের মুখে। হেসে বললেন, সুন্দরী তুমি বড় নিষ্ঠুরা। তুমি বুঝতে পারছ না, আত্মিক বা দৈহিক যাই হোক, যে আসক্তির বশবর্তী হয়ে দেবতার অহংকার ত্যাগ করে সুদূর স্বর্গ হতে মর্ত্যলোকে ছুটে এসেছি, সে আসক্তি হীন হতে পারে না কখনো।
অহল্যাকে নীরব থাকতে দেখে ইন্দ্র বললেন, আয়তনয়না, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, এখন বসন্তকাল। প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের এই প্রশস্ত সময়। প্রিয়মিলনের আনন্দে উন্মত্তপ্রায় চেতন অচেতন প্রতিটি বস্তু। ওই দেখ, একটি পুষ্পদ্রুমের উপর কোনো একটি ভ্রমরী মধুপান করার পর তার পরিভুক্ত পীতাবশিষ্ট মধুটুকুকে ভালবেসে পান করছে তার প্রিয় ভ্রমর।
ওই দেখ, একটি ইঙ্গুদী গাছের তলে প্রেমালস একটি কৃষ্ণসার তার শৃঙ্গাগ্রভাগ দিয়ে নয়ন কণ্ডুয়ন করে দিচ্ছে তার প্রিয়তমার আর মদালসা মৃগীটি নিমীলিতনেত্রে তার প্রিয়তমের চিরবাঞ্ছিত স্পর্শসুখ অনুভব করছে। আরও দেখ, আরক্ত নবপল্লবগুচ্ছ-মণ্ডিত তরুদল তাদের শাখাবাহু দ্বারা ললিততরুণ নবপুষ্পিত লতাদের আলিঙ্গন করতে গিয়ে নিজেরাই আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে লতাজালে।
অভিমানিনী, তুমি হয়ত বলবে এ মিলন একান্তভাবে দৈহিক, এর সঙ্গে আত্মার কোনো

সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আমি বলব, এই দেহমিলনই আত্মিক মিলনকে সম্পূর্ণতা দান করে। তুমি হয়ত বলবে এ মিলন অবৈধ। কিন্তু আমি বলব অবৈধ হলেও এ মিলন বিশুদ্ধ। এর মধ্যে নেই কোনো উদ্দেশ্যের আবিলতা। আনন্দের আকাংক্ষাতে এর জন্ম, আনন্দলাভের মধ্যেই এর লয়।

তোমাদের দাম্পত্য জীবনে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে মিলন, সে মিলন বৈধ হলেও বিশুদ্ধ নয় কখনই। কারণ তার মধ্যে আছে পরস্পরের কর্তব্যবোধ, নীতির শাসন, পুত্র-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এ মিলনে তাই কেউ চরম ও পরম আনন্দ লাভ করতে পারে না।

কিন্তু মনে রেখো, এই আনন্দ দানের জন্যই বিশ্বসংসারে সকল বস্তুর সৃষ্টি। আনন্দই হচ্ছে পরমার্থ ব্রহ্ম। আনন্দ দানের মধ্যেই নির্ভর করছে সকল বস্তুর চরম সার্থকতা। যে বস্তু যত আনন্দ দান করতে পারে সে বস্তু তত সার্থক। তাই একমাত্র নিবিড় আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়েই কোনো বস্তুকে চরম মূল্য দান করতে পারি আমরা। একটি ফুলের জীবন একমাত্র তখনি হয়ে উঠবে সার্থক এবং স্বকীয় ও স্বতন্ত্রমূল্যে উজ্জ্বল যখন আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা তার সৌন্দর্যের সুষমাকে উপভোগ করব, আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা তার কোমলতাকে স্পর্শ করব, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদন করব তার সৌগন্ধকে।

পদ্মমুখি, তুমি বিরূপা হয়ো না। অনেক আশা নিয়ে এসেছি আমি। আজ আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করতে চাই তোমার দেহসৌন্দর্যকে। এই উপভোগের মধ্য দিয়ে যে বিশুদ্ধ আনন্দ আমি লাভ করব তা এক অপূর্ব সার্থকতা দান করবে আমাদের দুজনের জীবনকে।

কারণ আমি বিশ্বাস করি আজকের এই দেহসংগমের ফলে তোমার দেহের সমস্ত নির্যাস এক সুরভিত স্মৃতি হয়ে চিরদিন মিশে থাকবে আমার আত্মার সঙ্গে।

আর আমি কোনোদিন সশরীরে আসব না তোমার কাছে, যদিও মনে মনে আমাদের দেখা হবে প্রায়ই। তোমার কর্মহীন জাগরণের শান্তমধুর অবকাশে, নিভৃত স্বপ্নের বিলাসকুঞ্জে, তোমার স্নিগ্ধগভীর হৃদয়ের তন্দ্রালস প্রদেশে দেখা হবে আমাদের মাঝে মাঝে। আর আমি কোনোদিন তোমার কাছে এ ভিক্ষা চাইব না।

সারাদিনের গৃহকর্মের পর প্রতিদিন অপরাহ্নে কেশবিন্যাস করেন অহল্যা। কিন্তু গতকাল কেশপাশ মুক্ত থাকায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে। আলুলায়িতকেশা অহল্যা এতক্ষণ পুষ্পস্তবকভারে অবনত কোনো পল্লবদলের মতো ব্রীড়াবনত মুখে মাটির দিকে চেয়ে ইন্দ্রের কথা শুনছিলেন।

এবার ইন্দ্রের মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলেন অহল্যা।

মনে মনে উৎসাহিত বোধ করলেন ইন্দ্র। বললেন, সুকেশিনি, তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলরাশির মধ্যে রয়েছে রহস্যময় এক আরণ্যক কুটিলতা, ছলো ছলো এক তরল দুর্বলতা তোমার দৃষ্টিতে, এক উদ্ধত নিষ্ঠুরতা তোমার উত্তুঙ্গ ও কৃষ্ণবৃন্ত কুচাগ্রভাগে।

দেবরাজ ইন্দ্র যেন মায়াবিশারদ। কে জানত তাঁর কথায় এমন যাদু আছে। কে জানত তাঁর প্রতিটি কথার নির্মম আঘাতে অহল্যার সুকোমল প্রতিটি অঙ্গের গ্রন্থি শিথিলিত হয়ে উঠবে এমন ভাবে।

অহল্যা অনুভব করলেন, ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে তাঁর সারা দেহ। আত্মসংযমের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছেন তিনি একে একে।

ইন্দ্র বললেন, সুন্দরী তুমি পাষাণপ্রতিমা। তোমার অঙ্গে এত রূপ, কিন্তু অন্তরে প্রাণ কোথায়? তোমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড আছে কিন্তু হৃদয় নেই। তা থাকলে এই সকরুণ অনুনয়ে নিশ্চয়ই তা বিগলিত হতো।

মনে রেখো তৃষ্ণার্ত ভিক্ষুককে জল দান করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা প্রতিটি গৃহিণীর কর্তব্য।

দেবরাজ ইন্দ্র নই আমি। তোমার রূপের তৃষ্ণায় আর্ত ও আকুল এক ভিক্ষুক আমি। আমার তৃষ্ণাকে শান্ত ও নিবৃত্ত করা তোমার ধর্ম দয়াবতী।

সতীত্বের অহংকারে এই ধর্মে জলাঞ্জলি দিও না। মনে রেখো মহীয়সী, সতীত্ব মানব-হৃদয়ের একটি সামান্য গুণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু যে ধর্ম নির্গুণ অরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় মানুষকে, সে ধর্ম সমস্ত রূপগুণের থেকে বড়।

ইন্দ্রকে নিয়ে ধীরে ধীরে শয়নগৃহের দিকে এগিয়ে গেলেন অহল্যা।

দেখতে দেখতে পুরো একটি দণ্ড কেটে গেল। অহল্যা ব্যস্ত হয়ে বললেন, মহর্ষির প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত। আমি আপনার সাহচর্যে কৃতার্থ হয়েছি দেবরাজ। এবার আপনি যান। এবার মহর্ষির কোপবহ্নি থেকে আমাকে ও নিজেকে বাঁচান।

কিন্তু ঘর হতে বেরিয়ে বেশীদূরে যেতে পারলেন না দেবরাজ ইন্দ্র। সহসা মহর্ষি গৌতমকে সামনে উপস্থিত দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ভয়ে।

এদিকে গৌতমের কন্ঠস্বর শুনে ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হয়ে শয়নগৃহ হতে বেরিয়ে এলেন অহল্যা। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অহল্যার পানে চেয়েই তাঁর সারা অঙ্গে শৃঙ্গারলক্ষণ দেখতে পেলেন মহর্ষি।

অহল্যার অঙ্গের বসন তখন বিস্রস্ত। কণ্ঠের বকুলমালা ছিন্ন ভিন্ন। নির্মম নখচিহ্ন তার কুচযুগের উপর। কপোলফলকের উপর নিবিড়তম চুম্বনের এক নির্ভুল অভিজ্ঞান।

আগুনের মতো জ্বলতে লাগলেন মহর্ষি গৌতম। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলেন ইন্দ্র ও অহল্যা দুজনেই।

রোষকোষায়িত দৃষ্টিতে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে অভিশাপ দিলেন মহর্ষি। যে পুরুষত্বের দ্বারা অপরের ধর্মপত্নীকে ধর্ষণ করেছ তুমি, এখনি অঙ্গচ্যুত হবে তোমার সে পুরুষত্ব।

কাতরকণ্ঠে ইন্দ্র বললেন, যত ইচ্ছা আমায় অভিশাপ দিন মহর্ষি। কিন্তু অহল্যার কোনো দোষ নেই। কারণ আমিই তাঁকে এ কর্মে প্ররোচিত করেছি।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মহর্ষি বললেন, যে-কোনো কারণেই হোক, যে নারী এই সব পাপকর্মে জড়িয়ে থাকে অর্ধপাপ তার মধ্যে সঞ্চারিত হবেই।

তারপর অহল্যার পানে চেয়ে অভিশাপ দিলেন। সুরাসুরের দুর্নিরীক্ষ্য ও বায়ুভুক হয়ে সহস্র বৎসর তপস্যা করতে হবে তোমায় এই শূন্য তপোবনে। তারপর বিষ্ণুর অবতার রামের স্পর্শে পাপমুক্ত হয়ে আবার মিলিত হবে আমার সঙ্গে।

এই বলে কালবিলম্ব না করে দূর হিমালয়ে নূতন করে তপস্যা শুরু করতে চলে গেলেন মহর্ষি গৌতম।

দেখতে দেখতে বেদনাবিহ্বল ও হতবাক দেবরাজের দৃষ্টির সীমা হতে মুহূর্তে ধূমপরিবৃত এক দীপ্তশিখার মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেল অতুলনীয়া অহল্যার অনঙ্গবিমোহন রূপাবয়ব।

মতঙ্গ মুনি ও শবরী



পম্পাসরোবরের জলের মতো তার গায়ের রং। ঋজুশীর্ষ শল্লকীতরুর মতো তার সবল সুগঠিত দেহ। ঘনকৃষ্ণ কালসর্পের মতো অবিন্যস্ত তার কুটিল কেশকলাপ। সে কখন মতঙ্গবনে এসেছে তা এখানকার কেউ ঠিক বলতে পারবে না। তাকে যদি আশ্রমের কেউ জিজ্ঞাসা করে, কোথায় তার ঘর, কোথা হতে সে এসেছে, তাহলে মতঙ্গবনের ফাঁকে ফাঁকে দূরে যে ঋষ্যমূক পাহাড় দেখা যায়, সেই পাহাড়ের দিকে হাত বাড়িয়ে কী দেখায়।

তারপর বলতে থাকে, ওই পাহাড়টার ওপারে যে একটা ঝর্ণা আছে তার দু'পাশে বিরাট চন্দন আর মহুয়ার বন। সেই বনের মধ্যে আমাদের বাস। আমার বাবা হচ্ছে ব্যাধ; আমরা জাতিতে শবর। সকালে উঠেই আমার বাবা তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে যায়। আর আমার মা সারাদিন ধরে মহুয়ার মদ তৈরি করে। সন্ধ্যে হলেই আগুন জ্বালায়।

বাবা শিকার থেকে ফিরে এলেই শিকারের মাংসগুলো সেই আগুনে ঝলসানো হয়। তারপর সেই ঝলসানো মাংস আর মহুয়ার মদ খেয়ে নেশায় বিভোর হয়ে আমার বাবা ও মা দু'জনেই নাচতে শুরু করে। নাচতে নাচতে রাত গভীর হয়ে পড়ে।

আমার কিন্তু ওসব কিছুই ভালো লাগে না। ভালো লাগত না বলেই বাবা মাকে এড়িয়ে চলতাম আমি। খুব কম কথা বলতাম। সন্ধ্যে হলেই ওই পাহাড়টার একটা চূড়ার উপর একা একা বসে থাকতাম। ঝর্ণার গান শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম আমি। আমার বাবা মা কোনো খোঁজ করত না আমার।

এমনি করে কোনো এক চাঁদনী রাতে ওই পাহাড়ের উপর ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। বাইরে তখন চাঁদের আলো আর হাওয়ার হিল্লোলে মাতাল হয়ে উঠেছে পম্পার জল আর মহুয়ার বন। রাত পর্যন্ত নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে আমার বাবা মা। এমন সময় আমি সহসা ঘুমিয়ে পড়লাম।

চাঁদের আলো আমার কখনই ভালো লাগে না। চাঁদের আলো বড় চঞ্চল। কেমন যেন মত্ততা নিয়ে আসে মনের মধ্যে। মোহগ্রস্ত করে ফেলে সকল বস্তুকে। তার থেকে অন্ধকার ঢের ভালো। বড় শান্ত ও মধুর হচ্ছে অন্ধকার। মনকে তা স্বাভাবিকভাবেই আত্মস্থ ও মৌন করে তোলে।

চাঁদের আলো আমার ভালো লাগে না বলেই হয়তো একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সে রাত্রিতে। ঘুমোতে ঘুমোতে মাঝরাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। এক মধুর আনন্দ ও উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সারা শরীর। আমার জীবনের একটি অতিগোপন ইচ্ছা মূর্ত হয়ে উঠল সে স্বপ্নের মধ্যে।

শুধু যে মদ খেয়ে আমার বাবা মা নাচত বলেই আমি তাদের দেখতে পারতাম না তা নয়। তাদের উপর আমার রাগের অন্য একটা কারণ ছিল। আমি ছোট থেকে পাখির গান শুনতে ও হরিণের খেলা দেখতে ভালবাসতাম। আমার বাবা পাখি আর হরিণ দেখতে পেলেই তাদের নির্মমভাবে হত্যা করত।

আমি ফুলও খুব ভালবাসতাম। এত ভালবাসতাম যে, গাছ থেকে কোনো ফুল ছিঁড়তাম না। আপনা হতে যে ফুল গাছ হতে ঝরে পড়ত শুধু তাই নিয়ে খেলা করতাম আমি। কিন্তু আমার মা বড় নিষ্ঠুর। শুধু মহুয়া নয়, গাছ থেকে সবরকমের টাটকা ফুলগুলোকে ছিঁড়ে তাদের পিষে নিজেদের খাবার জন্য মদ তৈরী করত।

আমি ভেবেই পেতাম না, এই সব সুন্দর সজীব জিনিষকে মানুষ কি করে তার ক্ষুধার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

মনের নিভৃতে যা খুঁজছিলাম স্বপ্নের মধ্যে তাই পেয়ে গেলাম।

স্বপ্নে দেখলাম, আমি ঘুরতে ঘুরতে এমন এক তপোবনে এসে পড়েছি যে তপোবনের শান্তি কখনো কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ হয় না। কোনো হিংসা, বিরোধ বা বিষমতা প্রবেশ করতে পারে না তার ত্রিসীমানার মধ্যে। যেখানে ফুল কখনো শুকিয়ে ঝরে পড়ে না। পাখির গান যেখানে বন্ধ হয় না কখনো।

সেই তপোবনের মধ্যে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে এক মহাতেজস্বী ঋষির দেখা পেলাম আমি। তাঁকে দেখেই ভয় পেলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভয় দান করলেন আমায়।

এমনি করে সেই তপোবনের মধ্যে আমার জীবনের ঈপ্সিত আনন্দ খুঁজে পেলাম আমি। কিন্তু পরক্ষণেই স্বপ্নটা টুটে গেল আমার।

সে রাত্রিতে আর ঘুম হলো না আমার।

শুনেছি, ওই পাহাড়টা ব্রহ্মার তৈরি। ওই পাহাড়ের উপর ঘুমিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখলে সে স্বপ্ন সার্থক হয় অচিরে।

এজন্য সকাল হতেই আমার বাবা মাকে কিছু না বলেই আমার স্বপ্নে দেখা সেই তপোবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন হতে কত পাহাড়ে জংগলে কত ঘুরে বেড়ালাম তার জন্য। অবশেষে এখানে এসে উঠলাম।

এখানে আসার পর থেকে মতঙ্গ মুনির শিষ্যরা তাকে ভয় দেখিয়েছিল। বলেছিল তুই অস্পৃশ্য। এখানকার কোনো জিনিস তুই ছুঁবি না। কোনো দৌরাত্ম্য করবি না। তাহলে মুনি রেগে গিয়ে তোকে শাপ দেবে।

ও বলত, মুনিকে দেখবার জন্যই এখানে এসেছি।

ওরা জবাব দিল, মুনির সঙ্গে দেখা হবে না।

ঝর্ণার জলের মতো খিল খিল শব্দে হেসে উঠেছিল শবরী। হাসতে হাসতে বলেছিল, তাহলে আমি এখান থেকে যাব না। মুনির সঙ্গে দেখা না করে আমি এ বন ছেড়ে কোনোদিন যাব না।

শবরী আরও বলেছিল, আমি ব্যাধের মেয়ে। আমার গায়ে ভীষণ জোর। আমি তোমাদের এ আশ্রম লণ্ডভণ্ড করে দেব।

শবরীকে ঠকাবার জন্য শিষ্যরা একদিন তাদের মধ্যে একজনকে মতঙ্গ মুনি বলে উপস্থাপিত করল তার কাছে।

রাগে চীৎকার করে উঠল শবরী, না, না, ও সে মুনি নয়। তোমরা মিছে কথা বলছ। তোমাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তোমাদের কাউকে চাই না। আমি নিজে গিয়েই দেখা করব তাঁর সঙ্গে।

অবশেষে একদিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো শবরীর। দেখা হলো মতঙ্গ মুনির সঙ্গে। তিনি তখন ছিলেন ধ্যানমৌন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের মতো গম্ভীর, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির, তরংগসংঘাতবিহীন সমুদ্রের মতো শান্ত।

আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল শবরী। কেমন যেন ভয় হতে লাগল তার।

ভাবল, এই সেই মতঙ্গ মুনি আগুন জ্বলে যার ক্রোধে। হাসিতে যার মুক্তা ঝরে। ফুল হয়ে ফুটে ওঠে যার মুক্তানিভ স্বেদবিন্দু।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন মতঙ্গ মুনি। হয়তো ধ্যানের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন শবরীর মনের কথা। তার অখণ্ড হৃদয়ের আকুতি।

মতঙ্গ মুনির পায়ের উপর ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল শবরী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, সাধন ভজন কিছুই জানি না আমি। আমি শুধু একমাত্র আপনাকে জানি। স্বপ্নে আপনাকে দেখার পর হতে আপনাকেই প্রাণ মন সমর্পণ করেছি আমি।

শবরীর উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে রইলেন মতঙ্গ মুনি। তাঁর সে দৃষ্টির অর্থ কিছু বুঝতে পারল না শবরী।

শবরী করুণ কণ্ঠে বলল, এখানকার সবাই বলছিল, আমি অস্পৃশ্য। বলছিল, আমার দ্বারা এ আশ্রমের কোনো কাজ হবে না। বলছিল, আপনি নাকি আমায় কোনোদিন দেখা দেবেন না।

মতঙ্গ মুনির পা দুটোকে ধরে এবার নাড়া দিল শবরী।

কিন্তু কেন? কি পাপ আমি করেছি? আমার বাবা যদি পাখি মারে, আমার মা যদি ফুল থেকে মদ তৈরি করে তবে সে দোষ কি আমার? আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি তো কোনোদিন কারো প্রাণে কষ্ট দিই নি। নিজের প্রাণকে যেমন ভালবাসি তেমনি সকল পশু পাখি, কীট পতঙ্গ, তরুলতা ও ফুল ফলকে ভালবেসে এসেছি আমি ছোট থেকে। যে ফুল আপনা হতে ঝরে পড়ে তাই নিয়ে খেলা করেছি, যে ফল পেকে নিজের থেকে ঝরে পড়েছে তাই খেয়েছি। যে জলধারা আপনা হতে বয়ে চলেছে সেই স্বতঃপ্রবাহিত জল পান করেছি।

তবে কেন আমি অস্পৃশ্য হলাম, আপনি আমায় বুঝিয়ে দিন ঠাকুর। যারা পাপ করে একমাত্র তাদেরই তো অস্পৃশ্য বলা উচিত। কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করি নি।

এতক্ষণে স্নেহতরল এক স্নিগ্ধতা স্পষ্ট ফুটে উঠল মতঙ্গ মুনির দৃষ্টিতে।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন তুমি কি চাও ?

শবরী আশ্বস্ত হয়ে বলল, আমি শুধু তপোবনে থেকে আপনার সেবা করতে চাই। ধর্ম, ঈশ্বর, সাধন ভজন আমি কিছুই জানি না। আমি শুধু জানি আপনাকে। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। চোখ থাকতে আমি অন্ধ। আপনি হবেন আমার অন্ধের যষ্টি। আপনি স্বর্গে যেতে বললে স্বর্গে যাব, নরকে যেতে বললে তাই যাব। পাপ পুণ্য ভালো মন্দ কিছুই বিচার করব না।

মতঙ্গ মুনি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, তথাস্তু। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শবরী। তুমি এই আশ্রমে থেকে আমরা যা করব তাই করবে। তুমি ভগবানকে না জানলেও তুমি ভগবানকে একদিন এইখানে থেকেই পাবে। তুমি সম্পূর্ণরূপে অপাপবিদ্ধা। আমাদের থেকেও পবিত্র তুমি অন্তরে। তুমিই প্রকৃত সত্যসাধিকা।

অপার আনন্দে চোখে জল এলো শবরীর।

মতঙ্গ মুনি বললেন, তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি শবরী।

একজন প্রবীণ শিষ্য মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, আপনি ওকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিলেন কেন মুনিবর ? শবরীর মতো যুবতী নারী সাধনা ও সমাধির পথে ঘোর প্রতিবন্ধক।

মতঙ্গ মুনি মৃদু হেসে বললেন, ভোগের বস্তু নিকটে উপস্থিত থাকলে যাদের চিত্ত-বৈকল্য ঘটে, যারা হৃদয়কে সংযত রাখতে পারে না তারা কখনই প্রকৃত যোগী নয়। সংযম শিক্ষার এক মহাপরীক্ষা হবে এই নারী।

মতঙ্গ মুনির কথামতো মনের আনন্দে সপ্তসমুদ্রে স্নান করে এলো শবরী।

মতঙ্গ বনের শেষপ্রান্তে বড় মনোরম একটি বিরাট জলাশয় হচ্ছে এই সপ্তসমুদ্র। সবাই বলে সত্যসত্যই সাতটি সমুদ্র হতে আনীত জল মিশ্রিত আছে এই জলাশয়ে। এই সপ্তসমুদ্রের জল বড় স্বচ্ছ, শীতল আর শান্ত। নিয়তবায়ুতাড়িত হয়েও কখনো বিক্ষুব্ধ হয় না এর বক্ষস্থল। প্রখর সৌরতাপেও তপ্ত হয় না যার চিরশীতল অঙ্গ। এই সপ্তসমুদ্রে স্নান করে ত্রিতাপজ্বালা একেবারে জুড়িয়ে গেল শবরীর। স্নিগ্ধ হলো তার তাপিত দেহ। নবজীবন লাভ করল সে।

ধীরে ধীরে তাপসীর বেশ ধারণ করল শবরী। তার যৌবনসুলভ সুললিত লাবণ্য-লতিকায় এলো ম্লান রুক্ষতা।

শবরী নিজে কিন্তু কিছুতেই তপস্যায় বসে না। সে শুধু তাপসীর বেশে সেবা করে যায় মতঙ্গ মুনির।

পূজা ও অভিষেকের জন্য জল নিয়ে আসে সপ্তসমুদ্র হতে। ফুল ও পদ্মবীজ তুলে নিয়ে আসে মন্দাকিনীর জল হতে। যজ্ঞের কাষ্ঠ ও কুশাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে বিভিন্ন স্থান হতে। আসন বেদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রতিদিন সকালে। অপরাহ্নে বৃক্ষের আলবোলাগুলিতে ভৃংগারক হাতে জল দেয়। সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা দীপ জ্বালে সমাধি কুটিরে।

কিন্তু যার জন্য এত কিছু করছে শবরী, যাঁকে ছাড়া আর কোনো কিছু জানে না সে, তাঁর কিন্তু সেদিকে কোনো লক্ষ্য নেই। সম্পূর্ণ উদাসীন তিনি তার প্রতি। আপন মোক্ষের জন্য সতত ধ্যানমগ্ন তিনি।

অবশ্য শবরী কিছুই চায় না তাঁর কাছে। সে শুধু দিয়ে যেতে চায়। দিয়েই খুশী। কোনোদিন কিছুই পেতে চায় না তাঁর কাছে। পাবার জন্য সে দেয় না।

তাই স্ফুটকুসুমের সুবাসের মতো জ্বলন্ত ধূপের সুগন্ধিতনু শিখার মতো সে শুধু আপনাকে তিলে তিলে ক্ষয় করেই আনন্দ পায়।

তাই সে অকাতরে দান করে যায় তার অক্লান্ত দেহের সমস্ত শ্রম, তার অখণ্ড অন্তরের অফুরন্ত ভক্তি। এমনি এক আত্মঘাতী অথচ আধ্যাত্মিক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে শবরী।

সারাদিন আশ্রমের কাজকর্ম নিয়েই থাকে শবরী। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁক পেলেই ধ্যানমগ্ন মতঙ্গ মুনির কাছে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে দেখে, কিভাবে তিনি প্রাণবায়ুকে প্রাণায়ামের মধ্যে ধারণ করেন, কিভাবে তিনি যজ্ঞে আহুতি দান করেন। দেখে কেমন করে তিনি মাথার উপর সমস্ত রোদ বৃষ্টি সহ্য করেন।

আজকাল শবরীও মাথার উপর রোদবৃষ্টি সব সহ্য করে। কুটীরের মধ্যে আশ্রয় নেয় না। মতঙ্গ মুনির দেখাদেখি সেও বৃষ্টি এলে দাঁড়িয়ে ভেজে। প্রখর রৌদ্রে স্থির হয়ে বসে থেকে পুড়তে থাকে।

কিন্তু তার এই কৃচ্ছ্রসাধনের কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নেই। মোক্ষলাভের জন্য কোনো তপশ্চর্যার অঙ্গ হিসাবে এসব করে না সে। মতঙ্গ মুনির প্রতি তার অন্তরের গভীর ভক্তি ও ভালবাসার তাড়নাতেই এত সব কষ্ট স্বীকার তার।

সমাধিকালে মতঙ্গ মুনির দেহে যে সব ক্লেশ অনুভূত হয় সে সব ক্লেশ অপনোদন করতে পারে না শবরী। পারে না বলেই নিজের দেহ দিয়ে সেই সব ক্লেশের তীব্রতাকে অনুভব করে দেখতে চায়।

হোমাগ্নির তাপে অথবা প্রখর সূর্যকিরণে মতঙ্গ মুনির সারা দেহ স্বেদাক্ত হয়ে ওঠে যখন শবরী তখন নিজের পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সে স্বেদ মুছিয়ে দেয়। ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁকে কোনো বৃক্ষপত্র দ্বারা ব্যজন করবার জন্য। যখন তীব্র শৈত্যে পীড়িত বা প্রবল বৃষ্টিধারায় সিক্ত হয় মতঙ্গ মুনির শরীর তখন শবরীর মনে হয় কোনো বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে তাঁর মস্তক।

কিন্তু এসব নির্বিঘ্ন বলে করতে পারে না শবরী।

তাই দেখে মনে কষ্ট পায়। কষ্ট পেয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। নিজেকে বোঝায়, তার ভক্তি ও ভালবাসার যিনি শ্রেষ্ঠ ধন তিনি যখন রৌদ্রে তাপিত হন, তখন সে নিজে কোনোমতে কোনো স্নিগ্ধছায়া উপভোগ করতে পারে না। তিনি যখন বৃষ্টিসিক্ত হন তখন সে নিজে কখনো শুষ্ক কুটিরের আরামঘন মুহূর্ত যাপন করতে পারে না।

সারাদিনের ক্লান্তির পর মতঙ্গ মুনি সারারাত্রি বেশ গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন তাঁর কুটির মধ্যে। তাঁর শিষ্যরাও যথাস্থানে ঘুমিয়ে পড়ে সকলে।

এদিকে একা শুধু শবরীরই ঘুম আসে না চোখে।

এক একদিন গভীর রাত্রিতে কুটীরের পর্ণশয্যা ছেড়ে বাইরে এসে বসে শবরী। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দূর আকাশের নক্ষত্রদলের দিকে তাকিয়ে থাকে। যখনি কোনো ক্লান্তি আসে তখনি প্রকৃতি জীবনের কথা ভাবে। ভাবে, সারারাত্রির মধ্যে একটিবারের জন্যও তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না প্রকৃতির কোনো বস্তু, একটি মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হয়ে পড়ছে না ওই আকাশের নক্ষত্রদল। যেতে যেতে একবার ভুলেও থমকে দাঁড়াচ্ছে না নদীজলধারা। ফুল ফোটানোর যে নীরব প্রস্তুতি চলেছে গাছে গাছে সে প্রস্তুতি বিরাম নিচ্ছে না একটি বারের জন্যও।

অথচ এরা তো প্রতিদানে কিছুই চাইছে না।

প্রতিদানে শবরীও কিছুই চায় না।

তবু মাঝে মাঝে অভিমান জাগে শবরীর মনে।

তার সবচেয়ে বড় অভিমান, যাঁর জন্য জীবনের সব সুখ ত্যাগ করেছে সে, তিনি তার অন্তরের আসল দুঃখটা কোথায় তা একবারও দেখলেন না। যাঁর প্রতি সততনিবদ্ধ তার সযত্নসাধিত দৃষ্টি, তিনি একবার তার প্রতি ভালো করে ফিরে তাকালেনও না।

শবরীর মনে হলো, মতঙ্গ মুনি শুধু তাকে আশ্রমের বাইরে বাইরে থেকে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছেন,তাঁর কুটিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেন নি। তাঁর দেহ স্পর্শ করবার অনুমতি দেন নি। তা যদি না হবে কেন তবে রাত্রিতে তাঁর কুটিরের মধ্যে থাকতে দেন না তাকে। এই সময় কাছে থাকলে সে তাঁর পদসেবা করতে পারত, কোনো তৈল দ্বারা গাত্র মার্জনা করে দিতে পারত তাঁর।

কিন্তু একদিন অনুমতি মিলল।

একদিন সন্ধ্যায় মতঙ্গ মুনির কুটিরে ডাক পড়ল শবরীর। যে দিনটির জন্য দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে এসেছে সে, অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত বহুমূল্য দিনটি আপনা হতে এলো তাঁর জীবনে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল শবরী।

সেদিন সহসা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মতঙ্গ মুনি। শরীরের তাপমাত্রা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। ব্যথা অনুভব করেছিলেন সর্বাঙ্গে।

কম্পিত পায়ে কুটিরমধ্যে প্রবেশ করল শবরী। মতঙ্গ মুনির নির্দেশমতো কিছু বিল্ব ও শেফালিকাপত্রনিঃসৃত রস খাইয়ে দিল তাঁকে।

মতঙ্গ মুনি তাকে কাছে বসতে বললেন। ইতস্ততঃ করতে লাগল শবরী। সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে ফুলে উঠতে লাগল শবরী মনে মনে। এ অধিকার তাকে আরও আগে দেওয়া হয় নি কেন।

কাছে গিয়ে প্রথমে প্রণাম করল মুনিকে। হাত তুলে নীরবে আশীর্বাদ করলেন মতঙ্গ মুনি।

শবরী প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। মতঙ্গ মুনি আবার তাকে তাঁর কাছে বসবার জন্য ইশারায় জানালেন।

এবার কাছে গিয়ে বসল শবরী। মতঙ্গ মুনিকে স্পর্শ করল না। শক্ত কাঠের মতো হাত গুটিয়ে বসে রইল।

মতঙ্গ মুনি এবার তাঁর অঙ্গমর্দন করে দেবার জন্য স্পষ্ট অনুরোধ করলেন শবরীকে।

স্পষ্ট অভিমান ফুটে উঠল শবরীর কণ্ঠে, না না, আমি আপনাকে স্পর্শ করব না।

শবরীর মনের কথা বুঝতে পেরে মৃদু হাসলেন মতঙ্গ মুনি। হাসিমুখেই বললেন, আমার সেবা করবার লোকের অভাব নেই। তবু আজ তোমায় কেন ডেকেছি তা জান শবরী?

শবরী লজ্জারক্ত কণ্ঠে উত্তর করল, আপনি আমাকে দয়া করেন তাই।

ব্যস্ত হয়ে মতঙ্গ মুনি বললেন, না শবরী তোমাকে দয়া করবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি শবরী, আমার প্রতি তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে। এই ভক্তি ও নিষ্ঠার দ্বারা মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে।

মাথা নত করে শান্তকণ্ঠে বলল শবরী, আমি ভগবান কাকে বলে জানি না। আপনিই আমার কাছে ভগবান। ভক্তি ও ভালবাসাই হচ্ছে আমার একমাত্র সাধনা।

মতঙ্গ মুনি বললেন, তোমার সেই ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে আমার হৃদয়ের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছ শবরী। তোমাকে দেবার আর আমার কিছুই নেই। তুমি তোমার নিজের জোরেই সব কিছু নিয়ে নিয়েছ।

মৃদু কান্নার কণ্ঠ সহসা ঈষৎ রুদ্ধ হলো শবরীর। বলল, না না, ওকথা বলবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না। আমি শুধু আপনার সেবা করে যেতে চাই। সেই সেবা করবার অধিকারও আমি সব সময় পাই না, তাই আমার দুঃখ।

শবরীকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের হাতে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, এবার হতে তোমার আর সে দুঃখ থাকবে না শবরী। তুমি ইচ্ছামত যখন যা খুশি করবে। আজ হতে তোমার আমার দুজনের দেহ মনের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। তুমি হলে আমার অর্ধাঙ্গিনী।

আনন্দের চাপে অশ্রুর বেগ আরও বেড়ে গেল শবরীর। কোনো কথা বলতে পারল না সে।

মতঙ্গ মুনি বললেন, এবার হতে তুমি আমায় স্পর্শ করলে আর আমার সমাধি ভঙ্গ হবে না, ক্ষুণ্ন বা ব্যাহত হবে না আমার ব্রহ্মচর্য সাধন।

কথা শেষ করে শবরীকে চুম্বন করলেন মতঙ্গ মুনি।

জীবনে প্রথম পুরুষস্পর্শ পেয়ে অধরোষ্ঠটা একটুখানি কেঁপে উঠল শবরীর। অবাক বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল মতঙ্গ মুনির মুখপানে।

মতঙ্গমুনির অঙ্গমর্দন ও পদসেবা করে তাঁর কুটির হতে বেরিয়ে এলো যখন শবরী, রাত্রি তখন গভীর। ঘন ঘোর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে সপ্তসমুদ্রের জল ও মতঙ্গবনের সমস্ত তরুলতা।

শবরীর কিন্তু মনে হলো জীবনে বা জগতে কোথাও কোনো অন্ধকার বা জটিলতা নেই। মনে হলো, নক্ষত্রখচিত এক বিরাট আকাশ নেমে এসেছে তার অন্তরে। অরণ্য, ভূধর ও নদীসমুদ্র-সমন্বিত এক মহাপৃথিবী এসে বাসা বেঁধেছে তার প্রসারিত বুকে। মনে হলো, জীবনে যা চেয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী পেয়েছে। এত তো কোনো-দিন চায় নি। চাইবার স্পর্ধা হয় নি।

আপন কুটীরে গিয়ে প্রবেশ করল শবরী। আনন্দে চোখে একবারও ঘুম এলো না শবরীর সারারাতের মধ্যে।

এই মতঙ্গবনে আসার পর থেকে কত বসন্ত চলে গেছে তার চোখের সামনে দিয়ে। কোনোদিন একবার ফিরে তাকায় নি শবরী। কিন্তু আজ সকাল হতেই বসন্তসজ্জিত বনপ্রকৃতির সমস্ত রূপসম্ভার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। শুধু দেখল নয়, নিজেও সাজল।

আশ্রমের প্রাতঃকালের কাজকর্ম সব সেরে তৈলদ্বারা অঙ্গরাগ করে সপ্তসমুদ্রে স্নান করে এলো শবরী। তারপর আরক্ত বল্কলবসন পরিধান করে নানারকমের ফুলের অলংকার তৈরি করে তাই দিয়ে শোভিত করল সারা অংগ।

আজ আর তপস্যামগ্ন মতঙ্গমুনির কাছে বসে রইল না শবরী। বনের মধ্যে চারিদিকে ঘুরে বেড়াল ইচ্ছামত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে মতঙ্গমুনির যথারীতি আহ্নিক ও সামগান শেষ হলে কুটিরে গিয়ে মুনিকে প্রণাম করল শবরী। প্রণামকালে মাথা নত করতেই ঘনকৃষ্ণ বিন্যস্ত কেশপাশ হতে পদ্মরাগমণিতুল্য অরুণ অশোক পুষ্পগুচ্ছ খসে পড়ল।

আজ বসন্তপুষ্পাভরণা শবরীকে প্রথম এভাবে দেখে বিস্মিত হয়ে উঠলেন মতঙ্গ মুনি।

এদিকে তখন মতঙ্গবনের বাইরে অফুরান জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হয়ে উঠেছে সমগ্র পৃথিবী। ছায়াচ্ছন্ন তরুশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে সেই জ্যোৎস্নার ছটা পড়েছে বনের ভিতর। দেখে মনে হচ্ছে, শুভ্রধবল অজস্র প্রস্ফুটিত সিন্ধুবার কুসুম ছড়িয়ে দিয়েছে কে যেন সারা বনভূমির উপর।

মতঙ্গ মুনি ভাবলেন, বসন্তজ্যোৎস্নারএই মায়াময় প্রভাবে ও মারুত হিল্লোলের স্পর্শে কামাবিষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সংগম প্রার্থনা করছে শবরী। কিন্তু স্পষ্ট করে মুখ ফুটে বলতে পারছে না তাঁর কাছে।

তাকে পরীক্ষা করবার জন্য মতঙ্গ মুনি বললেন, তোমার যৌবনকাল পূর্ণ হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো পুরুষের সংগলিপ্সা বা কোনো সংগম লালসা অনুভব কর না শবরী?

প্রথমে মতঙ্গ মুনির কথাটা ভালো বুঝতে না পেরে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখপানে।

তারপর ধীরে ধীরে উত্তর করল, এখানে আসবার আগে যখন ওই ঋষ্যমূক পাহাড়টার উপরে শুতাম, মাঝে মাঝে এক একদিন আমার দেহের শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে একটা অসহ্য উত্তাপ অনুভব করতাম আমি। মনে হতো, কোনো বলিষ্ঠ পুরুষের নিবিড় স্পর্শ পেলে সে উত্তাপ যাবে আমার নিমেষে জুড়িয়ে। কিন্তু এখানে আসার পর থেকে সে উত্তাপ কোনো দিন কোনো মুহূর্তে অনুভব করি না আমি। কোনো দিন কোনো কামভাব জাগে না মনের মধ্যে।

মতঙ্গ মুনি তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না শবরী, অযত্নসাধিত হলেও তোমার যৌবন সৌন্দর্য দিনে দিনে কেমনভাবে বেড়ে চলেছে এবং স্পর্শদোষশূন্য তোমার এই যৌবনসৌন্দর্য কতখানি কামবিমোহিত করেছে আমায়।

সহসা এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হলো মতঙ্গমুনির চোখের কোণ হতে। তিনি বললেন, যদি বলি শবরী তোমার এই যৌবন সুধা পান না করলে শান্ত হবে না আমার কামবিক্ষুব্ধ চিত্ত।

নিজেকে অপরাধীর মতো মনে হলো শবরীর। ব্যথাহত কণ্ঠে বলল, কিন্তু আপনি যে ব্রহ্মচারী ঋষি মুনিবর। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে প্রশ্রয় দিলে ব্যাহত হবে আপনার কৃচ্ছ্রসাধিত এই ব্রহ্মচর্য। বিনষ্ট হবে আপনার তপস্যার সমস্ত ফল।

ভুল কথা। তুমি ঠিক জান না।

এক সোচ্চার প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন মতঙ্গ মুনি। বললেন, যদি কোনো ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ কোনো রেতঃপাত না ঘটিয়ে ধর্মপরায়ণ কোনো নারীসংগলাভের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাহলে তাতে তার ব্রহ্মচর্য সাধনায় কোনো বিঘ্ন ঘটে না।

শবরীর একখানি হাত ধরে ঈষৎ একটু টান দিলেন মতঙ্গ মুনি।

শবরী বলল, এ ধরনের কোনো চিন্তা বা ভোগবাসনা আমার মধ্যে জাগে না। আমি তাদের প্রশ্রয় দিতেও চাই না। তবে আপনাকে আমি ভক্তি করি ও ভালবাসি। আপনাকে খুশি করবার জন্য আমি যে কোনো কাজ করতে পারি। আমি স্বেচ্ছায় বিষ ভক্ষণ করতে পারি, নরকে পর্যন্ত যেতে পারি। আমার এই তুচ্ছ মরণশীল দেহদ্বারা যদি ক্ষণিকের জন্যও তৃপ্তি দান করতে পারি, তাহলে চিরদিনের মতো নিজেকে আমি ধন্য মনে করব মুনিবর।

মত্ত মাতঙ্গদ্বারা বিচ্ছিন্ন ব্রততীর মতো মতঙ্গ মুনির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল শবরী। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি স্বর্গ নরক কিছুই জানি না, আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই যাব। আমি পাপ পুণ্য জানি না, আপনি যা করতে বলবেন অকুণ্ঠভাবে তাই করব।

শবরীর মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন মতঙ্গ মুনি, ওঠ আর লজ্জা দিওনা শবরী। আমায় ক্ষমা করো। আজ আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল শবরী। তারপর মতঙ্গ মুনিকে প্রণাম করে নিঃশব্দে বেরিয়ে [illegible]র হতে।

কিন্তু বাইরে বেরিয়েই তার মনে হলো, জ্যোৎস্নার প্লাবনে পৃথিবী ভাসছে না, বিষাদের গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে সারা পৃথিবী। শুভ্রধবল সিন্ধুবার কুসুমে যেমন কীট আছে তেমনি চাঁদের আলোয় আছে অনপনেয় কলংকের কালিমা। পৃথিবীতে বিশুদ্ধভাবে সুন্দর বা মহৎ বলে কোনো বস্তু নেই।

জিতেন্দ্রিয় যে আদর্শ পুরুষকে দেখে এতদিন সংযম শিক্ষা করে এসেছে শবরী, আজ তিনি এতবড় অসংযমের কথা কেমন করে বলতে পারলেন তাকে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না সে।

অবশেষে নিজের যৌবনকে ধিক্কার দিল শবরী। স্থির করল, তার যে যৌবন প্রলোভিত করেছে মতঙ্গ মুনির মনকে সে যৌবনকে বিনষ্ট করে দেবে সে। চিরতরে ম্লান করে দেবে সে যৌবনের সকল সৌন্দর্য।

পরদিন বটগাছের আঠা আনিয়ে মাথায় জটা তৈরি করল শবরী। সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল কুসুম প্রসাধন ও অঙ্গরাগ। শুধু আপন সেবাকার্য করে যায় নীরবে। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে না। মতঙ্গ মুনির সঙ্গেও না। অথচ ভক্তি বা ভালবাসার কোনো ত্রুটি নেই।

এদিকে মতঙ্গ মুনিও কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন সেদিন হতে।

শবরী তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট মৃতকল্প সাধনাকে সজীব করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে অনেকখানি। শবরী সত্যসত্যই তাঁর প্রকৃত সহধর্মিণী।

অবশেষে একদিন সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন মতঙ্গ মুনি। স্বর্গযাত্রার আগে বিদায় চাইলেন শবরীর কাছে।

কথাটা শুনেই অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল শবরী। বলল, আমি আমার বলতে কিছু না রেখে সব সঁপে দিয়েছি আপনাকে। আর আপনি আমাকে ফেলে রেখে একা স্বর্গে চলে যাচ্ছেন! এতদূর নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর আপনি!

শবরীকে সান্ত্বনা দিয়ে মতঙ্গ মুনি বললেন, দুঃখ করো না শবরী, তোমার কাল এখনো পূর্ণ হয় নি। সময় হলে তুমিও সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে একদিন। মানব অবতাররূপী রামচন্দ্র ঘটনাক্রমে এই বনে এসে উপস্থিত হবেন যেদিন সেদিন তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবে শবরী। এবার হতে সেই ভগবানের ধ্যান করো অহর্নিশ।

শবরী কেঁদে বলল, আমি আগেই বলেছি, আপনি ছাড়া আর কাউকে জানি না আমি। আপনিই আমার ভগবান। আপনি চলে গেলে আপনার দেহনিঃসৃত স্বেদ-

বিন্দুজাত ওই সব ফুলগুলি দেখে ও তাদের আঘ্রাণ নিয়ে কাল কাটাব আমি। নিশিদিন আপনার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকব।

শবরী ভাবল, একদিন সে মতঙ্গমুনিকে দেহ দান করতে কুণ্ঠিত হয়েছিল। তাই তার উপর রাগ করে অকালে স্বর্গযাত্রা করছেন তিনি। তাই তাঁকে পেয়েও পেল না সে।

মতঙ্গ মুনির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে করুণ কণ্ঠে শবরী বলল, আপনি আমায় ক্ষমা করুন ঠাকুর। আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, দেহ মন নিঃশেষে অকুণ্ঠভাবে সমর্পণ করতে না পারলে আরাধ্য দেবতাকে কখনো পাওয়া যায় না। দেহের অভিমান একান্তভাবে অন্তরায় হয়ে ওঠে সে মিলনের পথে।

মতঙ্গ মুনি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন শবরীর পানে। মতঙ্গ মুনির পা দুটো ধরে নাড়া দিয়ে বলল, আজ আমার দেহ মন মান অভিমান সব গ্রহণ করুন ঠাকুর। তার বিনিময়ে শুধু আপনার এই দুটি চরণে মাথা রাখবার একটুখানি স্থান দিন।

মতঙ্গমুনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এইভাবে যদি আমায় বাধা দাও তাহলে আমার স্বর্গলাভ সার্থক হবে না শবরী। এইভাবে যদি আমাদের প্রেমকে সংকীর্ণ করে তোলো তাহলে তোমার আমার দুজনেরই মোক্ষলাভের পথে বাধা হয়ে উঠবে সে প্রেম। কিন্তু মনে রেখো মহৎ প্রেম কখনো মানুষকে মুক্তির পথে বাধা দেয় না, তার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে তাকে ঠেলে দেয় সে পথে। তাই মহৎ প্রেমসাধনার সঙ্গে কোনো পার্থক্যই নেই মুক্তিসাধনার।

মতঙ্গ মুনির কথামতো সপ্তসমুদ্রের জলে শুদ্ধভাবে স্নান করে এলো শবরী। তারপর তার কানে এক বীজমন্ত্র দীক্ষা দিলেন মতঙ্গ মুনি। সেদিন হতে দিবারাত্রি একমনে সে মন্ত্র জপ করতে লাগল শবরী।

পবনদেব ও অঞ্জনা



সুমেরু পর্বতের সুরম্য ক্রীড়াপ্রাসাদ হতে প্রতিদিন অপরাহ্ণে বেরিয়ে সরোবরে স্নান করতে যান যখন অঞ্জনা, তখন তাঁর ক্ষিপ্রচরণের দোলনে মন্দার ফুল খসে পড়ে তাঁর সুচারু কবরীস্তবক হতে। তখন কোথা হতে উতল বাতাস এসে তাঁর কলহংসচিত্রিত সুগন্ধ বসনাঞ্চলখানিকে দুলিয়ে দেয়। কাঁচুলিপিষ্ট অথচ উদ্ধত ও দোলায়িত পীবরস্তনের উপর শোভিত মুক্তাজালটি আলোড়িত হতে থাকে প্রবলভাবে।

সুমেরু পর্বতের নিতম্বদেশে সেই দীঘল সরোবরের সোপানগুলি সবুজ মরকত শিলা দিয়ে বাঁধানো। সোনার পদ্ম ফুটে থাকে তার কাজল কালো জলে। আর সেই পদ্মের মৃণালগুলি সুনীল বৈদূর্যমণির দ্বারা নির্মিত।

জলে নেমে প্রথমে অঙ্গরাগ ধৌত করেন অঞ্জনা। তারপর নীলমণিময় মৃণালের উপর বিকশিত স্বর্ণপদ্ম নিয়ে আপনার মনে খেলা করেন কিছুক্ষণ। তারপর স্নানশেষে শূন্য স্বর্ণকলসখানি পূর্ণ করে নিয়ে সিক্ত বসনে তাঁর উচ্ছলিত যৌবনসৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করে মদমন্থরগতিতে প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে যান যখন অঞ্জনা, তখন কেমন যেন সহসা চঞ্চল ও উন্মত্ত হয়ে ওঠে চারিদিকের উদাস বাতাস। আর সেই বাতাসের স্পর্শে এক শিরশিরে কাঁপন জাগে অঞ্জনার সারা দেহে।

এদিকে তাঁর ফিরে আসার মুহূর্তটির জন্য পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকেন রাজা কেশরী। তাঁর এই স্নানান্তিক দেহসৌন্দর্যকে উপভোগ করবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। অঞ্জনার এই ক্ষণকালের অনুপস্থিতিটুকুও তাঁর পক্ষে অসহ্য। অঞ্জনা কিছুক্ষণ না থাকলে এক অপূরণীয় শূন্যতায় কেমন যেন হাহাকার করতে থাকে অজস্র মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদের কুট্টিমগুলি। সমস্ত ঐশ্বর্য হয়ে ওঠে অর্থহীন।

মাঝে মাঝে তাই অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করেন রাজা কেশরী, একদিনও কি না গেলে চলে না? হাসিমুখে উত্তর দেন অঞ্জনা, না, একদিনও না।

সত্যিই। একদিনও না গিয়ে থাকতে পারেন না অঞ্জনা। অপরাহ্ণের ক্লান্ত সূর্যরশ্মি-গুলি স্নিগ্ধরঙীন হয়ে ওঠে যখন একে একে, ধীরে ধীরে ক্রীড়াপ্রাসাদের দীর্ঘ ছায়া ঘন হয়ে ওঠে চারিদিকের পর্বতের উপলখণ্ডের উপর, ঠিক তখনি মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অঞ্জনার। কিছুতেই আর মনকে নিবদ্ধ রাখতে পারেন না সেই মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদের মধ্যে ধাতব পিঞ্জরের।

রাজা কেশরী এক একদিন বলেন, তোমার এতদূরে যাবার প্রয়োজন কি অঞ্জনা! আমি প্রাসাদের সীমানার মধ্যে এর থেকে আরও ভালো একটি সরোবর নির্মাণ করব তোমার জন্য।

অঞ্জনা আপত্তি করে বলেন, না মহারাজ, দিনরাত এই প্রাসাদের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। প্রস্তরনির্মিত ও অজস্র মণিমুক্তাখচিত এই প্রাসাদের কৃত্রিম ঐশ্বর্যের মধ্যে আমার দেহমনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফেলি হারিয়ে। মাঝে মাঝে কেমন যেন ক্ষুদ্র ও ম্লান বলে মনে হয় নিজেকে।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কেশরী। কিন্তু তাঁকে তা বলবার সুযোগ দিলেন না অঞ্জনা।

অঞ্জনা বলে চললেন, তাই মাঝে মাঝে এই জনবহুল প্রাসাদ হতে দূরে গিয়ে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে নিজের দেহমনকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয় মহারাজ। সেখানে গিয়ে মনে হয়, সমুদ্রমেখলা, অরণ্যকুন্তলা ও পর্বতস্তনিত বিরাট পৃথিবীর আমি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, আমিও বড়। আমি তখন বাতাসের সঙ্গে কথা বলি, জলের সঙ্গে খেলা করি, আলোর সঙ্গে হাসাহাসি করি। পাহাড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

কেশরী তখন বললেন, একান্তই যাবে যদি তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে অম্ভো বিহার করব সরোবরের জলে।

তাতেও কিন্তু ঘোর আপত্তি অঞ্জনার। তিনি বললেন, আপনি তো আমার সঙ্গে সর্বক্ষণই বিহার করছেন মহারাজ। আপনার অবিরাম সাহচর্যে আমি ধন্য। আমাদের দুজনের এই অবাধমধুর মিলন আমাদের প্রেমকে দিনে দিনে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে এই ক্ষণকালীন বিরহটুকুরও প্রয়োজন আছে মহারাজ।

আশ্চর্য হয়ে একবার অঞ্জনার মুখপানে চাইলেন রাজা কেশরী।

অঞ্জনা তার অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, ক্ষণকালীন হলেও এই বিরহের মধ্যে পরস্পরের অভাবকে অনুভব করব আমরা। আর সেই অভাবের মধ্য দিয়ে জীবনে আমরা উপলব্ধি করতে পারব পরস্পরের এক প্রণয়মধুর গুরুত্ব।

কেশরী বললেন, যুক্তিতে তোমার সঙ্গে আমি পেরে উঠব না কুঞ্জরতনয়া। তবু আমার ভয় হয়। তাই বলি তোমার কোনো বিশ্বস্ত সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

অঞ্জনা বললেন, ভুলে যাবেন না মহারাজ, মহাবীর বানররাজ কুঞ্জর আমার পিতা। আপনি আমার স্বামী। বিপদ হতে কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হয় বীর নারীদের তা জানা উচিত। তাছাড়া এখানে বিপদের সম্ভাবনাই বা কোথায়! কার সাধ্য মহারাজ কেশরীর এই সুরক্ষিত রাজ্যে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীর কেশাগ্র স্পর্শ করে? এ ভয় আপনার অমূলক মহারাজ।

হয়তো তাই। মহারাজ কেশরীও তাই ভাবলেন। তাই চুপ করে গেলেন।

এমনি করে দিনের পর দিন তর্কে হেরে গিয়েছেন কেশরী। এমনি করে প্রতিদিন রক্তিম অপরাহ্ণে তাঁর খুশি নীল মনের ব্যাকুল একটি বাসনাকে চরিতার্থ করবার জন্য বনচ্ছায়াবিম্বিত কৃষ্ণসলিল এক সরোবরে ছুটে গিয়েছেন অপ্রতিরোধ্যা অঞ্জনা।

সহসা একদিন বিপদ দেখা দিল অঞ্জনার। ঠিক বিপদ নয়। শুধু কিছুটা বিপন্ন বোধ করলেন অঞ্জনা।

সেদিন স্নান সেরে ঘাটে উঠতে যাবেন এমন সময় অঞ্জনা দেখলেন দীর্ঘদেহী এক সুন্দর পুরুষ অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছেন। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ। কর্ণে মকর কুণ্ডল,

কণ্ঠে বনমালা। দীর্ঘ বিন্যস্ত কেশপাশ। হাসিমুখে এতক্ষণ হয়তো একদৃষ্টে অবলোকন করছিলেন স্নানরতা অঞ্জনাকে।

নীল মরকত শিলাময় সোপানের উপর রক্তপদ্মতুল্য পদযুগল স্থাপন করে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন অঞ্জনা। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন সাহস সঞ্চয় করে।

কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না অঞ্জনা।

এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের মধ্যে কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল অশরীরী সেই পুরুষ। ঠিক মনে হলো, কোনো মানুষ নয়। কোনো এক চঞ্চল চতুর মানুষের ছলচপল একটি ছায়া যেন অঞ্জনার চোখের সঙ্গে একবার প্রতারণা খেলে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

কথাটা কিন্তু কেশরীকে বললেন না অঞ্জনা। তবু এক গোপন শংকার অভিঘাতে বিকম্পিত হতে লাগল তাঁর প্রতিটি বক্ষঃপঞ্জর।

পরদিন আবার যথাসময়ে অঙ্গরাগ করে স্নানে বার হলেন অঞ্জনা। ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলেন চারিদিকে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না।

জলে নেমে অঙ্গরাগ ধৌত করলেন অঞ্জনা। তারপর যত শীঘ্র সম্ভব স্নানটা সেরে নিলেন। আজ আর স্বর্ণপদ্ম নিয়ে খেলা করলেন না একটি বারের জন্যও। সুন্দর সুবর্তুল মৃণালবাহু দ্বারা জলরাশিকে আঘাত করে ঢেউ জাগালেন না সরোবরের বুকে।

স্নানান্তে সেই মরকত শিলানির্মিত সোপানে আরোহণ করে সিক্ত বসনখানি গায়ে জড়িয়ে নিজের উদ্ধত উচ্ছলিত যৌবনকে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন অঞ্জনা। তারপর শংকিত বনহরিণীর মতো চকিত নয়নে চারিদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন।

সহসা এক উচ্চ অট্টহাসিতে চমকে উঠলেন অঞ্জনা। মুহূর্তে তাঁর স্বর্ণকলসখানি পড়ে গেল তাঁর শিথিল কটিতট হতে।

কিন্তু আজ আর কোনো ছায়া নয়। ভীতিবিহ্বল অঞ্জনা আজ স্পষ্ট দেখলেন, তাঁর সামনে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই দীর্ঘদেহী পুরুষ। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুন্দর সুঠাম তাঁর দেহভংগিমা। গতকাল যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমনটি। শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্যের এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোনো মানবদেহের মধ্যে কখনো দেখেন নি অঞ্জনা। প্রদীপ্ত জ্যোতির সঙ্গে মধুর হাসির এমন মিশ্রণ আর কখনো দেখেন নি কারো মুখমণ্ডলের উপর।

শত সুন্দর হলেও সে মূর্তি বড় ভীষণ।

দৃঢ়কাম কোনো কিরাতের অব্যর্থ শরসম্মুখে কম্প্রবক্ষ কোনো মৃগললনার মতো এক অব্যক্ত অপরিসীম ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল অঞ্জনার সারা শরীর।

তবু জোর করে বুকে সাহস এনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করলেন, কে

আপনি ? কেন আপনি হীন কামাচারী লম্পটের মতো পরনারীর প্রতি এমনভাবে লালসাসিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ?

মূর্তিটি কাছে এগিয়ে এসে হাসিমুখে উত্তর করল, আমি পবনদেব। তারপর অঞ্জনাকে আর কোনো কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই পবনদেব নিবিড় নিষ্ঠুর আলিংগনে জড়িয়ে ধরলেন অলসগাত্রী অঞ্জনাকে।

অঞ্জনা প্রাণপণ শক্তিতে কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে পরিক্লান্ত হয়ে উঠলেন। ঘৃণা ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন, ছিঃ আপনি এত নীচ ! পরস্ত্রীকে একা পেয়ে এমন অবৈধভাবে আলিংগন করতে এতটুকু কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করছেন না ? নিজেকে আবার স্বর্গের দেবতা রূপে পরিচয় দিচ্ছেন আপনি !

তেমনি হাসিমুখে পবনদেব বললেন, যে-কোনো কটুভাষায় ভূষিত করতে পার আমায় সুন্দরি। কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার প্রতি এক দুর্দমনীয় প্রীতি সঞ্জাত হয়েছে আমার অন্তরে। অবৈধ হলেও এ প্রীতি আমার জৈব অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ হতে উত্থিত, হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অনুরাগে অনুরঞ্জিত।

আর শোনবার ধৈর্য হয় না অঞ্জনার। ভয়ংকর ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করেন, কি চান আপনি ?

শান্তকণ্ঠে উত্তর করলেন পবনদেব, আমি তোমার অনুমতি না নিয়েই মনে মনে তোমাতে সংগত হয়ে মনমৈথুন করেছি তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন। তোমার এই অপরূপ দেহসৌন্দর্য দেখে আমার কামপ্রবৃত্তি এমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল যে অধর্ম জেনেও আমি তা প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি নি। আজ তাই দেহ দিয়ে তোমার দেহকে ভোগ করে সে বাসনাকে সার্থক করতে চাই আমি।

ক্রোধের আতিশয্যে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল অঞ্জনার। তবু কোনোরকমে বললেন, আপনার রুচিকে ধিক। দেবতা হলেও মানুষ হতে আপনি অনেক ইতর। আপনার কি কোনো ধর্মপত্নী নেই ? আপনার এই হীন কামপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য আপনি কি স্বর্গে কোনো অপ্সরা বা মর্ত্যে কোনো বারবনিতাকে খুঁজে পাননি ?

পবনদেব হাসলেন। ঈষদ্বিকশিত হাসিটা এবার ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখমন্ডলে।

আপনি এসেছেন আমার মতো পতিগতপ্রাণা একজন সতীনারীর কাছে এই হীন বাসনা নিয়ে ? মনে রাখবেন আমি সুমেরু দেশের রাজা কেশরীর স্ত্রী। আমি স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। আমি প্রাণ গেলেও দেহ দান করতে পারব না অন্য পুরুষকে, মানব, দানব, দেবতা বা গন্ধর্ব যেই হোক না কেন সে পুরুষ।

রাগতভাবে চলে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা। কিন্তু পবনদেব ডাকলেন।

ডেকে বললেন, আমি পবন সর্বত্রসঞ্চারী। অবাধ আমার গতি। অগ্নি ও জলকে সকলে আবদ্ধ করতে পারে বা তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু আমাকে কেউ তা পারে না। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের সকল জীবকে আমি ইচ্ছামত স্পর্শ করতে পারি।

কিন্তু আসল কথাটা শোনবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন অঞ্জনা।
পবনদেব বললেন, আমার গতিপথে আমি বহু মানবী দানবী, সুরকন্যা ও গন্ধর্বকন্যা দেখেছি ; কিন্তু তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কামবিমোহিত হয়ে উঠেছি এমনটি আর কখনো কাউকে দেখে হই নি। চন্দ্রবিনিন্দিত তোমার সস্মিত বদন। জ্যোৎস্নার কুন্দধবল আলোও ম্লান হয়ে যায় তোমার হাসির কাছে। তোমার মধুর বচনবিন্যাস মন্দিররক্ষিত শুকের ভাষাকেও লজ্জা দেয় ! তোমার নিশ্বাসগন্ধে কমলগন্ধসুরভিত বাতাসও অবজ্ঞাত হয়।
কোনো উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন অঞ্জনা!
এ বিষয়ে আজও কোনো কথাই বললেন না মহারাজ কেশরীর কাছে। কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়লেন মনে মনে এবং সেই চিন্তার স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠলো তাঁর চোখে মুখে। তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তরে কেশরীও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু অঞ্জনা নিজে থেকে কিছু না বলায় তিনি আর জোর করলেন না এ নিয়ে।
প্রাসাদবক্ষের মধ্যে সবচেয়ে সুরম্য যে ঘরটি, সেইটিই রতিমন্দির রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই রতিমন্দিরের মধ্যে রত্নখচিত শয়নপর্যংকের উপর চন্দ্রকান্তমণির ঝালর দেওয়া চন্দ্রাতপ খাটানো আছে।
কিন্তু সারারাতের মধ্যে একবারও ঘুম এলো না অঞ্জনার। সেই স্বর্ণপালংকের উপর শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন অঞ্জনা। কেবলি সেই পবনদেবের চেহারাটা ভাসতে লাগল চোখের সামনে। স্বামীর বাহুবন্ধনে বার বার আবদ্ধ হয়েও মনকে আবদ্ধ করতে পারলেন না অঞ্জনা।
শুধু বিস্মিত নয়, বেশ কিছুটা রুষ্ট হলেন রাজা কেশরী। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন আস্তে আস্তে।
ঘটনাটাকে এতক্ষণে একটা বিপদ বলে মনে হলো অঞ্জনার—যে বিপদ দেহটাকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও ভেঙে চুরে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায় মনের স্বাভাবিক ভিত্তিটাকে। যে বিপদের কথাকে বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করে বলা যায় না। যার জ্বলন্ত বেদনাকে মনের মধ্যে নিজের হাতে চেপে রেখে জ্বলে পুড়ে মরতে হয় নিজে নিজে।
পরদিন সকাল হতেই অঞ্জনা ভাবলেন, আজ আর বিকালে স্নান করতে যাবেন না সেই সরোবরে। শুধু আজ নয় আর কোনোদিনই যাবেন না।
প্রতিদিন কোথাও যেতে যেতে সহসা যদি যাওয়া বন্ধ করতে হয় তাহলে তার কারণটাও খুলে বলতে হবে রাজা কেশরীর কাছে। কিন্তু তার জন্য লজ্জার যে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা, পরাজয়ের যে তিক্ত গ্লানি আর অপমানের যে তীব্র বেদনা সহ্য করতে হবে তার কথা ভেবে শিউরে উঠলেন অঞ্জনা।
তাছাড়া পবনদেবকে যতখানি ভয় করছেন ততখানি ভয়ের কিছু নেই। এই ভেবেও কিছুটা আশ্বস্ত হলেন অঞ্জনা। তিনি নিজে ঠিক থাকলেই হলো। তিনি যদি সম্মত

না হন, তাহলে তাঁর উপর নিশ্চয়ই বলপ্রয়োগ করবেন না পবনদেব। মুখে যাই বলুন পরস্ত্রীকে জোর করে ধর্ষণ করতে পারেন না কিছুতেই। এতখানি কখনো নীচ হতে পারেন না তিনি দেবতা হয়ে।

এমনি করে দিনকতক একটু শক্ত হয়ে থাকলেই পবনদেব আর কোনোদিন জ্বালাতন করতে আসবেন না তাঁকে। তাঁরকাছ থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসবে তাঁর অত্যুগ্র কামনার বহ্নিশিখা। সমস্ত ঘটনাটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারবেন তিনি। এ নিয়ে আর কোনো চিন্তাই বিঘ্নিত করতে থাকবে না তাঁর মনের সহজ শান্তিকে।

অন্যদিনকার মতো অপরাহ্ণ হতেই আজও স্বর্ণকলস নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন চঞ্চল-বিলোচনা অঞ্জনা। ঠিক এই সময়টায় মনটা তাঁর এমনি মদচঞ্চল হয়ে ওঠে যে, না গিয়ে ঘরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে। সরোবরে স্নান করতে যাওয়া এক অভ্যাসজাত কর্মরূপে তাঁর জৈবিকতার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে এখন যে, সে কাজের জন্য কোনো সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না, এখন সে কাজ তিনি না করে থাকতে পারেন না।

বিকাল হতেই প্রাসাদপ্রকোষ্ঠের স্বর্ণমণিজালগুলি দেখে সরোবরের জলের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় স্নিগ্ধ সরোবরের বিপুলকৃষ্ণ জলরাশি ম্লান চোখে তাঁর পানে চেয়ে রয়েছে। পথের দু'পাশের ফুল তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পথে নামতেই রক্তবসনের স্বর্ণাঞ্চলটি বাতাসে একবার আন্দোলিত হয়ে উঠল অঞ্জনার। সঙ্গে সঙ্গে অমনি পবনদেবের কথা মনে পড়ল। মনে হলো বাতাসের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে আছেন সর্বত্রসঞ্চারী পবনদেব। এই বাতাসের মধ্য দিয়েই কামমত্ত চিত্তের লালসাসিক্ত দৃষ্টিতে অশরীরী স্পর্শে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে নির্লজ্জভাবে তিনি হয়ত উপভোগ করছেন তাঁর এই রূপযৌবনকে।

সমস্ত দেহটা কেমন যেন অলিচুম্বিত পুষ্পলতার মতো শিহরিত হয়ে উঠল অঞ্জনার। মন্দ মধুর বাতাসটাকে মনে হলো বিষাক্ত।

তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে যেতে লাগলেন অঞ্জনা।

কিন্তু আজ আর জলে নামতে হলো না। সরোবরের শিলা সোপানে পা দিতেই চমকে উঠলেন অঞ্জনা। তাঁর সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন পবনদেব। তাঁর নীরব নিষ্করুণ চোখে মুখে এক অবৈধ উন্মত্ত আহ্বান।

অধৈর্য হয়ে অঞ্জনা বললেন, আজ আবার আপনি এসেছেন?

মধুর হাসি হেসে উত্তর করলেন পবনদেব, তুমি জান না সুন্দরী, তোমাকে একবার দেখে তোমাকে ছেড়ে থাকাটা কতখানি কষ্টকর।

ক্রোধে বাকরুদ্ধ হলো অঞ্জনার।

তেমনি হেসে পবনদেব বলল, সুন্দরি, তুমি সেই সেব সুলক্ষণা ললনাদের অন্যতমা

যারা অকালে ফুল ফোটাবার জন্য অশোকে বাম-পাদের আঘাত ও বকুলে মুখোচ্ছিষ্ট মদিরা সিঞ্চন করে থাকে। এইভাবে যদি শুষ্ক তরুর নীরস হৃদয়কে রসময় করে তুলতে পার, কেন তবে আমার উষ্ণব্যাকুল হৃদয়ের অনুরাগরসপরিপূর্ণ কামনার কুসুমগুলিকে ফুটিয়ে তুলবে না?

এবারও কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না অঞ্জনার।

পবনদেব বললেন, সুন্দরি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, চন্দ্রের আকর্ষণে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে যেমন সমুদ্রের জল, বসন্ত আগমনে দিকে দিকে প্রস্ফুটিত হয় যেমন কুসুমদল, তেমনি তোমার যৌবনলাবণ্য দর্শনে আমার জীবন কোরকের মধ্যে ফুটে ওঠবার জন্য এক অত্যুষ্ণ প্রবলতায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কতকগুলি দুরন্ত কামনার ফুল।

এই বলে অঞ্জনার দেহটাকে আলিংগনের জন্য পবনদেব উদ্যত হতেই দূরে সরে গেলেন অঞ্জনা। তারপর চীৎকার করে বললেন, আমায় যতটা অসহায় ভাবছেন ততখানি অসহায় আমি নই। আমি এখান থেকে বিপদসূচক চীৎকার করলে প্রাসাদ থেকে শুনতে পাবেন রাজা কেশরী। তিনি আমায় এমনি ভালবাসেন যে আমি এই সরোবরে স্নান করতে এলে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অস্থিরভাবে পদচারণা করতে থাকেন প্রাসাদ-শীর্ষে। তিনি আমার এই অবস্থা দেখতে পেলে মুহূর্তে অসংখ্য সৈন্য পাঠিয়ে দেবেন আমার রক্ষার জন্য।

অট্টহাসি হাসলেন পবনদেব। সে হাসির আঘাতে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত কেঁপে উঠল অঞ্জনার। স্খলিত হয়ে যেতে লাগল তাঁর প্রতিটি বক্ষঃপঞ্জর।

পবনদেব বললেন, মনে রেখো সুন্দরি, বাতাস আমারি আদেশে প্রবাহিত হয়। আমি নিষেধ করে দিলে বাতাস তোমার কোনো শব্দকে বহন করে নিয়ে যাবে না এ স্থান হতে প্রাসাদশীর্ষে। আমার আদেশে স্বচ্ছ বায়ুস্তর নিমেষে ঘন হয়ে অদৃশ্য করে তুলবে তোমায় রাজা কেশরীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টি হতে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার সুন্দরি।

কিন্তু তাতেও কিছুমাত্র দমলেন না অঞ্জনা। বরং শক্ত হয়ে উঠলেন আরও। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমি প্রাণ থাকতে আমার দেহ স্পর্শ করতে দেব না আপনাকে। আপনি বলপ্রয়োগ করতে গেলে আমি আত্মহত্যা করব আপনার সামনে।

পবনদেব বললেন, অকারণে উত্তেজিত হচ্ছ তুমি সুন্দরি।

অঞ্জনাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন পবনদেব। বললেন, আত্মা হচ্ছে অমূল্য। দেহ হতে যে আত্মা সব সময়ের জন্য বড়, সে আত্মা তোমার আমি চাই নি। আমি শুধু চেয়েছি তোমার দেহকে ক্ষণিকের জন্য একবার ভোগ করতে। অকারণে অমূল্য আত্মাকে ত্যাগ করতে পারবে, আর একটি কামনাকে তৃপ্ত করবার জন্য একবার দান করতে পারবে না তোমার ওই তুচ্ছ দেহটাকে? এমনি নিষ্ঠুরা তুমি! তাছাড়া ভুলে যেও না সুন্দরি, এজন্মটাই সব নয়। এজন্মের পূর্বে ও পরে জীবন আছে। রাজা কেশরীকে তুমি পেয়েছ শুধু এ জন্মে। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় জন্ম-

জন্মান্তরের। পূর্বজন্মে তুমি ছিলে স্বর্গের অপ্সরা পুঞ্জীকস্থলা। তুমি মর্ত্য-জীবনের স্বাভাবিক মায়াপ্রভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছ সে কথা।

দৃপ্তকণ্ঠে অঞ্জনা বললেন, সে কথা আজ আমি মনে আনতে চাই না। আজ বর্তমানই আমার কাছে মহাসত্য। এ সত্য ত্যাগ করে অতীতের মাঝে ফিরে যেতে আমি পারব না পবনদেব। আপনি চলে যান। আমি আমার স্বামীকে ভালবাসি।

স্বামীপ্রেম হতে সন্তানকেই সকল যুগের সকল নারী বড় বলে মনে করে সুন্দরি।

অঞ্জনার কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন পবনদেব।

চমকে উঠলেন অঞ্জনা। সন্তান! আপনি জানেন না বিবাহিতা হলেও আমি নিঃসন্তানা।

পবনদেব আবার হাসলেন। হেসে বললেন, আমি তা জানি। আমার সব কথা না শুনেই অধৈর্য হয়ে উঠেছ তুমি।

পবনদেব একটু থেমে বললেন, তুমি হয়ত জান না, যে সংগম আমি কামনা করছি আমাদের সেই সংগমের ফলে এক মহাবলশালী পুত্র জন্মলাভ করবে তোমার গর্ভে। কেশরীর ক্ষেত্রজ হলেও আমারি নামে বিশ্বজগতে পরিচিত হবে সে সন্তান।

ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলেন অঞ্জনা।

পবনদেব আবার বললেন, সে পুত্র একদিকে যেমন হবে ধর্মপ্রাণ এবং বিবিধ গুণের আকর তেমনি দেহের দিক থেকে হবে অমিত বিক্রমশালী ও বীর্যবান।

পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অঞ্জনা। তিনি সহসা অনুভব করলেন পবনদেবের সঙ্গে বিরোধিতা করবার সমস্ত শক্তি একে একে স্তিমিত হয়ে আসছে তাঁর।

পবনদেব বললেন, তুমি যদি মনে করো, নরনারীর সংগমের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, দৈহিক সুখ বা জৈবিক তৃপ্তি তাহলে ভুল করবে সুন্দরি। দৈহিক সুখ ছাড়াও সকল সংগমেরই বৃহত্তর একটা উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হলো মহৎ কিছু সৃষ্টি। এই মহৎ সৃষ্টির জন্য আজ আমি মিলিত হতে চাই তোমার সঙ্গে।

এই বলে অঞ্জনার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন পবনদেব। প্রতিবাদের শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন অঞ্জনা।

পবনদেব বললেন, জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যেই নির্ভর করছে জীবনের চরমতম সার্থকতা। জীবদেহের সমস্ত সুষমা তার সত্তার সমস্ত মহিমা নূতনতর রূপ পরিগ্রহ করে তার সৃষ্টির মধ্যে। ওই দেখ, বসন্তের আগমনে নবোদ্ভিন্ন যে সব কচি কিশলয়গুলি এক মসৃণ পুষ্টতা লাভ করে নধর কান্তিতে নৃত্য করছে, দুদিন পর ওরা শুকিয়ে ঝরে যাবে এবং ওদের বৃন্ত হতে নূতন পত্রোদ্গম হবে। ওই দেখ, গাছে গাছে যে সব নয়নাভিরাম কুসুমগুচ্ছে শোভা পাচ্ছে, দুদিন পরে তারা ফলে পরিণত হবে। সার্থকতামণ্ডিত হয়ে উঠবে তাদের বর্ণগন্ধের নশ্বর ঐশ্বর্য।

তোমার এই অনবদ্য দেহসৌন্দর্য ফুলের সঙ্গে যদি স্বচ্ছন্দে উপমিত হয় তাহলে তোমার সন্তান হবে তার স্বাভাবিক ফল। মানব দেহ যদি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী হয় তাহলে তার যৌবন ও সৌন্দর্য হচ্ছে আরও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তোমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহসৌন্দর্য এক অপরূপ পরিণতি ও সার্থকতা লাভ করবে তোমার সন্তানের মধ্যে। মনে রেখো সুন্দরি, সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈধতা অবৈধতার কোনো প্রশ্ন নেই। বৈধতা অবৈধতার কথাটা একান্তভাবে লৌকিক ও সামাজিক। মানুষ তার সুবিধার জন্য সৃষ্টি করেছে অসংখ্য বিধি নিষেধ। বিধাতা শুধু সৃষ্টি করেছেন নিয়মের। যে নিয়মের দ্বারা সমগ্র বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত হয়, যে-কোনো সৃষ্টিকার্য সেই নিয়মেরই অন্তর্গত।

সুন্দর ও মহৎ কোনো কিছু সৃষ্টির উদ্দেশে যে-কোনো মিলন বা সংগমই নিয়ম সংগত। মহত্তর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই বিবর্তিত হয়ে চলেছে এই মহাবিশ্ব। ক্রমপরিণতির ধাপে ধাপে চলেছে অবিরাম উর্ধ্বগতি। যে নিয়ম এই সৃষ্টিকার্যে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে সে নিয়মের মধ্যে কোনো মংগল নেই। উপযুক্ত আনুকুল্যের দ্বারা এই সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলাই হলো সকল নিয়মেব কর্তব্য।

তোমার সঙ্গে রাজা কেশরীর সম্পর্কটা বৈধ, কারণ তোমরা পরস্পরে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু এই বৈধ সম্পর্ক তোমায় কী দিয়েছে? আর কতদিন তোমার দেহের মধ্যে এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ যৌবনকে ধরে রাখতে পারবে সুন্দরি তা ভেবে দেখেছ কি? তোমরা এতদিন মিলিত হচ্ছ পরস্পরে; কিন্তু কেন সে মিলন কোনো মহৎ সৃষ্টির দ্বারা সমৃদ্ধ ও সার্থক করে তুলতে পারল না তোমার রূপযৌবনকে?

অথচ দেখবে তোমার আমার মধ্যে এই ক্ষণিকের মিলন অবৈধ হলেও এক চিরন্তন সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এক অবিস্মরণীয় অমরতা দান করবে তোমায়।

যে বৈধতা চিরদিন বন্ধ্যা ও বিশুষ্ক করে রাখে জীবনকে সে বৈধতায় মংগল নেই। তাকে জীবনে বাধ্য হয়ে মেনে চললেও শ্রদ্ধা করা উচিত নয় কখনো।

অঞ্জনাকে ধীরে ধীরে বুকের কাছে টেনে নিলেন পবনদেব।

তারপর তাঁকে পরিপূর্ণ ভাবে আলিংগন করলেন।

সহসা দেহের প্রতিটি জীবকোষে সৃষ্টির এক উন্মাদনা অনুভব করলেন অঞ্জনা। এই সৃষ্টির জন্য এখন তিনি শুধু তাঁর এই তুচ্ছ নশ্বর দেহ নয়, তিনি তাঁর প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। সপ্তকীমেখলা কটিতটের নীবিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেহমনের সমস্ত সতর্ক গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে আসতে লাগল অঞ্জনার।

তখনো সন্ধ্যা হয় নি। কিন্তু শেষ অপরাহ্নের রক্তিম আলোক রেখাগুলিকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে কোথা হতে এক বিপুলঘন অন্ধকার নেমে এলো সহসা। বায়ুস্তর অস্বচ্ছ ও ভারী হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ।

ভীত হয়ে পবনদেবকে জড়িয়ে ধরলেন অঞ্জনা।

পবনদেব বললেন, ভয় নেই, বহিঃপ্রকৃতি সহানুভূতি প্রদর্শন করছে আমাদের প্রতি।

অঞ্জনার রক্তপ্রবালোপম অধরোষ্ঠের উপর মৃদু চুম্বনের একটি রসসিক্ত রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে পবনদেব বললেন, যেদিন বিশ্বজগতের সৃষ্টির জন্য পরমা প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম মিলিত হন পরমপুরুষ, সেদিনও হয়ত ছিল এমনি এক মহা অন্ধকার। স্বর্গ মর্ত্য, দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যাপ্ত করে জীবহীন জড়হীন যে বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছিল সেদিন, তার মধ্যে বাতাস আর অন্ধকার ছাড়া আর কোনো কিছুই ছিল না। সেদিনকার সেই শূন্যতার উপর চাপ দিয়ে মহামিলনের উপযুক্ত এক মহাসংগীত রচনা করেছিল বাতাস। চারিদিকের স্তব্ধ অন্ধকার রচনা করেছিল শান্ত সমাহিত এক পরিবেশ।

অঞ্জনা চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। সে অন্ধকারকে বড় মধুর বলে মনে হলো তাঁর।

কান পেতে কী একবার শুনলেন অঞ্জনা। শুনলেন, অশ্রুত ধ্বনিতে গান করে চলছে যেন বাতাস। সে সংগীত বড় মধুর ও মনোরম মনে হলো তাঁর।

কেবলি মনে হচ্ছিল অঞ্জনার, শান্তশীতল এক আবরণ দিয়ে তাঁদের এই মধুর মিলনকে চিরদিন বাইরের সমস্ত দৃশ্যমানতা হতে এমনি করে আচ্ছন্ন করে রাখুক অন্ধকার। উদাত্ত অশ্রুত ধ্বনিতে বাতাস এমনি করে গান করে চলুক অনন্ত কাল ধরে।

গভীর আশ্লেষে পবনদেবকে আলিংগন করলেন অঞ্জনা।

পবনদেব বললেন, সৃষ্টিকার্যে প্রধান সহায় হচ্ছে এই অধকার। অন্ধকারই হচ্ছে আমাদের আদিজননী। অন্ধকারের মহাগর্ভ হতে বার হয়েই আলোকের পথে ছুটে চলে সকল সৃষ্টি। মাতৃগর্ভ তাই অন্ধকার। সৃষ্টির পূর্বে এ বিশ্বের অবস্থা ছিল নিবিড় অন্ধকারে সতত সমাচ্ছন্ন। অন্ধকার মহানিশা হচ্ছে সৃষ্টিধর্মী মিলনের প্রশস্ত সময়।

পবনদেবের বাহুবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে সরোবরের শীকরসিক্ত সেই শীতল অন্ধকারের আবরণ থেকে আলোকোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন যখন অঞ্জনা, তখন রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। তাঁর প্রত্যাবর্তনে এতখানি বিলম্ব কোনোদিন হয়নি। তাই আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে সমস্ত রাজপ্রাসাদ। সশস্ত্র সান্ত্রীরা প্রস্তুত হয়ে উঠেছে তাঁর সন্ধানে বার হবার জন্য। বরনারীরা নৃত্যগীত ত্যাগ করেছে। অন্তঃপুর-বাসিনীরা চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছে তাঁর বিপদাশংকায়।

একমাত্র রাজা কেশরীর মধ্যেই কোনো চাঞ্চল্য বা বিকার দেখল না অঞ্জনা। অন্য-দিনকার মতোই প্রাসাদশীর্ষে নির্বিকার চিত্তে পদচারণা করছিলেন রাজা কেশরী। অঞ্জনা বুঝতে পারলেন, সুচতুর মায়াবিশারদ পবনদেব সময়ের দীর্ঘতাকে অনুভব করতে দেন নি কেশরীকে। অঞ্জনার ফিরতে এতখানি বিলম্ব হয়েছে একথা কিছুতেই বুঝতে পারেন নি কেশরী।

মৃদুখুশিসিক্ত ঈষদোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে স্মিত হাসি ফুটিয়ে অঞ্জনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন রাজা কেশরী।

অঞ্জনা একবার ভাবলেন, রাজা কেশরী যখন কিছুই জানেন না তখন তাঁকে এখন কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই।
আবার পরক্ষণে ভাবলেন, স্ত্রী হিসাবে তাঁর স্বামীর কাছে কোনো কিছু গোপন করা উচিত নয়। তাঁদের পবিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্যে মিথ্যা বা প্রতারণার কোনো সামান্যতম অবকাশ থাকবে না। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন রাজা কেশরী। পত্নীপ্রাণ কেশরীকে এ কথা গোপন করে প্রতারণা করলে মহাপাপে নিমজ্জিত হবেন অঞ্জনা।
তাছাড়া অঞ্জনা বুঝতে পারলেন না, তিনি দোষের এমন কি করেছেন।
কোনো এক দেবতার ঔরসজাত মহাবলশালী ধর্মপ্রাণ ও গুণবান এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন তিনি। সে সন্তান একদিন আপন শৌর্যে ও বীর্যের গৌরবে উজ্জ্বল করে তুলবে তাঁদের এই বংশকে, এ তো সৌভাগ্যের কথা, সুখের কথা।
এ সুসংবাদ তিনি আনন্দের সঙ্গে পরিবেশন করবেন রাজা কেশরীকে। শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন কেশরী। উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করবেন তাঁকে।
রাত্রি গভীর হতে প্রাসাদ শীর্ষ হতে অঞ্জনার হাত ধরে রতিমন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন রাজা কেশরী। তারপর সেই চন্দ্রকান্তমণির ঝালর দেওয়া চন্দ্রাতপের তলে স্বর্ণ পালংকের উপর নিজের পাশে বসালেন অঞ্জনাকে।
অঞ্জনা কিন্তু বসলেন না। মুহূর্তে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।
বিস্মিত হলেন রাজা কেশরী।
শান্তকণ্ঠে অঞ্জনা বললেন, আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মংগলের জন্য কিছুদিন সাত্ত্বিক আহার ও সরল জীবন যাপন করতে চাই মহারাজ।
সন্তান! বিস্ময়ের আতিশয্যে পালংক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজা কেশরী!
ব্যস্ত অথচ শান্তকণ্ঠে অঞ্জনা বললেন, সেই কথাই এখন আপনাকে বলতে চাই মহারাজ।
গম্ভীর মুখে অঞ্জনার পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন রাজা কেশরী।
অঞ্জনা বললেন, আজ আমি সরোবরে গেলে পবনদেব আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আলিংগন করেন। আমি রুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ করলে তিনি ধীরে ধীরে যুক্তির দ্বারা আমায় তুষ্ট করে আমার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি বলেছেন এ পুত্র হবে মহাবলশালী এবং ধর্মপ্রাণ।
ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন রাজা কেশরী, আমার বিনা অনুমতিতে কোন্ অধিকারে তুমি ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করলে তোমার গর্ভে?
ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে উঠলেন অঞ্জনা। কেশরী বললেন, একমাত্র স্বামীর অনুমতি নিয়েই বিশেষ কোনো সতী নারী পরপুরুষের দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে তুমি এ কাজ করেছ বলে তোমার সন্তান অবৈধ। তুমি সতীত্বধর্ম হতে বিচ্যুত হয়েছ। তুমি দ্বিচারিণী।

কি বলতে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা। কিন্তু বাক্যস্ফুরণ হলো না। অশ্রু বেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো তাঁর।

কেশরী বললেন, অসতী নারীর স্বামীর সাহচর্য বা ধনসম্পদে কোনো অধিকার নেই। তুমি সামান্যা দাসীর মতো কোনোরকমে এখানে রাত্রি যাপন করে প্রত্যূষে এ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবে। এই আমার আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন করলে প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হবে।

কণ্ঠের মধ্যে অশ্রুকে আর রুদ্ধ করে রাখতে পারলেন না অঞ্জনা। এবার কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন মহারাজ। আমি এখন অসতী হলেও স্বেচ্ছায় সতীত্ব ত্যাগ করি নি। আমি পবনদেবকে বারবার প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি দেবতা অপ্রতিরোধ্য, আমি সামান্যা নারী।

তাছাড়া আপনি বিশ্বাস করুন ক্ষণিকের জন্য তাঁকে দেহ দান করলেও মন আমার আপনার প্রতিই অবিচলিত নিষ্ঠায় নিবদ্ধ আছে।

কেশরী কিন্তু অনমনীয়। তিনি বললেন, না না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। সেখানে আর না দাঁড়িয়ে গৃহান্তরে চলে গেলেন রাজা কেশরী। সেইখানে বসে বসে ভাবতে লাগলেন অঞ্জনা। ভেবে পেলেন না কি অপরাধ তিনি করেছেন। ভুল যদি তিনি করেই থাকেন, তবে ক্ষণিকের ভুলের জন্য এতদিনের প্রেমসম্পর্ক কেন এমন করে ভেঙে যাবে।

ভূমিতলে শয়ন করলেও সারারাতের মধ্যে ঘুমোতে পারলেন না অঞ্জনা। অশ্রুসিক্ত তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে কেবলি একটা ছবি ভেসে উঠতে লাগল অস্পষ্টভাবে, স্বর্ণকমল-প্রস্ফুটিত সেই স্বচ্ছ সরোবর, শীকরসিক্ত শীতল বাতাস, তাম্রাভ পর্বতগাত্রের উপর নেমে আসা গোধূলির ধূসর নিবিড় ছায়া। অবশেষে দীর্ঘদেহী এক বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ।

রাত্রিশেষে উঠে ঘর হতে বেরিয়ে অলিন্দে এসে একবার দাঁড়ালেন অঞ্জনা। দেখলেন এক ঘন নৈশকুহেলি জমাট বেঁধে রয়েছে সমস্ত পর্বতদেশে। কোথায় যাবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না অঞ্জনা।

ভোর হতেই সমস্ত অলংকার খুলে রেখে নিরাভরণা অঞ্জনা নীরবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ হতে। যে প্রাসাদের প্রতিটি ধূলিকণায় একদিন তাঁর অনাবিল হাসির আলোকরেণু ঝরে পড়ত নিয়ত, আজ তার উপর ঝরে পড়ল অজস্র অশ্রুবিন্দু। আজ তিনি অনুভব করলেন, হিমশীতল এক পাহাড়ের মতো এক বিরাট ব্যথাভার চেপে বসে রয়েছে তাঁর বুকের মধ্যে। বিগলিত বেদনার শতনদীরূপে শত দিকে প্রবাহিত হলেও নিঃশেষিত হবে না সে ব্যথার পাহাড়। তাঁর কান্না কখনো শেষ হবে না।

ঘুরতে ঘুরতে পর্বতের সানুদেশে এক বিরাট অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করলেন অঞ্জনা। তিনি স্থির করলেন এইখানেই অরণ্য জীবন যাপন করবেন।

শ্বাপদসংকুল সেই ভয়াল অরণ্যের কুটিল অন্ধকারে প্রথমে ভীত হয়ে উঠলেন অঞ্জনা। তারপর ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেলেন।

নতজানু হয়ে প্রণাম করে অঞ্জনা বললেন, হে অরণ্যমাতা, আজ তুমি আমায় আশ্রয় দাও। তুমিই হচ্ছ পৃথিবীর আদিম রূপ। তোমাকে অপসারিত করে মানুষ যে নগর ও সমাজ গড়ে তুলেছে সেখান হতে আজ আমি নির্বাসিত। আজ তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়। হে বাতাস, তুমি আমার এই গর্ভস্থ পবনপুত্রকে রক্ষা করো।

কিছুকাল পর সেই অরণ্যের মধ্যে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন অঞ্জনা।

অঞ্জনা একবার ভাবলেন, তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পবনদেবকে স্মরণ করলেই তিনি তাঁকে ও তাঁর শিশুপুত্রকে আশ্রয় দান করবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভুল ভাঙল, স্বর্গের দেবতার সঙ্গে মর্ত্যের কোনো মানবীর চিরমিলন কখনো সম্ভব নয়। তিনি বিপদাপন্ন হলে নিজে থেকে তাঁকে সাহায্য করবেন পবনদেব।

পবনদেবের কাছ থেকে এর বেশী কিছু চাওয়া উচিত নয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন অঞ্জনা, কোনোদিন আর কিছুই চাইবেন না তাঁর কাছে। কোনো প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ক্ষুণ্ন করবেন না তাঁর সন্তানের মর্যাদা।

নবজাত শিশুসন্তানটিকে কোলে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অঞ্জনা।

রাবণ ও রম্ভা



কৈলাস পর্বতের অমল ধবল তুষারের উপর কুন্দাভ কৌমুদীজাল ছড়িয়ে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন শুভ্র বিগলিত রজত প্রবাহ আকাশ হতে ঝরে পড়ে তরঙ্গায়িত হয়ে প্লাবিত করছে সমগ্র পর্বতদেশকে। পর্বতগাত্র বন্ধুর বলে জ্যোৎস্নারাশি কোথাও শ্বেতোজ্জ্বল, কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, আবার কোথাও বা ঈষৎ পিঙ্গলাভ।

চন্দ্রাকিরণসিক্ত পর্বতস্থিত একটি চন্দ্রকান্ত শিলার উপর বসে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন রাবণ।

স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থল এই কৈলাস পর্বত।

একে একে মর্ত্য ও পাতাল প্রদেশ জয় করে এসে এই কৈলাস পর্বতে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করছেন রণক্লান্ত রাবণ। এখান হতে এবার স্বর্গাভিমুখে রওনা হবেন তিনি। জয় করবেন একে একে স্বর্গের সকল দেবতাকে।

ত্রিভুবন জয়ের নেশায় এমনই মাতাল হয়ে ছিল রাবণের মন যার জন্য প্রকৃতির কোনো শোভা নিরীক্ষণ করবার কোনো অবকাশই পান নি এতদিন। আজ পূর্ণিমা রজনী একথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

আজ পূর্ণিমা! পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় উদ্ভাসিত সমগ্র আকাশমণ্ডল।

কিন্তু রাবণ লক্ষ্য করলেন পূর্ণচন্দ্রের সেই অমল আলোকমালা ঠিক তির্যকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না পর্বতগাত্রে। চারিদিকের কল্পতরু ও পুন্নাগ বৃক্ষে প্রতিহত হচ্ছে তার গতি। বৃক্ষপত্রজর্জর ছায়াক্লিষ্ট চন্দ্রালোকের অর্ধতিমিরাবৃত রহস্যময়তায় চারিদিকের শোভা দেখতে দেখতে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল রাবণের মন।

শুধু আজ নয়। বহুবার বহু জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির শোভা দেখছেন রাবণ। কিন্তু চাঁদের আলোর মধ্যে এতখানি উজ্জ্বলতা কখনো দেখেন নি তিনি। চাঁদের আলোর এমন মাদকতা অনুভব করেন নি কোনোদিন।

চাঁদের ওই মাদকতাময় আলোর প্রভাবেই তরুস্কন্ধে নিদ্রিত হয়ে পড়েছে ময়ূরকুল। তরুতলে তন্দ্রাহত হয়ে পড়েছে রতিক্লান্ত কোনো এক মৃগদম্পতী।

সহসা রাবণও এক তীব্র মাদকতার জ্বালা অনুভব করলেন সারা অঙ্গে। আজ সন্ধ্যা হতে এখনো এক বিন্দু কোনো মাধ্বীকবারি পান করেন নি রাবণ। তবু কেন এই মাদকতা কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি।

ক্রমে সেই মাদকতা পরিণত হলো এক স্পষ্ট কামচেতনায়। এক জারজ উন্মাদনার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তাঁর প্রতিটি শিরায়। শোণিতকণিকারা মাতাল হয়ে নাচতে নাচতে গা ভাসিয়ে দিল সেই ঢেউএর উপর। এক উগ্র নারীসঙ্গলিপ্সা অস্বাভাবিক রকমের অশান্ত করে তুলল তাঁকে।

যাঁর রমণাকাংক্ষাকে প্রীত করবার জন্য দশ সহস্র রমণী লংকার প্রাসাদ অন্তঃপুরে সতত প্রস্তুত, তিনি আজ স্বেচ্ছায় মাসাধিককাল কোনো রমণীসঙ্গ লাভ করেন নি। একে একে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতুলনীয় বীরত্ব প্রকাশ করে ত্রিভুবন জয় করতে চান তিনি। তাঁর এই জয়ের পথে নারীসঙ্গ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করতে পারে বলেই কোনো

নারীকে তিনি সঙ্গে নেন নি তাঁর জয়-যাত্রার পথে।

জয়ের নেশায় তিনি এতদিন এমনই উন্মত্ত হয়েছিলেন যে নারীসঙ্গের কোনো অভাব কোনো মুহূর্তে অনুভব করেন নি। জয়ের চিন্তায় মন তাঁর এমনই নিবিষ্ট ছিল যে কোনো নারীর কথা ভাববার কোনো অবকাশই পান নি তিনি।

উচ্ছৃংখল ভোগবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযমের এক অসাধারণ শক্তি লুকিয়ে আছে তাঁর মধ্যে, একথা জীবনে প্রথম এবার উপলব্ধি করলেন রাবণ। রাজপ্রাসাদের বিশাল রতিমন্দিরে অফুরন্ত সুরাপানে মত্ত ও সহস্র রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে আরামশয্যায় রাত্রিযাপনে যিনি অভ্যস্ত, আজকাল সামান্য শিবিরে নিঃসঙ্গ রাত্রি যাপন করেও কোনো ক্লেশ বা কোনো জৈব অস্বস্তি অনুভব করেন না তিনি।

কিন্তু আজ প্রথম নৈশ নিঃসঙ্গতাটাকে দুর্বিষহ মনে হলো রাবণের।

ললিতকান্তা কোনো নারীর স্পর্শসুখ উপভোগ করবার জন্য এক অপরিসীম লালসায় উগ্র হয়ে উঠল তাঁর সারা অঙ্গ। ক্রমে যত নিবিড় হতে লাগল তাঁর নারী-চিন্তা, ততই তাঁর দৃষ্টি হয়ে উঠল লালসাতুর, অধরোষ্ঠ হয়ে উঠল অধীর, ব্যগ্র হয়ে উঠল হাত দুটি।

উপরের দিকে মুখ তুলে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন রাবণ। হয়ত কামনার এই অসহ্য পীড়ন হতে মনকে মুক্ত করতে চাইলেন তিনি। স্বর্গচিন্তায় তন্ময় করতে চাইলেন নিজেকে।

উপরে শুধু নীল আকাশ আর চাঁদের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না রাবণ।

কিন্তু স্বর্গলোক সন্দর্শনের জন্য সহসা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রাবণ। তিনি ক্ষণিকের জন্য একবার দেখতে চাইলেন, ওই নীল আকাশের ওপারে কোথায় শুভ্র সুগন্ধি পারিজাতবিভূষিত চিরবসন্তময় সেই স্বর্গোদ্যান যেখানে চিরহরিৎ তৃণসমাচ্ছন্ন ভূমির উপর পুষ্পধনু হাতে কামদেবতারা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় আর কামগন্ধা অপ্সরারা অঙ্গের সুবাস ছড়িয়ে চলে নৃত্যের তালে তালে, দিব্যকান্তি দেবগণের অনন্ত যৌবন-বিভূতিতে নিয়ত উজ্জ্বল থাকে যেখানকার দশদিক।

তিনি আরও দেখতে চাইলেন। কোথায় সেই মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র যাঁর হস্তধৃত অগ্নিগর্ভ বজ্রের গর্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হয়।

একে একে চন্দ্র সূর্যকে পরাভূত করে রাবণ জয় করবেন সেই সিংহাসন। চূর্ণ করবেন দেবরাজ ইন্দ্রের সকল দম্ভ।

কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না রাবণ। ক্রমে অস্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল তাঁর দৃষ্টি।

সহসা তাঁর দৃষ্টিপথে এক নারীমূর্তি আবির্ভূত হলো। বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, হয়ত ভুল দেখছেন তিনি। চন্দ্রালোকের মদির মায়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টি। অথবা হয়ত কামচঞ্চল চিত্তের বিকার এক মোহিনী রূপ পরিগ্রহ করেছে ওই মূর্তির

মধ্যে।
তবু একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন রাবণ। তিনি দেখলেন, ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে সেই নারীমূর্তি। তখন সেই নারীমূর্তিকে আকর্ষণ করবার জন্য উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করলেন তাঁর বিশাল একটি বাহু।
এত রূপ কোনো নারীর মধ্যে এর আগে দেখেন নি রাবণ। মানবী বা দানবী তো দূরের কথা, কোনো সুরকন্যা বা গন্ধর্বকন্যাদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় না এমন রূপরম্যা বরতনু।
বিস্ময়াহত হয়ে রাবণ জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি নারী, এই নির্জন নিশীথে একাকী আকাশ পথে বিচরণ করছিলে?
নারীমূর্তি উত্তর করলেন, আমার নাম রম্ভা। আগে অপ্সরা ছিলাম। বর্তমানে আমি নল কুবেরের স্ত্রী। আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কে? কেনই বা অকারণে আমার গতিরোধ করলেন?
রাবণ বললেন, আমি হচ্ছি লঙ্কার রাজা রাবণ।
রম্ভা বললেন, তাহলে আপনি কুবেরের ভ্রাতা।
রাবণ গম্ভীরভাবে বললেন, তার সঙ্গে আমার বর্তমানে কোনো সম্পর্ক নেই।
রম্ভা বললেন, কিন্তু লঙ্কার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কেন আপনি একা একা এই নির্জন পর্বতে বাস করছেন?
রাবণ বললেন, মাসাধিককাল হলো ত্রিভুবন জয়ে বার হয়েছি আমি। মর্ত্য ও পাতালের রাজাদের একে একে জয় করে কিছুদিনের জন্য আমি বিশ্রাম করছি স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যস্থল এই কৈলাস পর্বতে। এবার এখান হতে স্বর্গলোকে অভিযান করব। অমৃত-গর্বী দেবতাদের সকল গর্ব আমি চূর্ণ করে আমার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করব তাদের। তোমার স্বামী দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরও বাদ যাবেন না আমার কবল হতে।
কাতরকণ্ঠে অনুনয় করে রম্ভা বললেন, কিন্তু আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। আমি সামান্যা নারী। আমি তো আপনার সমযোদ্ধা কোনো শত্রু বা জয়ের বস্তু নই। তবে কেন অকারণে আমার পথরোধ করলেন আপনি?
সশব্দে হেসে উঠলেন রাবণ, দশানন রাবণের মতো রাজার অকারণে কোনো কাজ করবার মতো সময় বা শিশুসুলভ কোনো প্রবৃত্তি নেই সুন্দরি।
তবে কি কারণে মহারাজ?
রাবণ বললেন, কারণটা খুবই সহজ সুন্দরি। মাসাধিক কাল আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত আছি বলে কোনো নারীসঙ্গ লাভ করতে পারি নি। নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয় বলে কোনো নারীকে সঙ্গেও আনি নি। ত্রিভুবন জয়ের জন্য কর্ম ও চিন্তায় আমার সমগ্র দেহমন এমনই প্রবৃত্ত থাকে যে এসব কথা আমার মনে উদয়ই হয় না। আজ সন্ধ্যায় উপত্যকা প্রদেশের ওই শিলাখণ্ডের উপর একাকী বসেছিলাম। কিন্তু চন্দ্রালোকের

মধ্যে কি মায়ামদিরতা আছে জানি না, সহসা আমার চিত্ত কামচঞ্চল হয়ে উঠল প্রবল-ভাবে। নিজের মনে তখন ভাবতে লাগলাম, হরপার্বতী-অধ্যুষিত এই ভয়ংকর কৈলাসপর্বতে যার ত্রিসীমানাতে কোনো দানব বা কিন্নর পর্যন্ত আসে না ভয়ে, কোথায় পাব সেই নারী যে আমার এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করবে। এমন সময় আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলে তুমি অপ্রত্যাশিতভাবে।

কথা শেষ করে আবার তেমনি জোরে হাসতে লাগলেন রাবণ। তাঁর বিকট অট্টহাসির শব্দে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল দুপাশের তুষারধবল স্তব্ধ দুটি গিরিশৃঙ্গ। স্খলিত হয়ে যেতে লাগল রম্ভার ভীতিবিহ্বল বক্ষের প্রতিটি পঞ্জর।

রাবণ বললেন, মনে হচ্ছে, স্বয়ং ভাগ্যলক্ষ্মীও আমায় ভয় করেন সুন্দরি। তাই আমায় তৃপ্ত ও তুষ্ট করবার জন্য তিনিই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে। আমার মনে হচ্ছে সুদূর স্বর্গ হতে স্বয়ং কামদেবতা এই চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে আমায় ফুলশর হেনে কামজর্জর করেই পরমুহূর্তে ভয়ে কৌশলে তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার সেই কামজ্বালা নিবারিত করবার জন্য।

ভয়ে কাঁপতে লাগলেন রম্ভা।

রম্ভা আবার কাতরকণ্ঠে বললেন, দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন। আমার স্বামী আমার জন্য পথ চেয়ে আছেন। আমি গিয়ে তাঁর অংকশায়িনী না হলে নিদ্রাসুখ উপভোগ করতে পারবেন না তিনি। আমি গিয়ে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ না করলে চক্ষুপল্লব মুদ্রিত হবে না তাঁর।

রাবণ বললেন, আমার কামনাকে অতৃপ্ত রেখে কিছুতেই তোমার স্বামীর অংকশায়িনী হতে দেব না তোমায়। তোমার মতো নারীকে একবার কাছে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে কেমন করে এই উতল রাত্রি যাপন করব সুন্দরি!

রম্ভা বুঝলেন, তাঁর আর পরিত্রাণ নেই। তিনি বুঝলেন দশ সহস্র রমণীর অশ্রু যার কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করতে পারে নি সেই নিষ্ঠুর নিষ্করুণ রাবণের কাছে অনুনয়-বিনয় করা বৃথা।

নীরবে তাই অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন রম্ভা।

রম্ভাকে বাহুদ্বারা আবদ্ধ করে কাছে টেনে নিলেন রাবণ। বললেন, সুন্দরী নারী আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো স্বাস্থ্যবতী নারী আমি খুব কম দেখেছি রম্ভা। তোমার মতো সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ললনাকে কখনো কুবেরের পাশে মানায় না। আমার মতো বীর পুরুষই তোমার একমাত্র যোগ্য পাত্র।

রম্ভা কোনো কথা বললেন না। ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে রইল তাঁর।

রাবণ বললেন, সত্যিই তুমি অবিকল্প সুন্দরী রম্ভা। রক্তকোকনদের পাপড়িঅপেক্ষা কোমল ও রক্তাভ তোমার অঙ্গ। তোমার আকর্ণবিশ্রান্ত অক্ষিযুগল হরিণচক্ষু অপেক্ষা উদার ও আয়ত। চন্দ্রালোকপ্রতিবিম্বিত কৈলাসের শুচিশুভ্র পাষাণফলকের মতো অমল ও উজ্জ্বল তোমার গণ্ডভিত্তি।

রম্ভার সেই অমল গন্ডভিত্তির উপর দৃঢ় চুম্বনের এক অনপনেয় কলংকরেখা টেনে দিলেন রাবণ। সংকোচে ও শংকায় হতবাক হয়ে বসে রইলেন রম্ভা।

রাবণের কোনো কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মতো শক্তি বা সাহস কিছুই নেই তাঁর। তাই নিজেরই অন্তর্নিহিত অফুরন্ত ঘৃণার গরলে নিজেই জর্জরিত হতে লাগলেন তিনি। নিষ্ফল ক্রোধের আগুনে নিজেই জ্বলতে লাগলেন মনে মনে।

রম্ভার আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছের উপর মৃদু হস্ত সঞ্চালন করে রাবণ বললেন, অমন সন্নতাঙ্গী হয়ে নীরবে বসে আছ কেন সুন্দরি ? অত সংকোচ ও দুঃখের কারণ কি। এ তো উল্লসিত হবার কথা। সারা ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ নরপতি ও বীর আজ নতজানু হয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছে, এ কি কম গৌরবের কথা তোমার পক্ষে ! স্বর্ণময় সুমেরু পর্বতের হিরন্ময় শৃঙ্গ অপেক্ষা গৌরবময় ও সমুন্নত তার রাজমুকুট তোমার পদতলে আজ লুণ্ঠিত।

সত্যসত্যই রম্ভার সামনে নতজানু হলেন রাবণ।

রাবণ বললেন, মানিনী ওঠ। আর মান করো না। উঠে ভালো করে আমার পানে চেয়ে দেখো, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে এত বড় শক্তিশালী বীর জীবনে কখনো দেখো নি। সেই অতুলনীয় বীরের সংস্পর্শে তোমার জীবনকে ধন্য করো, সার্থক করো। আমার অফুরন্ত শক্তির মাধুর্যকে তোমার দেহের মধ্য দিয়ে উপভোগ করো।

তবু মুখ তুলে একবার চাইলেন না রম্ভা রাবণের পানে !

রাবণ বললেন, একথা কেন ভুলে যাচ্ছ মানিনী, বসুন্ধরার মতো নারীও বীরভোগ্যা। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশাল বসুন্ধরা একমাত্র তারই পদানত হতে চায় যে তার শৌর্য বীর্য দ্বারা আর সকলকে পরাজিত করে অপরাজেয় হয়ে উঠেছে নিজে।

সুন্দরি, মুখ তুলে একবার দেখো, আমি সেই অপরাজেয় পুরুষ।

রাবণ একটু থেমে রম্ভাকে একবার চকিতে দেখে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, বসুন্ধরার মতো সকল নারীই একমাত্র বীরপুরুষের কাছে দেহমন সমর্পণ করতে চায়। এই সমর্পণের মধ্য দিয়েই তারা পায় জীবনের চরম আনন্দ আর চূড়ান্ত সার্থকতা। আয়তাক্ষী, একবার চোখ মেলে দেখো, আমি সেই বীর।

তবু মুখ তুলে একবার চাইলেন না রম্ভা।

রম্ভার চিবুকে হাত দিয়ে তাঁর মুখখানিকে কিছুটা তুলে ধরলেন রাবণ। তারপর বললেন, কি অনিন্দ্যসুন্দর এই মুখমণ্ডল ! প্রস্ফুটিত পদ্মের চেয়েও সুন্দর। পৃথিবীর কোনো সুন্দর বস্তুর সঙ্গে উপমিত হতে পারে না এ মুখ। এই মুখই হচ্ছে পৃথিবীর সকল সুন্দর বস্তুর উপমাস্থল।

তারপর রম্ভার বক্ষঃস্থল হতে বসনাঞ্চলটিকে অপসারিত করে তার শোভা দেখতে লাগলেন রাবণ।

রাবণ বললেন, তোমার পীনোন্নত বক্ষের শোভা বড় চমৎকার। দুটি সুবর্ণ পর্বতশৃঙ্গের মতোই উত্তুঙ্গ তোমার স্তনদ্বয়। তোমার কটিদেশ যেমন ক্ষীণ তেমনি জঙ্ঘাদ্বয়

বিপুল ও সুবর্তুল। উরুভাগ কদলী তরুর ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধ। তোমার ভ্রূ-তার বিলাসমাধুর্যে কন্দর্পের ফুলধনু অপেক্ষা বক্রকুটিল ও মাদকতাময়।

রম্ভার নাভিদেশের বসনগ্রন্থির উপর রাবণ হস্তস্থাপন করতেই রম্ভা সরোষে তা ঠেলে দেবার চেষ্টা করলেন।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপনার মনে বলে চললেন রাবণ, বর্ষারম্ভে নব মেঘমালার গম্ভীর মন্দ্রধ্বনিতে পর্বত কন্দর হতে বিচ্ছুরিত যে উজ্জ্বল রত্নশলাকার দ্বারা চারিদিক উদ্ভাসিত হয় তার থেকেও শতগুণে উজ্জ্বল তোমার অঙ্গলতিকা।

রাবণের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা অনুভব করছিলেন রম্ভা। তবু রাবণের কথাগুলো শুনতে তাঁর ভালো লাগছিল। অদ্ভুত রকমের এক নিগূঢ় পুলক অনুভব করছিলেন অন্তরের নিভৃতে। এর আগে অপ্সরা থাকা কালে অনেকে উপভোগ করেছে তাঁর দেহটাকে। তারপর তাঁর স্বামী প্রেমদ্বারা প্রীত ও অলংকৃত করেছেন তাঁর মনটাকে। কিন্তু কেউ কখনো রাবণের মতো অকুন্ঠ প্রশংসাবাক্য দ্বারা তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গৌরবান্বিত করে নি এমন করে।

তবু তাঁর সেই নিগূঢ় পুলককে বাইরে প্রকাশ করলেন না রম্ভা।

রম্ভা যথাসাধ্য কঠোরতার সঙ্গে বললেন, মৃণাললোলুপা মরালী যেমন মরুস্থলীয় কোনো বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না, আমিও তেমনি আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষে আসক্ত হতে পারব না।

কিন্তু আমি তো যে-সে পুরুষ নয়। বিচিত্র রত্নখচিত ইন্দ্রের যে বিপুল ইন্দ্রধনুর দ্বারা বৃত্রাসুর নিহত হয়, যার কোদণ্ডটংকারে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আমার ক্রোধ-স্ফুরিত ভ্রূকুটি সেই ইন্দ্রধনু অপেক্ষা ঢের বেশী ভয়ংকর।

ভয়ে ভয়ে রম্ভা বললেন, আপনি বড় দেহবাদী মহারাজ। এই মাটির দেহ আর মাটির পৃথিবী ছাড়া আপনি আর কিছুই জানেন না। আপনি জানেন না যে, মাটির এই মর্ত্যভূমির ঊর্ধ্বে আছে অমৃতময় এক অমর অবিনশ্বর আত্মা।

রাবণ হাসলেন। হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রম্ভার কথাটাকে।

রম্ভা তবু বললেন, আপনি শুধু দেহের শক্তি আর দেহের সৌন্দর্যটাকেই বড় করে দেখেন। তাই বুঝতে পারেন না, আপনারই অফুরন্ত দেহের শক্তির অপরিসীম চাপে আপনার আত্মা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

রাবণ আবার হাসলেন, আমি আত্মা ও দৈব শক্তিতে বিশ্বাস করি না।

রম্ভা বললেন, আপনি দেহের শক্তিতে হয়তো দেবতাদের থেকে বড় হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যে অষ্টগুণে ও যোগৈশ্বর্যে ভূষিত আপনার তা নেই। তাঁদের আত্মিক সুষমা ও আধ্যাত্মিক মহিমা আপনি কোনোদিনই লাভ করতে পারবেন না।

রম্ভার দেহটাকে নিজের দেহের কাছে সবলে আকর্ষণ করে রাবণ বললেন, এই দেহই জীবনে একমাত্র সত্য সুন্দরি। দেহকেই জীবনে সবচেয়ে বড় বলে মনে করি বলেই দেহের এই অফুরন্ত শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছি আমি।

রাবণ সহসা গম্ভীর হয়ে বললেন, স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে যেখানে যাবে দেখবে এই দেহই সত্য। জীবনের যত কিছু রঙিন উচ্ছ্বাস তা শুধু এই দেহের পাত্রকে অবলম্বন করেই। তাই জীবনে যতদিন বাঁচতে চাই এই দেহটা অবলম্বন করেই বাঁচতে চাই। এই দেহ যদি এতই তুচ্ছ ও মূল্যহীন তাহলে কেন তোমার দেবতারা দেহ ধারণ করেন? কেন তাঁরা দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করেন জীবনকে? অপ্সরাদের নিয়ে নৃত্যগীত সহ আনন্দ উৎসবেই বা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন কেন এমনভাবে?

তাছাড়া তুমি আত্মার শক্তিতে এতই যদি বিশ্বাসী হও তাহলে আমার এই দেহের শক্তিকে এই মুহূর্তে খণ্ডন করে কেন মুক্ত করতে পারছ না নিজেকে?

রম্ভাকে নির্মমভাবে আলিংগন করে এক অদ্ভুত শৃঙ্গার আসনে বসলেন রাবণ। শৃঙ্গারকলাবিশারদ রাবণের শৃঙ্গারচাতুর্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রম্ভা।

রাবণ বললেন, শুধু তুমি নও, দুদিন পরে তোমার দেবতারাও আমার কবল থেকে মুক্ত করতে পারবেনা নিজেদের। একে একে ব্যর্থ হবে তাদের আত্মার সমস্ত সুষমা। ভূলুণ্ঠিত হবে তাদের আধ্যাত্মিক মহিমা।

রম্ভা বললেন, আপনি অন্যায়ভাবে পরনারীকে ধর্ষণ করছেন। এই পাপকর্মের জন্য আপনাকে একদিন প্রতিফল পেতেই হবে।

রাবণ বললেন, পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করি না আমি। কিছুদিন আগে নরকে গিয়ে আমি নিজের হাতে সমস্ত পাপীদের মুক্ত করেছি। আমি বাহুবলে জয় করেছি তোমাদের ধর্মরাজকে।

রাত্রি যত গভীর হতে লাগল, কৈলাসের তুহিনশীতল পাষাণফলক শীতলতর হয়ে উঠতে লাগল তত অবিরাম শিশিরপাতে! প্রথম প্রথম শৈত্য অনুভব করছিলেন রম্ভা তাঁর সারা দেহে। কিন্তু রাবণের দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের যে ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল তার তাপে রম্ভার দেহটাও তপ্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ।

রম্ভার স্পষ্ট মনে হলো, ধীরে ধীরে কোথায় যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে তাঁর সমস্ত শৈত্যানুভূতি। চোখে দেখতে না পেলেও সারাটি রাত ধরে রম্ভা শুধু রাবণের দেহের উষ্ণচঞ্চল রক্তস্রোতের অজস্র লীলালহরীকে অনুভব করতে লগেলেন নিজের দেহের মধ্যে।

শেষরাত্রির দিকে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল চাঁদের আলো। হিমশীতল জড়তায় কেমন যেন জমাট বেঁধে উঠতে লাগল সারা পৃথিবী। দূর আকাশের চাঁদের দিকে নিমেষহারা দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন রম্ভা। একটু পরেই ঐ চাঁদ অস্ত যাবে।

রম্ভা ভাবলেন, চাঁদের মধ্যে কলংক আছে বলেই হয়ত চাঁদ তার স্নিগ্ধনিবিড় এক রহস্যময় কিরণজালের দ্বারা সবার সব কলংককে আচ্ছন্ন করে রাখে সারারাত। কিন্তু যখন এই চাঁদ আর কিরণ দান করবে না আকাশে, স্পষ্ট দিবালোকে উজ্জ্বল

হয়ে উঠবে যখন দশদিক তখন এই কলংককে কেমন করে কোথায় লুকিয়ে রাখবেন, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না রম্ভা। জগতের সব প্রচ্ছন্ন বস্তুকে নির্মমভাবে প্রকাশিত করে তোলে যে সৌরালোক, সে আলোক কি তাঁর দেহের এই অনপনেয় কলংককেও উদ্ঘাটিত করে তুলবে না সকলের কাছে?

অশ্রুভারাক্রান্ত হল রম্ভার আঁখি উৎপল।

রাবণ বললেন, চাঁদের দিকে অমন করে একদৃষ্টে চেয়ে আছ কেন সুন্দরি? আমি তো কই একটিবারও চাঁদকে দেখছি না। আমার কাছে তুমি চাঁদের থেকে অনেক বেশী সুন্দর। তাছাড়া আমি দুদিন পরেই চন্দ্র ও সূর্যকে জয় করব একে একে। চূর্ণ করব তাদের সমস্ত দম্ভ।

রম্ভা কোনো উত্তর দিলেন না।

রাবণ বললেন, তার চেয়ে আমাকে ভালো করে চেয়ে দেখ। সমস্ত অভিমান ও আশংকা মন হতে ঝেড়ে ফেলে দেহ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করো আমার দেহের এই অতুলনীয় ঐশ্বর্যকে।

আমি মনে করি জগতে শক্তিই একমাত্র নীতি, শক্তিই প্রকৃত সত্য, শক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য। ভালো করে নিরীক্ষণ করলে দেখবে চাঁদের সৌন্দর্য অপেক্ষা আমার দেহের শক্তি অনেক বেশী সত্য ও সুন্দর। শক্তিই ধর্ম কারণ এই শক্তির উপরেই নির্ভর করছে সকল জীবের জীবন। পৃথিবীতে যার শক্তি বেশী আছে সেই বেঁচে থাকবে। চারি পাশের ছোট ছোট গুল্ম ও গাছগুলিকে বঞ্চিত করে বেশীমাত্রায় রস শোষণ করেই এতখানি বিরাট হয়ে বেড়ে উঠেছে ঐ সব বনস্পতির দল। অধিকতর বলবান প্রাণীরা দুর্বল প্রাণীদের দ্বারা উদর পূরণ করেই বেঁচে থাকে। সমুদ্র হচ্ছে মর্ত্যের সম্পদ। কিন্তু মর্ত্যের সকল মানব ও দানবকে বঞ্চিত করে সেই সমুদ্র হতে উত্থিত অমৃত ভোগ করে অমর হয়ে উঠেছে অষ্টবিধ গুণে ভূষিত তোমার প্রিয় দেবতারা।

সৃষ্টির পর হতে এই বিশ্বের যদি ইতিহাস লেখা হয় তাহলে দেখবে সে ইতিহাস হচ্ছে শোষণ ও শক্তির একাধিপত্যের ইতিহাস।

রম্ভা দেখলেন ভোর হয়ে আসছে। ভোরের স্বচ্ছ আলো উঁকি মারছে কল্পতরু শাখার ফাঁকে ফাঁকে।

রম্ভা করুণ কণ্ঠে বললেন, এবার ঊষাকাল সমাগত। আপনি আমায় মুক্তি দিন মহারাজ।

রাবণ বললেন, না, যে উদ্দেশ্যে তোমায় আবদ্ধ করেছি আমি, সে উদ্দেশ্য আমার এখনো সার্থক হয় নি। তোমার দ্বারা যে প্রবৃত্তিকে আমার চরিতার্থ করতে চাই, তা এখনো তৃপ্ত হয় নি।

রম্ভা বললেন, যে পবিত্র কৈলাস পর্বত দেবাদিদেব মহাদেবের নিবাস-ভূমি তারই

একটি অংশে এমনভাবে পরনারী ধর্ষণ করে আর কলংকিত করবেন না সে পর্বতের পবিত্রতাকে।
তাচ্ছিল্যভরে হাসলেন রাবণ। হাসতে হাসতে বললেন, তার পবিত্রতা বহু আগেই বিনষ্ট হয়েছে সুন্দরি।
কথাটা বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে রাবণের পানে চেয়ে রইলেন রম্ভা।
রাবণ বললেন, এই কৈলাস পর্বতেই একদিন মহাযোগী মহাদেবের কামোন্মাদনা জেগেছিল অনিন্দ্যসুন্দরী পার্বতীর প্রতি। পরে এই উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে তিনি তাঁকে বিবাহ করে একশত বৎসর ধরে তাঁর সঙ্গে শৃঙ্গার করেছিলেন এই পর্বতে।
রম্ভা বললেন, কিন্তু তিনি বিবাহের পর বিধিমত ধর্মপত্নীর সঙ্গেই সহবাস করেছিলেন।
রাবণ মৃদু হেসে বললেন, আমি স্বীকার করি তিনি বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু বিবাহের আগেই তিনি কামাবিষ্ট হয়েছিলেন পার্বতীর প্রতি। সে বিবাহ ধর্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, প্রতিষ্ঠিত ছিল কামভাবের উপর।
সুন্দরি যদি ইচ্ছা করো, তাহলে আজ আমিও তোমায় বিবাহ করতে পারি। এক মিথ্যা ধর্মভাবের প্রলেপ দিয়ে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারি আমার প্রবৃত্তিটাকে।
শিউরে উঠলেন রম্ভা।
তা দেখে বিজয় গর্বে হাসলেন রাবণ।
হেসে বললেন, অবনতাঙ্গি, তুমি শুধু দেবচরিত্রের একটা দিকই দেখছ। তাই তাদের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব পোষণ করছ। কিন্তু তুমি তাদের চরিত্রের আর একটি দিকের কথা জান না, একদিন সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার মধ্যে চিত্তবিকার ঘটেছিল। আপন কন্যা অমলধবলকান্তি সরস্বতীর প্রতি কামার্ত হয়ে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন কেমন করে গৌতমপত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন সে কথা নিশ্চয়ই অবিদিত নেই তোমার।
রম্ভা বললেন, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, কামদেব কন্দর্পের পঞ্চবাণে জর্জরিত হয়েই ব্রহ্মা অমনভাবে কামার্ত হয়ে উঠেছিলেন সহসা। আর কঠোর তপস্যার দ্বারা গৌতম দেবলোক অধিকার করবেন এই ভয়ে দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন গৌতমের মধ্যে ক্রোধ সঞ্চার করে তাঁর তপস্যার ফল বিনষ্ট করতে।
তাচ্ছিল্যভরে আবার বিকট শব্দে হেসে উঠলেন রাবণ। বললেন, তুমি আমায় হাসালে সুন্দরি। দেবতারা চিরকাল এমনি চতুর। তারা তাদের উচ্ছৃংখল কামপ্রবৃত্তিকে ঢাকা দিয়ে সাধু সাজবার জন্য চিরকালই এমনি করে কামদেবের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে আসেন। তাদেরি দুর্মর নির্লজ্জ কামপ্রবৃত্তির এক মনগড়া প্রতীক ছাড়া কামদেব আর কেউ নয়।
দেবরাজ সম্বন্ধে তুমি যে কথা বললে সে কথাও সত্য নয় সুন্দরি। তুমি যে কারণ দেখালে তা যদি সত্য হতো তাহলে আমি বলব তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ না করেও দেবরাজ

অন্য কোনোভাবে ক্রোধ সঞ্জাত করতে পারতেন গৌতমের মধ্যে।

আর কোনো কথা বললেন না রম্ভা।

রাবণ চুপ করে রইলেন।

বেলা প্রথম প্রহর অতীত হলে রম্ভাকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি দিলেন রাবণ।

রম্ভাকে মুক্তি দিয়ে আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জলে স্নান করতে গেলেন রাবণ। গিয়ে দেখলেন, বড় মধুর ঝংকারে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে খরস্রোতা মন্দাকিনী। দুই তীর হতে মন্দার কুসুম ঝরে পড়ছে তার জলে। চারিদিকে মধুগন্ধী ফুলের প্রাণমাতানো সৌগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে বসন্তের মদিরোজ্জ্বল বাতাস।

মন্দাকিনী জলে স্নান করে তীরে উঠে অগ্নিদেবের পূজা করলেন রাবণ। পূজা শেষে প্রজ্বলিত অগ্নিকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগলেন আপন মনে।

অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর বসে মন্ত্রমুগ্ধবৎ একদৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে লাগলেন রম্ভা। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাবণ তাঁকে যাবার অনুমতি দেবেন ততক্ষণ কোথাও যেতে পারবেন না তিনি। রাবণের বিরুদ্ধে কাজ করবার কোনো শক্তিই নেই তাঁর।

তাই নীরবে নিতান্ত অসহায়ভাবে বসে রইলেন রম্ভা। কিন্তু সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র অগ্নিদেবের কেন পূজা করছেন রাবণ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

জিজ্ঞাসা করতে রাবণ বললেন, আমি একমাত্র অগ্নির উপাসক। এই অগ্নিই হচ্ছে জীবন, অগ্নিই পৌরুষ। অগ্নি যে তেজ উৎপন্ন করে সেই তেজের দ্বারাই জীবন ধারণ করি আমরা। অগ্নির অভাবই মৃত্যুর কারণ।

রম্ভা তবু বুঝতে পারলেন না রাবণের কথাটা।

রাবণ বললেন, সকল মানব দেহের মধ্যেই অগ্নির একটি বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে অগ্নি অধিকতর প্রবলভাবে বিরাজমান। তাই নিবিড় নারীসঙ্গের মধ্য দিয়ে আমার পৌরুষের উত্তাপ ও প্রাণশক্তির তেজকে বাড়িয়ে নিই মাঝে মাঝে।

রাবণের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রম্ভা।

রাবণ আরও বললেন, সকলেই বলে, রাবণের মতো নারীদেহ লোলুপ আর কেউ কোথাও নেই। কিন্তু তারা আমার জীবনের প্রকৃত রহস্য জানে না। তারা জানে না, নারীদেহের মধ্য দিয়ে এমনি করে আমার এক দেহাতীত প্রয়োজনকে সিদ্ধ করি আমি। শুধু দেহগত তৃপ্তিই নারীসঙ্গলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় আমার। এর বাইরেও আরও একটা বড় উদ্দেশ্য আছে।

নারীধর্ষণের আমার আর একটি উদ্দেশ্য হলো শত্রুর উপর প্রতিশোধ। তাদের সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে জোরপূর্বক অধিকার ও ভোগ করে তাদের উপর অদ্ভুত রকমের এক প্রতিশোধ গ্রহণ করি আমি। তাই শত্রুনারী ধর্ষণ করে শত্রুকে জয় অথবা বধ করার চেয়ে বেশী আনন্দ পাই। শত্রুনারীধর্ষণের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হয় আমার এক অভিনব বিজয় গৌরব।

রম্ভা নীরব হয়ে বসে রইলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর হতে রম্ভাকে নিয়ে আবার শৃঙ্গার আসনে বসলেন রাবণ।
এখন মধ্যাহ্নকাল। কারণ এখন সূর্য ঠিক মধ্য আকাশে অতুলনীয় উজ্জ্বলতায় বিরাজ করছে। জ্বলন্ত অগ্নি যেমন বর্ণহীন, এখন সূর্যও তেমনি বর্ণহীন। এখনকার মতো রৌদ্র আর কখনো প্রখর হয় না। রৌদ্র যেমন প্রখর হয়ে ওঠে এখন, তেমনি বৃক্ষছায়াও হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ ও ঘনশ্যাম। বায়ুস্তর ক্লান্ত ও নিস্তরঙ্গ থাকে এই সময়।
রাবণ বললেন, মধ্যরাত্রির মতো শান্ত স্তব্ধ এই দ্বিপ্রহরও এক মহালগ্ন। শৃঙ্গার কার্যের জন্য এই সময় সবচেয়ে প্রশস্ত।
লজ্জারক্ত মুখমণ্ডলের উপর আপন বস্ত্রাঞ্চলখানিকে চেপে ধরলেন রম্ভা। কোনো কথা বললেন না।
রাবণ বললেন, আমি বৈদিক যোগশাস্ত্র পাঠ করে দেখেছি : তুমি হয়তো শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে, আমার মতে শৃঙ্গারও এক প্রকারের যোগ। সমস্ত যোগক্রিয়ার লক্ষ্য হলো, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া। এই সমাধি হলো এমন এক উচ্চতম সাধারণ উপলব্ধির স্তর যেখানে যোগী তাঁর আরাধ্য বস্তুর সঙ্গে এক গুণগত মিলন লাভ করে।
রম্ভার বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে দিয়ে রাবণ বললেন, সার্থক শৃঙ্গারও হচ্ছে ঠিক তাই। এতে দুটি দেহ বস্তুগত ভিন্নতা সত্ত্বেও এক গুণগত মিলন লাভ করে। দুটি দেহের শিরায় শিরায় বইতে থাকে তখন একই উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। একই অনুভূতির মধুর শিহরণে রোমাঞ্চিত হতে থাকে দুটি মন। তখন আমার আনন্দ হবে তোমার আনন্দ। তোমার বেদনা হবে আমার বেদনা।
প্রথম প্রথম রাবণের কথাটা বুঝতে না পেরে সত্যিই বিস্ময় অনুভব করছিলেন রম্ভা।
তারপর সেই বিস্ময়ের ভাবটা আপনা হতে কেটে যেতে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, প্রেমহীন আত্মাহীন রাবণের বিপুল দেহের জড় অস্তিত্বভার তাঁর দেহের সব চেতনা ও অনুভূতিকে গ্রাস করে ফেলছে।
রাবণ তাঁর অপ্রতিরোধ্য গায়ের জোরে তাঁর দেহের প্রতিটি অনুভূতি সঞ্চারিত করে দিতে লাগলেন যেন রম্ভার দেহের মধ্যে। রম্ভার নিজস্ব অনুভূতি বলতে যেন এখন আর কিছুই রইল না।
রম্ভা চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, সম্ভোগজনিত এক অদ্ভুত পুলকচিহ্ন ফুটে উঠেছে রাবণের সারা মুখমণ্ডলে। সেই পুলকেরই দুরন্ত শিহরণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।
এবার স্পষ্ট অনুভব করলেন রম্ভা, তাঁরও প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিমজ্জার গভীরে

অদ্ভুত রকমের এক পুলকোদ্গম হতে শুরু করেছে। অনাস্বাদিতপূর্ব সেই পুলকের রহস্য কে যেন সঞ্চারিত করে দিচ্ছে তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায়। এ পুলক এ রহস্য জীবনে এর আগে কখনো কোনোদিন অনুভব করেন নি রম্ভা।

রম্ভার মনে হলো, এ রহস্যের বর্ণ আছে। এ পুলকে মাধুর্য আছে। এ রহস্যের রঙিন স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর দেহের রক্তস্রোত। আর সেই স্রোতের নির্মম আঘাতে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়েছে তাঁর সমস্ত নীতিচেতনা।

রাবণের প্রতি ঘৃণা ভাবটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেল রম্ভার।

নিজের মুখখানা নিজে দেখতে না পেলেও রম্ভার মনে হলো, বসন্তের নবমঞ্জরী-সমুল্লসিত রক্তাশোকতরুর মতো রঙে রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে মুখমণ্ডল। ফুল্লকুসুমিত কুঞ্জলতার মতো সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর অঙ্গলতিকা।

রাবণের দেহের সঙ্গে নিজ দেহের সাযুজ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাবণের মনটাকে জানতে ইচ্ছা হলো রম্ভার। মনে হতে লাগল, আত্মা যাক, মন বলে কি কোনো জিনিস নেই রাবণের ? কঠোর পৌরুষদৃপ্ত এই বিপুল স্থূল দেহভারের অন্তরালে এতটুকুও কি নেই কোনো সূক্ষ্মসুন্দর মনের মাধুরী !

ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রম্ভা। কি করে এমন হয় ! এত বিশাল যাঁর দেহসম্পদ, এমন অপরিসীম যাঁর দেহৈশ্বর্য, মনের দিক হতে এতখানি কাঙাল তিনি কেমন করে হলেন ! রাবণের প্রতি এক গোপন মমতা অনুভব করলেন মনে মনে।

সহসা কি মনে হলো একবার জিজ্ঞাসা করে ফেললেন রম্ভা। আচ্ছা মহারাজ, আপনি কি জীবনে কাউকে কখনো ভালবাসেন নি ? অন্য কেউও কি ভালবাসেন নি আপনাকে ?

রাবণ হাসলেন। সদর্পে বললেন, ভালবাসায় বিশ্বাস করি না আমি। আমি কখনই বিশ্বাস করব না, কেউ কাউকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারে। আমরা শুধু নিরন্তর নিজেকে খুঁজে চলেছি অপরের মনের মধ্যে। যখনি যার কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের কর্ম ও চিন্তার কোনোরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাই, তখনি তাকে আমরা প্রেমাস্পদ বলে গ্রহণ করি। আমরা অপরের মধ্যে নিজেকেই ভালবাসি অন্যরূপে। তাছাড়া মানবজগতের কথা ছেড়ে প্রকৃতি জগতের দিকে চেয়ে দেখ, সেখানেও কেবল শক্তিরই প্রাধান্য। প্রেম বা ভালবাসার কোনো স্থান নেই। বৃক্ষ কাউকে ভালবেসে ফল দান করে না ; তার কাছে গিয়ে তার শাখাবাহু থেকে জোর করে তা ছিঁড়ে নিতে হয়। নদী কখনো নিজে থেকে জলদান করে না ; তার বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে আনতে হয় সে জল। বসুন্ধরা তার বুকের গভীরে যে ফসল রাখে তা কর্ষণ করে জোর করে বার করতে হয়। অন্ধকার রাত্রিতে শত কাঁদলেও চন্দ্র বা সূর্য এক ফোঁটা কিরণ দান করে না কোনো আর্ত পথিককে।

সুন্দরি, আমি শক্তির উপাসক। শক্তি দিয়ে সব কিছুকে জয় করে নিতে চাই। প্রেম দ্বারা বশীভূত করে নয়। শত ভালবাসার বিনিময়েও কোনো নারী কখনো

তার দেহের সমস্ত সুষমা নিঃশেষে উজাড় করে দেয় না কোনো পুরুষকে। একমাত্র কোনো ধর্ষকাম পুরুষই তার বিপুল দেহশক্তির দ্বারা নির্দয়ভাবে উপভোগ করতে পারে সে সুষমাকে। বহু সুন্দরী নারীকে নতজানু হয়ে কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করে দেখেছি কোনো ফল হয় নি। জোর করে তা আদায় করে নিতে হয় তাদের কাছ থেকে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। তবু আজ পূর্ণিমার পরদিন বলে চাঁদ উঠল না। একটু পরে উঠবে। তাই তরল অন্ধকার তত ঘন হয়ে ওঠে নি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাবণ বললেন, কারো কাছ থেকে আমি কোনো ভালবাসা না চাইলেও আমার মনে হয় একজন আমায় ভালবাসে। সে হচ্ছে আমার প্রধানা মহিষী মন্দোদরী। সকলেই আমার শক্তিকে ভয় করে। আমার কর্মকে ঘৃণা করে। একমাত্র মন্দোদরী আমার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমায় ভালবাসে। মংগল কামনা করে আমার কায়মনোবাক্যে। আমার মৃত্যুতে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। শুধু একজনের বুক ফেটে বেরিয়ে আসবে একটি সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। আমার মৃত্যুতে ভারমুক্ত হবে ত্রিভুবন; কিন্তু তাতে শুধু অন্তহীন ব্যথাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে একটি হৃদয়।

রম্ভার এতক্ষণে মনে হলো, রাবণের মনের সন্ধান পেয়েছেন যেন তিনি সহসা। কথায় কথায় রাবণের মনের অনেক কাছে এসে পড়েছেন যেন।

সাহসে ভর করে রম্ভা বললেন, কিন্তু আপনি কেন সকলকে ভালবেসে যেতে পারেন না মহারাজ? অন্যের সংকীর্ণতায় আপনি কেন অনুদার হয়ে ওঠেন। আপনার জানা উচিত যে যত বেশী ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সে তত বেশী স্বার্থপর।

রাবণকে চুপ করে থাকতে দেখে রম্ভা বললেন, আমি বুঝতে পারি না মহারাজ, আপনার দেহের মতো মনটাও কেন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে না। আপনার ওই বিস্তৃত বক্ষপটের মতো প্রসারিত কেন হয় না আপনার আত্মা। আপনার অফুরন্ত শক্তির মতো প্রেমও কেন অফুরন্ত হয়ে ওঠে না আপনার অন্তরে।

শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে সব কিছুকে জয় করে চলুন মহারাজ। এমন অফুরন্ত হয়ে উঠুক আপনার প্রেমের উৎস যাতে সকলকে অকাতরে দিয়েও তা ফুরিয়ে যাবে না কখনো। এতদিন ত্রিভুবন শুধু দেহের ঐশ্বর্য দেখে ভীত হয়ে এসেছে মহারাজ রাবণের। এবার তারা তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাক। তা যদি করেন তাহলে আপনার মৃত্যুতে শুধু মন্দোদরী নয়, সমগ্র ত্রিভুবন অশ্রু বিসর্জন করবে শোকে।

মুক্তানিভ স্বেদবিন্দু দেখা যাচ্ছিল রতিক্লান্ত রম্ভার ললাটে। রম্ভার সেই স্বেদাঙ্কুরচিত্রিত ললাটে একটি মৃদু চুম্বন করে রাবণ বললেন, তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন কুটিলাক্ষি, তুমি আমায় ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। কিছুতেই আমার মত বা পথের কোনো পরিবর্তন হবে না। যে বিজয় অভিযানে আমি বার

হয়েছি তা সম্পন্ন করবই।

কৃত্রিম রোষস্ফুরিত কণ্ঠে রম্ভা বললেন, শক্তির ধ্বজা উড়িয়ে যতই আপনি সব কিছুকে জয় করে বেড়ান, একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, আসলে কিন্তু কেউ আপনাকে ভয় করে না। আপনিই ত্রিভুবনের সকলকে ভয় করেন। এই ভয়ই আপনার অদম্য জিগীষার কারণ। জগতের যে-কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সহসা প্রবল হয়ে আপনার প্রভুত্বকে খর্ব করে ফেলবে এই ভয়েই আপনি আপনার শক্তির পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন সকলের কাছে।

পরদিন সকালে আবার মন্দাকিনীর জলে স্নান করতে গেলেন রাবণ।

রম্ভা কিন্তু আজ আর যাবার কথা বললেন না। সারাদিন রাবণের সঙ্গে প্রণয়কলাপে মত্ত হয়ে যাপন করলেন।

একবার দুজনে সেই তুষারশৃঙ্গপরিবৃত উপত্যকা প্রদেশ ছেড়ে পর্বতের সানুদেশে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

রম্ভা কেবল বারবার বসন্তপ্রকৃতির বিভিন্ন শোভার প্রতি রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রম্ভা একবার বললেন, ওই দেখুন মহারাজ, অচিরোদ্গত তাম্রাভ নবপল্লবগুচ্ছে ঈষদানত সহকারতরু লজ্জাবতী যুবতীর মতো বায়ু-ভরে কেমন কাঁপছে। কিংশুক ও কর্ণিকার কুসুমের বর্ণসমারোহে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সমস্ত বনভূমি। সুগন্ধি শিলাজতুসৌরভে আমোদিত হয়ে উঠেছে কেমন সানুদেশের শিলাপটনিচয়।

রাবণ সে সব কিন্তু কিছুই দেখলেন না। তিনি কেবল অনুরাগান্ধ হৃদয়ে সুরতোৎসবে মত্ত হয়ে রম্ভাকে আলিংগন করলেন।

রম্ভা বললেন, ছিঃ মহারাজ, আপনি কি চিত্তকে একবারও নিষ্কাম করে তুলতে পারেন না? নিষ্কাম চিত্তে অনন্য হৃদয়ে একবার চারিদিকের সুন্দর দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে থাকুন, দেখবেন নিবিড় সৌন্দর্যোপলব্ধি ধীরে ধীরে প্রসারিত করে তুলবে আপনার মনকে। আপনার মনের সমস্ত কালিমা ও সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে একে একে।

রাবণ বললেন, তুমি যা বললে, আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক তার উল্টো হয় সুযৌবনা। নিবিড় সৌন্দর্যোপলব্ধি শুধু আমার ভোগলালসাকে বাড়িয়ে তোলে। তোমার মুখচ্ছবিবিশিষ্ট, রূপ রস বর্ণ গন্ধ সমন্বিত ওই সব কুসুমরাজি ও মধুমত্ত ভ্রমরের কলমধুর গুঞ্জরণ আমার কামচেতনাকে ক্রমশই অদম্য ও অশান্ত করে তুলছে সুন্দরী।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার সেই উপত্যকাপ্রদেশে ফিরে এলেন দুজনে।

রাবণ বললেন, আগামীকাল সন্ধ্যায় তিন দিন তিন রাত্রি পূর্ণ হবে। যদিও তোমার সঙ্গলিপ্সাকে কোনোমতে প্রশমিত করতে পারছি না অন্তরে তথাপি ঐ সময় মুক্তি দেব তোমায়। আমিও তারপর স্বর্গাভিমুখে অভিযান করব।

একটি শিলার উপর বসেছিলেন রম্ভা। চলে যেতে হবে ভেবে অন্তরের নিভৃতে সূক্ষ্মনিবিড় একটা ব্যথা অনুভব করছিলেন কোথায় যেন।

এদিকে একমনে রসাল চ্যুতমঞ্জরীনির্মিত একরকমের মদ্য পান করছিলেন রাবণ। তাঁর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্যগোচর হলো না রম্ভার।

রম্ভা বললেন, একবার চেয়ে দেখুন মহারাজ, কেমন নিঃশব্দ নিশ্চুপ পদক্ষেপে অন্ধকার নেমে আসছে পৃথিবীতে। এখন অন্ধকার যেমন তরল ও অগভীর, বাতাস স্থির ও অচঞ্চল। আবার উন্নত ঋজুশীর্ষ দ্রুমশ্রেণীও তেমনি প্রশান্ত গম্ভীর।

রাবণ বললেন, প্রকৃতির মধ্যে সবকিছুকেই তুমি শান্ত ও সুন্দর দেখছ সব সময়। কিন্তু আমার হৃদয় কেন শান্ত হচ্ছে না সুন্দরি? আমি তোমায় ঠিক দেখাতে পারছি না, আমার বুকের ভিতর কেমন এক দানবিক ঝড় বয়ে যাচ্ছে যেন সব সময়।

শান্তকণ্ঠে রম্ভা বললেন, ও ঝড় আপনার অদম্য ভোগলালসার ঝড় মহারাজ। ভোগের মধ্য দিয়ে কখনো ভোগ বাসনাকে নিবৃত্ত করতে পারা যায় না; তাতে আরও তা বেড়েই যায়। একমাত্র ত্যাগ ও সংযমের দ্বারাই ও ঝড়কে আপনি শান্ত করতে পারেন।

রম্ভার কোনো কথা শুনলেন না রাবণ। কোনো বাধা-নিষেধ বা সদুপদেশ প্রতি-নিবৃত্ত করতে পারল না দুরন্ত রাবণকে।

রম্ভাকে নিয়ে আবার শৃঙ্গারে মত্ত হয়ে উঠলেন রাবণ। তাঁর এই অস্বাভাবিক মত্ততা দর্শনে বিস্মিত হয়ে পড়লেন রম্ভা।

রাবণ বললেন, আসন্ন বিচ্ছেদ আমায় কোনোরূপ ব্যথাতুর না করে কেবল আমার ভোগ বাসনাকে প্রবল করে তুলছে সুন্দরি। যখনি ভাবছি, কাল তোমায় ত্যাগ করতে হবে, তখনি তোমার দেহ সম্ভোগের জন্য এক অসহ্য উন্মাদনা অনুভব করছি।

রম্ভা বললেন, ইচ্ছা করলে আমাকে আপনি মুক্তি নাও দিতে পারেন মহারাজ। ত্রিজগতের দশসহস্র রমণীকে যেমন বলপূর্বক বন্দী করে রেখেছেন আপনার রাজ-অন্তঃপুরে তেমনি আমাকেও রেখে দিতে পারেন।

রম্ভার কণ্ঠে কোথায় ক্ষোভ ছিল তা বুঝতে পারলেন রাবণ। বললেন, না সুন্দরি, তাদের হতে তুমি স্বতন্ত্র। তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা করা চলে না। তাদের মতো তোমাকে কিছুতেই বন্দী করে নিয়ে যেতে পারব না আমি। বিচ্ছেদের পরও জীবনে তোমার কথা কোনোদিন ভুলব না আমি।

বিস্ময়স্ফুরিত কণ্ঠে রম্ভা বললেন, কিন্তু কেন, কোন্‌দিক থেকে তাদের হতে স্বতন্ত্র আমি মহারাজ?

রাবণ বললেন, কার্যকারিতার মধ্য দিয়েই সকল বস্তুর মূল্যকে আমি বিচার করি। আমার কাছে কোনো বস্তু ততখানি সত্য ও সুন্দর যতখানি তা আমার কোনো-না-কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে। যুদ্ধকালে আমি এই সব বৃক্ষশাখা ও পর্বত-

শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করি বলেই এরা আমার কাছে সত্য। যে নারীর সৌন্দর্যকে আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিঃশেষে ভোগ করতে পারি একমাত্র সেই নারীই আমার কাছে সুন্দর। যে ফুল হতে উত্তম পুষ্পসার মদ্য প্রস্তুত হয় একমাত্র সেই ফুলের সুষমাকেই স্বীকার করি আমি। অন্য সব নারী থেকে তুমি সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ আমায় দান করেছ বলেই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তুমি আমার মনে।

তীব্র ঘৃণায় নাসিকাটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল রম্ভার। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, আপনি এত নীচ! আপনি কি কখনো আপনার সংকীর্ণ প্রয়োজনচেতনার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না?

রাবণ কোনো কথা বললেন না। রম্ভা আবার বললেন, আপনি বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। আত্মা, আদর্শ, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি মানবসভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ দান আপনি তাদের শ্রেষ্ঠত্বে কোনোদিন বিশ্বাস করবেন না। শুধু অন্ধ বর্বর জৈবশক্তির দ্বারা প্রবলভাবে স্পন্দিত এক বিপুল জড়শক্তি ছাড়া আপনি আর কিছুই নন।

নিতান্ত উদাসীনভাবে রাবণ বললেন, হয়তো তাই।

পরদিন রম্ভাকে সত্যসত্যই মুক্তি দিলেন রাবণ। কিন্তু নির্দয়োপভুক্তা রম্ভাকে দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। দশনাঘাত আলেখিত ক্লান্ত মুখমণ্ডলের চারিদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে করবীবন্ধনবিমুক্ত আলুলায়িত অলক-লতা। নিষ্ঠুর বিমর্দনে সব শোভা হারিয়ে ম্লান হয়ে উঠেছে তাঁর কুঙ্কুমাক্ত স্তনতট। হেমসূত্রগ্রথিত রত্নময় যে রসনাদামে বিভূষিত ছিল তাঁর নিতম্ববিম্ব তা এখন শোচনীয়ভাবে ছিন্নভিন্ন।

মন্দাকিনীজলে দেহ প্রক্ষালন করে আবার কমনীয়কান্তি হয়ে উঠলেন রম্ভা। তারপর নতমুখে বিদায় চাইলেন রাবণের কাছে।

রাবণ বললেন, আকাশ যেমন অগ্নিমুনির তেজ ধারণ করেছিল, মন্দাকিনী যেমন ধারণ করেছিল মহাদেবের অনলনিহিত রৌদ্র তেজ, তেমনি তুমিও আমার অশেষ শক্তিসম্পন্ন তেজ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছ তোমার গর্ভে। কিন্তু তাতে তোমার কোনো সশ্রদ্ধ ইচ্ছা ছিল না বলে কোনো সন্তান উৎপন্ন হবে না তার থেকে।

রম্ভা তেমনি চুপ করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বিষণ্ন না উৎফুল্ল তা বোঝা গেল না তাঁকে দেখে।

রাবণ বললেন, আমি বহু নারীসংসর্গ করি বলে আমার তেজ অমোঘ নয়। তা না হোক। আমি সন্তান চাই না। আমি চাই শুধু আমার দেহতৃপ্তি। তুমি আমার দেহকে আনন্দ দান করেছ এতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার প্রতি। দেহই আমার কাছে সব। এই দেহ ধারণের আগে বা পরে জীবন হচ্ছে এক মিথ্যা শূন্যতা।

আত্মা ও অমরত্বে আমি বিশ্বাস করি না।

লোকে বলে দেহের মৃত্যুর পর আত্মা অমর হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু কোথায় সেই আত্মা। আকাশে বাতাসে কোনো মৃতব্যক্তির একটি আত্মার অস্তিত্বকেও তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। কই, কেউ তো তারা আমাদের মতো সুখ দুঃখ ভোগ করছে না। ভালো করে চেয়ে দেখ, দেখবে উজ্জ্বল সৌরকিরণচ্ছলে কোনো অমর আত্মা হাসছে না। তৃণাগ্রসংলগ্ন শিশিরবিন্দুচ্ছলে রোদন করছে না কোনো আত্মা। অনিলবিকম্পিত বনমর্মরে কেউ কখনো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে না।

মৃত্যুর পর তোমার এই দেহের সৌন্দর্য থাকবে না।

মৃত্যুর পর আমার এই দেহের শক্তি থাকবে না।

তবু যতদিন তুমি বাঁচবে আমার এই দেহের শক্তির কথা মনে রাখবে।

তবু যতদিন আমি বাঁচব তোমার এই দেহসৌন্দর্যের কথা মনে রাখব।

বসন্তের কিংশুক কুসুম দেখে মনে পড়বে তোমার রক্তিম অধরোষ্ঠ। কুরুবক মঞ্জরীতে দেখব তোমার দশনপঙ্‌ক্তি। তুষারধবল কুন্দেন্দু দর্শনে মনে পড়বে তোমার অপরূপ অঙ্গলাবণ্য। মসৃণ পর্বতপাত্র মনে পড়িয়ে দেবে তোমার পৃথু জঘনভার।

রম্ভা যখন বিদায় নিলেন তখন কৈলাসের তুষারশুভ্র শৃঙ্গমালার চারিদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যেন সতত সোহাগপিয়াসী কৃষ্ণবর্ণা কোনো নায়িকা তার ধবলকান্তি প্রিয়বল্লভের কণ্ঠদেশকে নিবিড় প্রেমোল্লাসে দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে।

পথে যেতে যেতে রম্ভার কিন্তু কেবলি মনে হতে লাগল, দেহটা তাঁর রাবণের বাহুপাশ হতে মুক্ত হলেও মনটা তাঁর মুক্ত হতে পারে নি এখনো। মনে হতে লাগল, সমগ্র বিশ্বটাই যেন রাবণ। বিরাট আকাশ তাঁর মস্তক। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র তাঁর চক্ষু। অরণ্যভূধরবিধৃত এই মহাজড়প্রকৃতি তাঁর দেহ। মনে হলো, রাবণ শুধু দশানন নন, রাবণের সহস্র আনন তাঁর নিপীতসর্বস্ব ব্রণবিধুর অধরোষ্ঠকে চুম্বন করবার জন্য চারিদিক হতে ছুটে আসছে। তাঁর ভীত ক্লান্ত দেহটাকে চারিদিক হতে জড়িয়ে ধরবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে তাঁর অজস্র বাহু।

পুলস্ত্য ও স্বয়ংবরা



রোজ সকালে ও বিকালে সুমেরু পর্বতের সানুদেশে বেতসীবনের ফাঁক দিয়ে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে যখন ঠিক তখনি একসঙ্গে অনেকগুলি নূপুরের ধ্বনি শোনা যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দমন্থর পুষ্পগন্ধবিহ্বল বাতাসের নিস্তরঙ্গ বুকে সহসা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে মদমত্ত হংসকাকলির মতো এক ঝাঁক দুরন্ত হাসির কলরোল।

সকালে ওরা আসে ফুল তুলতে। ওরা বলে পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে যত রকমের ফুল পাওয়া যায় এত রকমের এবং এত রং-বেরঙের ফুল আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বিকালেও ওরা আসে ফুল তুলতে। কিন্তু সে ফুল পুজার জন্য নয়। সে ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে ওরা নানারকমের ভূষণ তৈরি করে পরে।

বিকালে আসবার সময় ওরা সরোবরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জলকেলি করে স্নান সেরে আসে। তারপর ইচ্ছামত ফুল তুলে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ভূষণ তৈরি করে ও কেশ-বিন্যাস করার পর সেগুলিকে বিভিন্ন অঙ্গে পরে।

দেখতে দেখতে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তখন ওরা কালাগুরু ধূপবাসিত এক একখানি সূক্ষ্ম বসন পরে লাক্ষা ও প্রিয়ঙ্গুপরাগে চর্চিত করে আপন আপন দেহ। তারপর সন্ধ্যার মৃদু প্রদীপালোকে এক একটি উজ্জ্বল মুকুরে আপন মুখশোভা প্রতিফলিত দেখে বিমোহিত হয়ে ওঠে নিজেরাই। আপন দেহসৌরভে মত্ত হয়ে ওঠে আপনা আপনি।

ওরা সকলেই আশ্রম বালিকা। পাশাপাশি আশ্রমে থাকে।

কিন্তু পুলস্ত্য মুনি ও তাঁর আশ্রম সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী কৌতূহল ওদের মধ্যে শুধু একজনের। শুধু একজনের তাগিদেই ওরা রোজ দুবার করে আসে পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে। শুধু আসে না, বা ফুল তুলেই ক্ষান্ত হয় না—ওদের উচ্ছ্বসিত কনক-কাঞ্চীগুন ও আশিঞ্জিত নূপুর চরণক্ষেপের দ্বারা ধ্যানমগ্ন মুনির তপস্যাকার্যে বিঘ্ন ঘটায়।

দিনে দিনে বিরক্তি বোধ করেন মুনি। কিন্তু কোনো বিরক্তি বা ক্রোধকে বাইরে প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়। আশ্রম-বালিকার এই অশোভন আচরণে যত বিরক্তিই তিনি অনুভব করুন না কেন, এক সতিক্ত অথচ শান্ত অবহেলায় উপেক্ষা করে যেতে হয় সব কিছুকে।

পুলস্ত্যমুনি ও তাঁর আশ্রম সম্বন্ধে সবচেয়ে যাঁর বেশী কৌতূহল, অবশেষে তার সঙ্গে দেখা হলো পুলস্ত্য মুনির। সে হচ্ছে মহর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা স্বয়ংবরা।

মহর্ষি তৃণবিন্দুকে চিনতেন পুলস্ত্য মুনি। কিন্তু তাঁর কন্যাকে দেখেন নি কখনো। তাই দেখে চিনতে পারেন নি। চিনতে পারলেও সেদিন স্বয়ংবরাকে দেখে অসম্ভব রকমের বিস্মিত না হয়ে পারতেন না পুলস্ত্য মুনি। একথা ভেবে নিশ্চয়ই আশ্চর্য-বোধ করতেন তিনি, মহর্ষি তৃণবিন্দু কত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। অথচ এতখানি চপল ও চঞ্চল হয়ে উঠল স্বয়ংবরা কেমন করে।

সেদিন স্বয়ংবরা আশ্রমে এসেছিলেন সম্পূর্ণ একা। এসেছিলেন অসময়ে।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। কিছুক্ষণের জন্য যোগ বিরতির পর কাষ্ঠ প্রস্তুত করছিলেন পুলস্ত্য মুনি।

এমন সময় ছায়াঘন বেতসীবনের ফাঁক দিয়ে ভেসে উঠল ইন্দুকান্তি এক উজ্জ্বল নারীমুখ। এক গভীর অথচ নীরব কৌতুহলে উজ্জ্বল সেই মুখখানি এক উচ্ছল ও লাস্যবিলোল হাসিতে মুখর হয়ে উঠল সহসা। চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালেন পুলস্ত্য মুনি। কিন্তু কে তা চিনতে পারলেন না, শুধু দেখলেন হাস্যমুখর এক অনূঢ়া যুবতী।

মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি। কিন্তু বাইরে সে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারলেন না। ধ্যানমৌন এক ঋষির আশ্রমে কি কারণে এক হাস্যমুখর চপলমতি যুবতীর এই অকারণ অনধিকার প্রবেশ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেও মুখে কিছুই বললেন না পুলস্ত্য মুনি। শুধু একবার স্বয়ংবরার প্রতি রোষগম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে আপন মনে কাজ করে যেতে লাগলেন।

স্বয়ংবরা নিজেও ঠিক জানেন না। প্রায়প্রৌঢ় তপোশান্ত পুলস্ত্য মুনির প্রতি তাঁর যুবতী হৃদয়ের কেন এই অসংযত উদ্দাম কৌতূহল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি আজও। তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি, সে কৌতূহল যখন জাগে, শত চেষ্টাতেও কেন সংযত বা দমন করতে পারেন না সে কৌতূহলকে।

সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত সব সময়ই পুলস্ত্য মুনির কথা মনে পড়ে স্বয়ংবরার। প্রতি পলে অনুপলে অনিবারণীয় কৌতূহলের উচ্ছলতা অনুভব করেন রক্তের মধ্যে।

শুধু স্বয়ংবরা নয়, তার সখিরাও বুঝতে পারে না, যে পুলস্ত্য মুনি ফুলের রূপ রস গন্ধ বর্ণ সম্বন্ধে চির উদাসীন তাঁর আশ্রমে কেন এত বিচিত্র ফুল ফোটে। যে পুলস্ত্য মুনি প্রাণায়ামের মাধ্যমে বায়ুকে বহুক্ষণ বন্দী করে রাখেন দেহের অভ্যন্তরে, তাঁর আশ্রমে বাতাস কেন খেলা করতে আসে বেতসীবনের সঙ্গে। যিনি নারী-সৌন্দর্যকে তাঁর সাধনার ঘোর পরিপন্থী বলে মনে করেন তাঁর কাছে স্বয়ংবরার মতো সুন্দরী নারী কেন ছুটে যায়।

বুঝতে না পারলেও এ নিয়ে কেউ বেশী মাথা ঘামায় না স্বয়ংবরার মতো।

আর পাঁচজনে রহস্যকে রহস্য হিসাবেই সহজভাবে মেনে নেয়। স্বয়ংবরার মতো সে রহস্যকে বিশ্লেষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে না কেউ এমনভাবে।

সকালে উঠে হাতমুখ প্রক্ষালন করে সখিদের সঙ্গে ফুল তুলতে বেরোন স্বয়ংবরা। কিন্তু অন্যান্য সখিরা যখন ফুল তুলতে থাকে একমনে স্বয়ংবরা তখন ভাবেন পুলস্ত্য মুনির কথা।

তার কেবলি মনে হয়, চারিদিকে এত ফুল, এত ফল, এত বর্ণ ও গন্ধের সমারোহ ; তবু কেন পুলস্ত্য মুনি একবারও চেয়ে দেখবেন না সেদিকে।

মধ্যাহ্নকালে মনে হয়, স্থিরোজ্জ্বল তাম্রাভ সূর্যকিরণের পাশে কেমন লজ্জাবতী মেয়ের মতো বেতসীবনের গাঢ় সবুজ ছায়া কাঁপছে এক সুমধুর চঞ্চলতায়। তবু তা একবার দেখবেন না পুলস্ত্যমুনি।

অপরাহ্নে যখন অস্তগত সূর্যের গায়ে রক্তপদ্মের রং লাগে এবং সেই রঙের রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে আকাশের প্রান্তভাগগুলি তখন তার মনে হয়, কেন একবার উপরের দিকে মুখ তুলে তা চেয়ে দেখেন না পুলস্ত্য মুনি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অঙ্গরাগ ও কেশবিন্যাসের পর লাক্ষারসরক্তিমায় ললাটপটকে উজ্জ্বল করে মৃদু প্রদীপালোকের সামনে বসে একটি অম্লান মুকুরের মধ্যে নিজের উচ্ছলিত দেহসৌন্দর্যকে যখন প্রতিফলিত দেখেন স্বয়ংবরা, তখন তাঁর মনে হয়, একবার যদি সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে সৌন্দর্য চেয়ে দেখতেন পুলস্ত্য মুনি, তাহলে মনে বড় শান্তি পেতেন তিনি।

শুক্লপক্ষ রজনীতে সরসীজলাসিক্ত ও কৈরবসারসৌরভে সুবাসিত মন্দ সমীরণকে আলিংগন করে যখন চন্দ্রের স্বচ্ছশীতল ময়ূখমালা, নিবিড় প্রেমোল্লাসে চারিদিকে ঢলে পড়ে ; তখন স্বয়ংবরার মনে হয়, কেন একবার সে দৃশ্য দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না পুলস্ত্যমুনির মন।

আবার অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষে অজস্র নক্ষত্রালোকে তৃপ্ত না হয়ে সূর্যের বিরহে শিশিরাশ্রুবর্ষিনী হয় যখন রজনী, তখন বাতাসের মধ্যে একবার কান পেতে সে রজনীর কোনো দীর্ঘশ্বাস শুনতে চান না পুলস্ত্য মুনি।

পুলস্ত্য মুনির উপর অত্যন্ত রাগ হয় স্বয়ংবরার। মনে হয়, পুলস্ত্য মুনির হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। আর থাকলেও তা পাষাণ দিয়ে গড়া। যোগনিরত নিশ্চল দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ হয়ত একটা আছে। কিন্তু অবিরাম তপস্যার প্রভাবে সে প্রাণ নিয়ত তপ্ত ও জ্বালাময়।

ছোট থেকেই স্বয়ংবরা বড় চঞ্চল প্রকৃতির এবং সুখবাদী। কোনো আত্মনিগ্রহকে কখনো পছন্দ করেন না তিনি। তিনি চান সব সময় সখিদের সঙ্গে হাসি-খুশি, নৃত্যগীত ও আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে।

তাই পুলস্ত্য মুনিকে দেখলেই সর্বাংগ জ্বলে যায় স্বয়ংবরার।

আবার সখিদের সঙ্গে গিয়েও মন ভরে না। একা একা যেতে ইচ্ছা করে।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের একটা অসংযত খেয়াল চাপে স্বয়ংবরার মনে। ভাবেন একবার একা একা গিয়ে ধ্যানভঙ্গ করে দেবেন পুলস্ত্য মুনির। চীৎকার করে বিঘ্ন ঘটাবেন সমাধিতে। কলসপূর্ণ জল নিয়ে গিয়ে নিবিয়ে দেবেন তাঁর যজ্ঞাগ্নি। শুধু একবার নয় বারবার গিয়ে এমনি করে শেষ করে দেবেন তাঁর তপস্বীজীবনের।

তিনি হয়ত ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেবেন। তবু সে শাপকে ভয় করেন না স্বয়ংবরা। কারণ মুনি যদি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন তাহলে তার শুধু একার ক্ষতি হবে না, মুনিরও এত দিনের তপস্যালব্ধ সব ফল বিনষ্ট হবে।

একদিন মাত্র একা গিয়েছিলেন এর আগে। এবার থেকে প্রতিদিন একা একাই যাওয়ার স্থির করলেন।
তাই অন্যান্য সখিদের আর পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে যেতে নিষেধ করে দিলেন। বললেন, কেন পুলস্ত্য মুনির আশ্রম ছাড়া আর কি কোথাও ফুল নেই ? তোমরা কি কোনোদিন লক্ষ্য কর নি আমরা গেলে মুনি বিরক্তি বোধ করেন ? জগতে কি আর কোনো কুসুমকানন নেই যে ক্রোধপরায়ণ মনুষ্যবিদ্বেষী কোনো মুনির রোষকটাক্ষ ও তীব্র বিরক্তিকে সহ্য করে দিনের পর দিন ফুল ভিক্ষা করতে যেতে হবে তাঁর কাছে ?
স্বয়ংবরার কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সখিরা সকলে।
একবাক্যে তারা সকলে বলল, আমরা তো এতদিন সেখানে তোমার কথাতেই গিয়েছি সখি। এ ছাড়া সেখানে যাবার আমাদের তো অন্য কোনো প্রয়োজন ছিল না। পৃথিবীতে অনেক মুনি আছে। একা পুলস্ত্য মুনির সম্বন্ধে আমাদের কোনো বিশেষ কৌতূহল নেই।
স্বয়ংবরা বললেন, মুনি হয়তো অনেক আছে। কিন্তু ভুলে যেও না, তিনি পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র। আমার তো মনে হয় এই জন্ম-গৌরবে তিনি গর্ব অনুভব করেন বলেই মানুষকে এতদূর অবহেলা করেন।
সখিদের নীরব থাকতে দেখে স্বয়ংবরা আরও বললেন, কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত তুচ্ছ মানুষ হলেও আমরাও বিধাতার সৃষ্টি। সকল সৃষ্টিরই সমান মর্যাদা আছে। স্রষ্টার সাধনায় বিভোর হয়ে সৃষ্টিকে এমনভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা উচিত নয়।
সখিরা একবাক্যে প্রতিবাদ করল স্বয়ংবরার কথায়। বলল, এ আমাদের অনধিকার সমালোচনা সখি। বৃথা ও অর্থহীন তোমার এ ক্ষোভ। সকল মানুষের মত ও পথ কখনো সমান হতে পারে না। জীবনে তিনি সাধনার যে পথ বেছে নিয়েছেন তা আমাদের মনঃপূত না হতে পারে কিন্তু তাই বলে তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর সমালোচনা করবার কোনো অধিকার নেই। যদি কিছু বলার থাকে তা তাঁর সমক্ষেই বলা উচিত।
লজ্জায় চুপ হয়ে গেলেন স্বয়ংবরা।

আজকাল সখিদের সাহচর্য এড়িয়ে চলেন স্বয়ংবরা। একমাত্র অপরাহ্নে একবার করে সরোবরে জলকেলি করতে যাওয়া ছাড়া সখিদের সঙ্গে আর মেশেন না।
কিন্তু ঈষৎ বায়ুতাড়িত বীচিবিক্ষুব্ধ সরোবরের বুকের মতই কেমন যেন অশান্ত আলোড়নে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্বয়ংবরার বুকের ভিতরটা। সরসীজলের এই পদ্মগন্ধী শীতলতা কোনোমতে শান্ত করতে পারে না তাঁর সেই গোপন পরাজয়ের মর্মজ্বালাকে।
স্বয়ংবরার শুধু মনে হয় তিনি হেরে গেছেন তার সখিদের কাছে। হেরে গেছেন পুলস্ত্য মুনির কাছে।

সুযোগ খুঁজতে থাকেন স্বয়ংবরা। সুযোগ খুঁজতে থাকেন শুধু একটি নির্জন মুহূর্তের, যখন তিনি একা একা পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে গিয়ে চরিতার্থ করতে পারবেন তার সেই অদ্ভুত অসংগত কৌতূহলকে। লণ্ডভণ্ড করে দেবেন তাঁর যজ্ঞভূমি। এক নির্মম অবহেলার দ্বারা স্বয়ংবরার মতো রূপসী যুবতীর সৌন্দর্য-সম্পদকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করার জন্য সমুচিত শাস্তি দেবেন পুলস্ত্য মুনিকে।

পুলস্ত্যমুনির কাছে কিন্তু কিছুই চান না স্বয়ংবরা। অন্য কিছুই নয়। হলেই বা তিনি অনাসক্ত সাধক, নাই বা হলেন তিনি রূপে মোহমুগ্ধ, শুধু একবার এক সহজ মমতাস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বয়ংবরাকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে দেখলে কী এমন ক্ষতি হতো তাঁর সাধনকার্যের!

অবশেষে একদিন সুযোগ মিলল স্বয়ংবরার।

শান্তমন্থর কোনো এক নিদাঘদুপুরে স্বয়ংবরা পেলেন তাঁর বহুবাঞ্ছিত সেই অবকাশ। সেদিন কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গিয়েছিলেন মহর্ষি তৃণবিন্দু।

সরস ও শীতল চন্দনে সারা দেহ চর্চিত করে পথে বেরিয়ে পড়লেন স্বয়ংবরা। পথের দুপাশে দেখলেন প্রখর নিদাঘতাপে অতিমৃদুল শিরীষ ও পাটলী কুসুম ম্লান হয়ে অকালে ঝরে পড়েছে বৃন্ত হতে। নিদাঘসূর্যের দুঃসহ রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত হয়ে পড়েছে সমগ্র ধরিত্রী।

স্বয়ংবরা গিয়ে প্রথমে আশ্রমে প্রবেশ করলেন না। অতি সন্তর্পণে বেতসীবনের এধারে দাঁড়িয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

দেখলেন প্রচণ্ড সৌরানলনিহিত আকাশতলে প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সামনে অটল অচল হয়ে বসে রয়েছেন ধ্যানমগ্ন পুলস্ত্য মুনি। প্রাণবায়ুকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে নিশ্বাস পর্যন্ত বার হচ্ছে না।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বয়ংবরা।

এই জগতে ও জীবনের চারিদিকে গতি ও চঞ্চলতার স্রোত বয়ে চলেছে যখন অনুক্ষণ তখন এমনি করে একটি মানুষ সেই স্রোতের বহু ঊর্ধ্বে আত্মার পদ্মাসন পেতে সমস্ত প্রাণ মনকে সংহত করে স্তব্ধ হয়ে থাকবে এমনি করে—এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠলেন স্বয়ংবরা।

কিছুক্ষণ পর উঠে জ্বলন্ত হোমানলে ঘৃতাহুতি দিতে লাগলেন পুলস্ত্য মুনি আর সঙ্গে সঙ্গে স্তব পাঠ করতে লাগলেন উদাত্তস্বরে।

সত্য সত্যই হাসি পায় নি। এ সময় হাসি পাবার কথা নয়। তবু খুব জোরে হেসে উঠলেন স্বয়ংবরা। তাঁর সেই কর্কশ কৃত্রিম হাসির চটুল উচ্ছ্বাস পুলস্ত্য মুনির বেদমন্ত্রধ্বনিকে ছাপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল নির্জন নিস্তব্ধ আশ্রম প্রদেশে।

প্রথমে হাসিটা কানে গেলেও কোনো চেতনার সৃষ্টি করতে পারে নি তাঁর মধ্যে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর শুনতে পেয়েই চারিদিকে তাকিয়ে সন্ধান করতে লাগলেন সেই হাসির উৎসদেশ। বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন স্বয়ংবরা। তাঁকে দেখতে পেলেন না পুলস্ত্য মুনি।

কিছু দেখতে না পেয়ে কাজে আবার মন দিতে যাবেন পুলস্ত্য মুনি এমন সময় আবার তেমনি জোরে হেসে উঠলেন স্বয়ংবরা।

এবার কিছুটা ক্রুদ্ধ হলেন পুলস্ত্য মুনি। বজ্রগর্জনে হুংকার করে উঠলেন, কে তুমি?

স্বয়ংবরা কিন্তু একেবারেই ভীত হলেন না পুলস্ত্য মুনির এই অগ্নিমূর্তি দেখে। হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি হেসেছি। আমার হাস্য আপনার কাজের তো কোনো ক্ষতি করে নি।

ক্রোধস্ফুরিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন পুলস্ত্য মুনি, কে তুমি স্বাধিকার প্রমত্তা বালিকা?

হাসতে হাসতে স্বয়ংবরা বললেন, আমাকে বালিকা বলে আমার গুরুত্বকে লঘু করে দেবার চেষ্টা করেছেন আপনি। আপনি স্পষ্টতঃই দেখতে পারচ্ছেন, অনূঢ়া হলেও আমি যুবতী।

পুলস্ত্য মুনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন স্বয়ংবরার ধৃষ্টতায়। বললেন, তুমি যেই হও, কী প্রয়োজন তোমার এখানে?

স্বয়ংবরা বললেন, মানুষ সব সময় প্রয়োজনের বশে চলে না মুনিবর। অধিকাংশ সময়ই সে চলে তার আপন খুশিতে। আপনি যেমন আপনার খুশিমতো এই জপতপের কাজ বেছে নিয়েছেন আমিও তেমনি জগতে শত কাজ থাকতে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ানোর কাজ বেছে নিয়েছি। হাতে কোনো গৃহকর্ম না থাকলেই পাহাড়ে প্রান্তরে বা বনপ্রদেশে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াই আমি। এতেই আমার আনন্দ! একজনের মত পথ আর পাঁচজনের মনঃপূত হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনার কর্ম যেমন আমি পছন্দ করি না, আমার কর্ম তেমনি আপনি পছন্দ নাও করতে পারেন।

পুলস্ত্য মুনি বললেন, তাবলে অপরের কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টির কোনো অধিকার নেই তোমার।

তাচ্ছিল্যভরে হেসে স্বয়ংবরা বললেন, একজনের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম অপরের কর্মে ব্যাঘাত ঘটাবে এ তো খুবই স্বাভাবিক কথা মুনিবর।

বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বয়ংবরার দিকে একবার মুখ তুলে চাইলেন পুলস্ত্য মুনি। কিন্তু ক্রোধে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসায় কোনো কথা বলতে পারলেন না। বলবার কোনো প্রবৃত্তিও ছিল না তাঁর। সামান্য একজন চপলমতি তরুণীর সঙ্গে তর্ক করতে ঘৃণা বোধ করছিলেন তিনি।

স্বয়ংবরা বললেন, এতে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই মুনিবর। আপনার মোক্ষ

বা পরমার্থ লাভের জন্য আপনি যে যজ্ঞাগ্নি জেবলেছেন, ভেবে দেখেছেন কি একবার এখানকার বাতাসের সহজ গতিপথকে রুদ্ধ করেছে সে অগ্নি। এই যজ্ঞাগ্নির নিরন্তর তাপে সন্ত্রস্ত ও সন্তপ্ত হতে হতে ক্রমশ বিশুষ্ক ও বিশীর্ণ হয়ে পড়ছে এখানকার চারিদিকের বৃক্ষলতা। এমন কি এই অগ্নির লেলিহান শিখা প্রতিমুহূর্তে প্রাণ সংহার করছে কত অদৃশ্য জীবকণার।

মনে মনে কিছুটা দমে গেলেন পুলস্ত্য মুনি। বাইরে কিন্তু কিছুমাত্র প্রকাশ করলেন না মনের সে দুর্বলতাকে।

সহসা ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি, স্তব্ধ হও। তোমার বাগাড়ম্বরপূর্ণ যুক্তির জাল বৃথা বিস্তার করছ। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে।

স্বয়ংবরা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে যাবার জন্য পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। যাবার সময় বললেন, এখানে আসবার আমার বিশেষ কোনো কারণ বা আকর্ষণ নেই। তবে যদি কোনোদিন ঘুরতে ঘুরতে স্বাভাবিক ভাবে চলে আসি তবে তাতে ক্ষতি কি আপনার ?

রাগে কাঁপতে লাগলেন পুলস্ত্য মুনি। বললেন, দূর হয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে।

স্বয়ংবরা বললেন, আপনি শুধু কামকেই দমন করেছেন, কিন্তু ক্রোধকে দমন করতে পারেন নি। ক্রোধের মতো প্রচণ্ড এক রিপুকে অন্তরে পুষে রেখে কেমন করে আপনি সাধনায় সিদ্ধলাভ করবেন মুনিবর ?

আবার গর্জন করে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি, কোনো কথা শুনতে চাই না তোমার। তুমি এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ কর।

তখনি সে স্থান ত্যাগ করলেন স্বয়ংবরা। তবু শান্তি পেলেন না মনে। পুলস্ত্য মুনির প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন অন্তরে। পুলস্ত্য মুনিকে পরাজিত করতে গিয়ে তিনি নিজেই যেন পরাজিত হয়েছেন। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নিজের মনের ভারসাম্যই যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তাঁর জীবন থেকে পুলস্ত্য মুনির জীবনটা সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো দিক থেকেই কোনো সাদৃশ্য নেই। তবু তাঁর প্রতি কেন এই দুর্বার আকর্ষণ তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

স্বয়ংবরার মনে হলো, এই বৈপরীত্যই হয়তো সকল আকর্ষণের উৎস। তিনি বুঝতে পারলেন, সব সময় রূপগত ও গুণগত সমধর্মিতাই কারো প্রতি আমাদের প্রীতির কারণ হয় না। বিপরীতধর্মিতা হতেও অনেক সময় সে প্রীতি সঞ্জাত হয়।

তাঁর মধ্যে যে সব গুণ নেই পুলস্ত্যমুনির মধ্যে সে সব গুণ আছে। তিনি নিজে বড় চঞ্চল ; পুলস্ত্যমুনি শান্ত ও স্থিতধী। তিনি চঞ্চলা চটুলা নদী ; পুলস্ত্যমুনি শান্ত নিস্তরংগ সমুদ্র। সুতরাং পুলস্ত্য মুনির প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ একদিক দিয়ে খুবই স্বাভাবিক।

কয়েকটি দিন কোনোরকমে কাটালেন স্বয়ংবরা। তারপর আর থাকতে পারলেন না। একদিন বেলা দ্বিপ্রহর না হতেই বেরিয়ে পড়লেন পথে।

দাবানলের প্রচণ্ড প্রদাহে ঝলসিয়ে গেছে চারিদিকের মাঠের শস্যাঙ্কুর ও দূর্বামঞ্জরী। শুষ্ক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে বৃক্ষরাজির সুশ্যাম পর্ণরাশি। প্রবল তৃষ্ণায় আর্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে মৃগদল। নৃত্য ভুলে গিয়ে কলাপকুল স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বৃক্ষশাখায়।

আশ্রমে গিয়ে আজ কিন্তু হাসলেন না স্বয়ংবরা। শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন পুলস্ত্যমুনির দিকে।

স্বয়ংবরার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই পুলস্ত্য ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন আগের মতো। বললেন, আমার নিষেধ বাক্য লঙ্ঘন করে আবার এসেছ তুমি? এতবড় স্পর্ধা! কোথা হতে হলো তোমার?

শান্ত কণ্ঠে স্বয়ংবরা বললেন, আজ আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করি নি মুনিবর। কোনোরূপ শব্দ না করে স্থির হয়ে বসে আছি।

পুলস্ত্য মুনি কিন্তু কোনো কথাই শুনতে চান না স্বয়ংবরার। তিনি বললেন, আমার এই আশ্রমে কোনো নারীর উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত। আজও আমি তোমায় অভিশাপ দিতে গিয়ে কোনোরকমে সংবরণ করে নিলাম নিজেকে। এখনি চলে যাও। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন এস না।

আর কোনো কথা না বলে গম্ভীর হয়ে সেখান থেকে চলে এলেন স্বয়ংবরা। চলে এলেন। কিন্তু মনটা পড়ে রইল পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মহর্ষি তৃণবিন্দু স্নান করতে গেলে আবার যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন স্বয়ংবরা। ভাবলেন আজ তাকে দেখে হয়তো আর কিছুই বলবেন না পুলস্ত্য মুনি। ঘৃণা করারও একটা সীমা আছে। ঘৃণা করার সমস্ত শক্তি হয়তো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এবার তাঁকে নিশ্চয়ই সহজভাবে মেনে নেবেন।

প্রতিদিন একবার করে আশ্রমে গিয়ে শুধু বসে থাকবেন স্বয়ংবরা। প্রয়োজন হলে দু একটা কাজে সাহায্য করবেন পুলস্ত্য মুনিকে। এমনি করে একে একে সমস্ত বৈপরীত্যের স্তর ভেঙে দুটি অসম আত্মা পরস্পরের কাছে এসে এক নিবিড় অথচ সুগভীর সামীপ্য লাভ করবে। পথে বেরিয়ে পড়লেন স্বয়ংবরা। নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত নির্জন পথ। সমস্ত বৈপরীত্যকে আপন সত্তার মধ্যে শোষণ করে মিশিয়ে নেবার মধ্যে এক জয়ের গৌরব আছে। স্বয়ংবরা আজ সেই গৌরব লাভ করতে চান। এর বেশী কিছু নয়। পুলস্ত্য মুনির তপোকঠিন আত্মাকে আপন আত্মার প্রণয়ঘন রসে মিশিয়ে এক করে পরম আত্মীয় করে তুলবেন তাঁকে।

আশ্রমে প্রবেশ করে নীরবে নিঃশব্দে ধীর পায়ে ধ্যানমগ্ন পুলস্ত্যমুনির পানে এগিয়ে গেলেন স্বয়ংবরা। আজ তাঁর আশা হতে লাগল, তাঁর অন্তরের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন নিশ্চয়ই নেত্রপথে পতিত হবে পুলস্ত্যমুনির।

তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হয়তো অবাক হয়ে উঠবেন পুলস্ত্য মুনি। হয়তো সস্নেহ দৃষ্টির নীরব স্নিগ্ধতা দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন তাঁকে।

ধ্যানমৌন পুলস্ত্য মুনির মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে অনেক কথা তখন ভাবছিলেন স্বয়ংবরা।

সহসা একবার চোখ মেলে চাইলেন পুলস্ত্য মুনি। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সামনে স্বয়ংবরাকে দেখেই একবার চমকে উঠলেন শুধু। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। তারপর আবার গভীর ধ্যানে নিমীলিত হয়ে পড়ল সে চোখ।

পুলস্ত্য মুনির চোখে চোখ পড়তেই স্বয়ংবরা অনুভব করলেন, সহসা অগ্নিগর্ভ এক বিদ্যুৎ তরংগ প্রবাহিত হয়ে গেল যেন তাঁর সারা অংগের অভ্যন্তরে। প্রতিটি শিরা ও স্নায়ু কেঁপে উঠল সে তরংগের আঘাতে ও উত্তাপে।

এক তীব্র অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন স্বয়ংবরা সমগ্র দেহে মনে। অথচ অস্বস্তিটা যে প্রকৃতপক্ষে কি এবং দেহ বা মনের ঠিক কোন্ অংশ হতে উৎসারিত হচ্ছে, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তবে আশ্রমে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তাই সেখানে আর কালবিলম্ব না করে বাড়ি ফিরলেন।

পথে যেতে যেতে দেহটা কেমন যেন তার ভার বোধ করলেন স্বয়ংবরা। মনে হতে লাগল, সর্পিল ক্রূরতায় কি একটা বস্তু যেন তাঁর দেহের ভিতরের সমস্ত নাড়ী-গুলোকে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে গ্রাস করতে চাইছে তাঁর সত্তার শুচিতাকে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে গর্ভলক্ষণ দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন মহর্ষি তৃণবিন্দু।

বিস্ময়ে ও বেদনায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বয়ংবরা। প্রস্তরবৎ কঠিন হয়ে উঠল যেন তার দেহটা। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু জল পর্যন্ত বেরোল না এত দুঃখে।

প্রথমে বুঝতে পারেন নি। পরে একে একে বুঝতে পারলেন, তাঁর দেহের নিম্নভাগ, নাভিদেশ ও জঘনদ্বয় স্ফীত হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে। স্তনমণ্ডল দুগ্ধপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং সামান্যতম চাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধক্ষরণ হচ্ছে তার থেকে। স্তনবৃন্ত দুটি হয়ে উঠেছে ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

মহর্ষি তৃণবিন্দু চীৎকার করে বললেন, অনূঢ়া কন্যা হয়ে তুই গর্ভবতী হলি! এমন নিষ্কলংক কুলে কালি দিয়ে কী সর্বনাশ করলি হতভাগী! কি হয়েছে যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। দেখি যদি কোনো উপায় থাকে। মিথ্যা ভাষণের দ্বারা নিজদোষ গোপন করবার যদি কোনোরূপ চেষ্টা করিস তাহলে জীবন্ত দগ্ধ করব তোকে।

এবার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল স্বয়ংবরার। কাঁদতে কাঁদতে লজ্জাবিকম্পিত হয়ে যা হয়েছিল সব বললেন; কিন্তু কিভাবে এই আশ্চর্য কার্য সংঘটিত হলো তা নিজেই বুঝতে পারলেন না।

তৃণবিন্দু কিছুটা বুঝতে পারলেন। পেরে বললেন, এই মুহূর্তে পুলস্ত্য মুনির

কাছে যাচ্ছি। দেখি যদি কোনো উপায় হয়।

সবকিছু শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন পুলস্ত্যমুনি। বিস্মিত হয়ে বললেন, সেই চপলমতি প্রগলভা বালিকা তোমার কন্যা! তার অন্যায় কর্মের জন্য উপযুক্ত প্রতিফল আমি তাকে দান করেছি। বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে তার পরিচয় দান করে নি।

মহর্ষি তৃণবিন্দু বললেন, কিন্তু কিভাবে এবং কেন এলো এখানে?

পুলস্ত্য মুনি বললেন, প্রথম প্রথম দলবেঁধে সকাল সন্ধ্যায় ফুল আহরণে আসত। তারপর ও একা একা এসে আমার তপস্যাকার্যে বিঘ্ন ঘটাতে লাগল প্রায়ই। আমি বারবার সতর্ক করে দিলাম। তবু ও বৃথা তর্ক করতে লাগল আমার সঙ্গে।

মহর্ষি তৃণবিন্দু আশ্চর্য হয়ে গেলেন স্বয়ংবরার ধৃষ্টতায়।

পুলস্ত্য মুনি বললেন, এতদিন ক্রোধ সংবরণ করেছিলাম। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল একদিন। আমি অভিশাপ দিলাম, যে নারী তপস্যাকালে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হবে সঙ্গে সঙ্গে গর্ভসঞ্চার হবে তার মধ্যে বিনা পুরুষসঙ্গমে।

পুলস্ত্য মুনির পা দুটোকে জড়িয়ে ধরলেন মহর্ষি তৃণবিন্দু। কাতরকণ্ঠে অনুনয় করে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। এবার যা হয় একটা উপায় করুন। আমার কন্যার কৃতকর্মের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত আপনি বিধান করবেন আমি তাই অবনত মস্তকে পালন করব। আপনি শুধু ওকে মুক্তি দিন। ওর শুভাশুভ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। পরিণাম না জেনেই দুর্মতিবশে এই হীন কাজ ও করে ফেলেছে। আপনি ওকে ক্ষমা করুন।

পুলস্ত্যমুনি বললেন, আর তো কোনো উপায় নেই। আমার মুখনিঃসৃত অভিশাপ খণ্ডন হবার নয়।

মহর্ষি বললেন, ও অনূঢ়া, আপনি ওকে বিবাহ করুন। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। তা না হলে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে ওর সারা জীবন!

পুলস্ত্য মুনি বললেন, জীবনে আমি দার পরিগ্রহ করব না কখনো। সকল তপস্বী সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য তপস্যা করেন। আমার তপস্যা কিন্তু কখনো শেষ হবার নয়। আমি কোনো সিদ্ধি চাই না। সাধনার খাতিরেই সাধনা করে যাই আমি। এই ফলাসক্তিহীন সাধনাই আমার লক্ষ্য, এই সাধনাই আমার পথ। অন্য কোনো লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য সাধনাকে উপায়রূপে গ্রহণ করি নি আমি।

অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন তৃণবিন্দু। আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন স্বয়ংবরা। তারপর শিশিরাশ্রুবর্ষিনী রজনীর মতো সমস্ত রাত নীরবে নিঃশব্দে কাঁদলেন। শীতদ্যুতি চন্দ্র তার স্নিগ্ধ আলো দিয়ে তাঁর তপ্ত বুককে শীতল করবার চেষ্টা করল। কুটির প্রাঙ্গণের শাল্মলী তরু দীর্ঘশ্বাস ফেলে সারারাত সান্ত্বনা দিতে লাগল তাঁকে। তাঁর সকল দুঃখ ভুলিয়ে দেবার জন্য মধুর আলাপে কলতান করতে লাগল মালিনী নদী। তবু কিছুতেই কিছু হলো না। এমনি করে

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। মহর্ষি তৃণবিন্দু স্পষ্ট বললেন, তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখ পুলস্ত্য মুনির কাছে। অনূঢ়া গর্ভবতী কন্যাকে আমি আর এভাবে ঘরে রেখে দিতে পারি না। যে দোষ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে।

স্বয়ংবরা বললেন, আপনি না বললেও আমি আজই বেরিয়ে যেতাম পিতা। পুলস্ত্য মুনি আমায় গ্রহণ না করলেও এখানে আর আমি ফিরব না।

আজ নববর্ষারম্ভ। দলিত কজ্জলরাশির মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে সমস্ত আকাশ। পথে যেতে যেতে তবু একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন না স্বয়ংবরা।

পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে গিয়ে কোনো কথা বললেন না স্বয়ংবরা। শুধু একপ্রান্তে বসে পুলস্ত্য মুনির চিন্তায় সমস্ত প্রাণমনকে কেন্দ্রীভূত করে অনুক্ষণ ধ্যান করতে লাগলেন তাঁর। তাঁর অটল বিশ্বাস, একদিন না একদিন পুলস্ত্য মুনি তাঁকে গ্রহণ করবেন। গ্রহণ না করেন, অনাহারে অনিদ্রায় এমনি করে তাঁরই চিন্তায় জীবন বিসর্জন দেবেন। এই হবে তার কৃতকর্মের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।

তন্দ্রা এসেছিল অভিমানকুণ্ঠিতা স্বয়ংবরার। নিবিড় দেহক্লান্তিজনিত এমনি এক তরলিত তন্দ্রায় কতক্ষণ কেটে গেছে তা জানতে পারেন নি। সহসা মনে হলো কে যেন তাঁকে ডাকছে। বড় মধুর মনে হলো সে কণ্ঠস্বর।

ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে চাইলেন স্বয়ংবরা। আশা-নিরাশার এক জটিল দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত তাঁর চোখে মুখে! চেয়ে দেখলেন, পুলস্ত্য মুনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রুদ্র রোষের পরিবর্তে এক স্নিগ্ধ মমতা ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে মুখে।

কাজে ব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ স্বয়ংবরাকে দেখতে পান নি পুলস্ত্য মুনি। এবার দেখলেন। দেখে বিস্ময়ে শিউরে উঠলেন। স্বয়ংবরাকে দেখে এখন চেনাই যায় না। এ কি বেশ হয়েছে তার। পরিধানে মলিন বসন। কংকালসার দেহ।

পূর্ণ নবযৌবনপ্রবাহের প্রগলভ উচ্ছ্বাসে একদিন যে স্বয়ংবরা ছিল উদ্দাম ও খরস্রোতা, আজ সে বেণীভূতপ্রতনুসলিলা কোনো তটিনীর মতো শুষ্ক ও শীর্ণকায়; নিদাঘতাপিতা পাটলকুসুমের মতো ম্লান হয়ে পড়েছে তার বরাঙ্গের বিকচ শোভা। অনাহারে উত্থানশক্তিরহিত।

সস্নেহকণ্ঠে পুলস্ত্য মুনি প্রশ্ন করলেন, ওঠ স্বয়ংবরা, কি হয়েছে তোমার? কি চাও তুমি?

তৃষ্ণায় কণ্ঠ এমনি শুষ্ক যে চেষ্টা করেও কোনো কথা বলতে পারলেন না স্বয়ংবরা। শুধু কোনো রকমে একবার মাথাটা নেড়ে উত্তর দিলেন, না। কিছুই চান না তিনি।

ছুটে গিয়ে কুটির ভিতর হতে কিছু দুধ আর ফলের রস নিয়ে এলেন পুলস্ত্য মুনি। কিন্তু তা গ্রহণ করলেন না স্বয়ংবরা। নিবিড় অভিমানে অধরোষ্ঠ একবার কেঁপে

উঠল তাঁর। কোটরাগত চোখের ভিতর হতে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো অশ্রুর দুটি ধারা।
কণ্ঠরস অভাবে যে স্বয়ংবরার বাক্যনিঃসৃত হচ্ছিল না কিছু আগে, তার চোখ হতে এখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেরিয়ে আসতে লাগল অফুরন্ত অশ্রুর ধারা।
রুদ্রমূর্তিতে রোষকষায়িত লোচনে তাঁকে যদি ভর্ৎসনা করতেন পুলস্ত্য মুনি, তাহলে হয়তো এমন করে কাঁদতেন না স্বয়ংবরা। তাহলে সহজভাবে হয়তো সব দানই তাঁর গ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে সহসা আজ অপ্রত্যাশিত এই স্নেহমমতার অভিপ্রকাশ দেখে নিবিড় অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন স্বয়ংবরা।
তেমনি সস্নেহকণ্ঠে পুলস্ত্য মুনি বললেন, ওঠ স্বয়ংবরা, আমি সব শুনেছি। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। আমার অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়।
ধীরে ধীরে একবার মুখ তুলে চাইলেন স্বয়ংবরা।
পুলস্ত্য মুনি বললেন, তোমার গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবে এক ধর্মপ্রাণ পুত্রসন্তান। বেদধ্বনি শ্রবণকালে সে গর্ভস্থ হয় বলে তার নাম হবে বিশ্রবা।
বিষাদগম্ভীর ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুল্লতার মতো এক নিগূঢ় আনন্দানুভূতির স্পর্শে চমকে উঠলেন স্বয়ংবরা। পুত্রসন্তানের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঁচবার এক গভীর আগ্রহ জাগল তাঁর মৃতপ্রায় প্রাণে।
তবু কোনো কথা বললেন না। মাথা নিচু করে নীরবে বসে রইলেন স্বয়ংবরা।
পুলস্ত্য মুনি বললেন, তুমি অনশনক্লিষ্ট ও অতিশয় দুর্বল। কিছু পানাহার করে সুস্থ হও।
স্বয়ংবরা অতিশয় ক্ষীণ ও অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আমি আর কিছুই চাই না। আমি বাঁচতে চাই না। আমি শুধু নীরবে শান্তিতে মরতে চাই।
পুলস্ত্য মুনি বললেন, তোমার ব্যক্তিগত জীবনে আগ্রহ না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার গর্ভের মধ্যে যে জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে দিনে দিনে সে জীবনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার তোমার কোনো অধিকার নেই। বরং তা করলে তা হবে ভ্রূণহত্যার মতোই মহাপাপ।
অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর অনশন ভঙ্গ করলেন স্বয়ংবরা। বাঁচতে চাইলেন আবার কেবল সন্তানের মুখ চেয়ে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বর্ষণবিক্ষুব্ধ ব্যথাভারাক্রান্ত সান্ধ্য আকাশের মতোই অন্তরটাকে ভারী বলে মনে হলো স্বয়ংবরার। পুলস্ত্য মুনি এখনো তাঁকে গ্রহণ করেন নি। কোনো প্রতিশ্রুতিও দেন নি। কোথায় যাবেন কি করবেন কিছুই খুঁজে পেলেন না স্বয়ংবরা।
যথারীতি স্তবপাঠ করে কুটিরের মধ্যে প্রদীপ জ্বাললেন পুলস্ত্য মুনি।
এতক্ষণে স্বয়ংবরার কথা মনে পড়ল তাঁর। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বইতে শুরু

করেছে। অথচ আশ্রমপ্রান্তের একটি ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষতলে বসে আছেন স্বয়ংবরা।
পুলস্ত্য মুনি ভাবলেন আজ রাত্রির মতো এই কুটিরের মধ্যেই আশ্রয় দিতে হবে স্বয়ংবরাকে। এই ভেবে স্বয়ংবরা যেখানে ছিলেন সেইদিকে এগিয়ে গেলেন পুলস্ত্য মুনি ব্যস্ত হয়ে।
কিন্তু গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, বৃক্ষতলায় কেউ নেই।
এক তীব্র ব্যথায় সমস্ত অন্তরটা মোচড় দিয়ে উঠল পুলস্ত্য মুনির। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল।
স্বয়ংবরার নাম ধরে চীৎকার করে ডাক দিলেন পুলস্ত্য মুনি। নিষ্করুণ হাওয়ার প্রহারে জর্জরিত আশ্রমপ্রান্তের সেই বনপ্রদেশের বিক্ষুব্ধ চিত্তের অতলে নিঃশেষে তলিয়ে যেতে লাগল তাঁর ব্যথাহত হৃদয়ের সমস্ত হাহাকার।
তিক্ত ও অবাঞ্ছিত হলেও এই কয়দিনের সম্পর্কে স্বয়ংবরার প্রতি কিছু মমতা সঞ্জাত হয়েছিল তাঁর অন্তরে। ধূসর অনাসক্ত চিত্তে জেগেছিল এক মধুর মমতার বর্ণরাগ-রেখা। সহসা নির্মম হাতে কে যেন মুছে দিল সে মমতার রেখা।
মমতার রং মুছে দিলেও রসঘন এক উদার করুণা জাগল পুলস্ত্য মুনির মনে। মনে হলো, যে পাপ স্বয়ংবরা করেছে তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে। বাইরে যে ঝড় বইছে তার থেকে ঢের বেশী ভয়ংকর ঝড় বইছে আজ তার অন্তরে। দুর্যোগঘন বর্ষা রাত্রির এই অন্ধকার হতে মসীলিপ্ত কলংকের এক ঘোরতর অন্ধকার আজ তার মাথায়। প্রবল বৃষ্টিধারা অপেক্ষা প্রবলতর অশ্রুধারা তার চক্ষে।
অন্ধকার পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্তবপাঠের ভঙ্গীতে উদাত্ত কণ্ঠে পুলস্ত্য মুনি বলতে লাগলেন, হে মেঘ, যত পারো আমার মাথার উপর বর্ষণ করো। হে ঝড়, যত পারো প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করো আমার দেহকে। হে অন্ধকার, আমার সারা জীবনের সব আলো তুমি কেড়ে নাও।
আমি যেমন স্বয়ংবরার প্রতি নির্মম হয়েছি তোমরাও তেমনি আমার প্রতি নির্মম হও। শুধু স্বয়ংবরাকে মুক্তি দাও। তাকে কষ্ট দিও না। আমারই জন্য আজ সে নিরাশ্রয় গৃহহারা। আমারই অসংগত শাস্তির বোঝা তার মাথার উপরে। আমারই অভিশপ্ত সন্তান তার গর্ভে।
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন পুলস্ত্যমুনি। আজ যেমন করে হোক খুঁজে বার করবেন স্বয়ংবরাকে। যদি না পান আশ্রমে আর ফিরবেন না।
এদিকে আশ্রমের সীমানা থেকে বেরিয়ে পড়লেও ঝড়ে জলে বেশীদূর যেতে পারেন নি স্বয়ংবরা। নিকটস্থ একটি পর্বত গুহার মধ্যে রাত্রি যাপন করবার জন্য ক্লান্ত ও ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।
এমন সময় বিদ্যুতের চকিত আলোকে স্বয়ংবরাকে দেখতে পেলেন পুলস্ত্য মুনি। আকুল হয়ে সেদিকে ছুটে গিয়ে অপরাধীর মতো সকরুণ কণ্ঠে বললেন, তুমি আমায়

ক্ষমা করো স্বয়ংবরা। চলো আমার কুটিরে রাত্রিবাস করবে। এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না আমি। আমি তোমায় আসতে দিতাম না। সামগানে ব্যস্ত ছিলাম আমি যখন, সেই অবসরে চলে এসেছ তুমি।

পুলস্ত্য মুনির পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে, তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন স্বয়ংবরা। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আপনি আমার উপর যথেষ্ট দয়া করেছেন। আজ আমি আপনার কাছ হতে কিছুই চাই না। পর্বতগুহায় রাত্রিযাপন করতে কোনো অসুবিধা হবে না আমার।

পুলস্ত্য মুনি বললেন, কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি স্বয়ংবরা, তোমাকে না নিয়ে আশ্রমে একা ফিরব না।

আর কোনো প্রতিবাদ না করে পুলস্ত্য মুনির অনুসরণ করতে লাগলেন স্বয়ংবরা।

কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে স্বয়ংবরা বললেন, আমি অনূঢ়া। আপনি ব্রহ্মচারী তপস্বী। এক কুটিরের মধ্যে কেমন করে রাত্রিযাপন করতে পারি আমরা।

স্মিত হাসি হেসে পুলস্ত্য মুনি বললেন, কোনো ভোগের উপাদান কাছে থাকলেই চিত্ত যদি বিচলিত হয় তাহলে বৃথাই আমার ব্রহ্মচর্য সাধনা। তাহলে বৃথাই আমার এতদিনের সংযম শিক্ষা। সে বিষয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই।

স্বয়ংবরা তখন বললেন, কিন্তু কোনো প্রতিদান না দিয়ে আপনার এত দান একটার পর একটা কোন্ অধিকারে গ্রহণ করব আমি। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি তো আমায় এখনো গ্রহণ করেন নি ধর্মপত্নীরূপে!

একটু থেমে স্বয়ংবরা বললেন, এই প্রস্তাব আমার পিতা এসে আপনার নিকট উত্থাপন করলে পরে আপনি তা সরোষে প্রত্যাখ্যান করেন। নিরক্ত নিরুচ্চার এই প্রস্তাব বুকে করে আমি নিজে উপযাচিকারূপে আপনার নিকট এলেও আমায় ভিখারিণী ভেবে কিছু করুণা ভিক্ষা দিয়ে কৌশলে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেন। এর পরও আপনার কাছ থেকে কি কোনো দান নেওয়া সম্ভব মুনিবর?

বিস্ফারিত চোখের বিহ্বল দৃষ্টি তুলে পুলস্ত্য মুনির মুখপানে তাকিয়ে রইলেন স্বয়ংবরা।

পুলস্ত্য মুনির চোখে জল এলো। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, বড় দুস্তর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছি আমি স্বয়ংবরা। সকল তপস্বীর তপস্যার শেষ আছে। আমার তপস্যার কখনো শেষ হবে না। সুদূর স্বর্গমণ্ডলে গিয়েও না। এক্ষেত্রে দার পরিগ্রহ করে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটানো আমার কখনই উচিত নয়।

স্বয়ংবরা কোনো কথা বলেন না।

পুলস্ত্য মুনি বললেন, তাছাড়া আর একটা কথা আছে।

শরাঘাতবিদ্ধ কোনো বিহগীর মতো শান্তকরুণ দৃষ্টি তুলে ক্ষুব্ধ কৌতূহলে একবার তাকালেন স্বয়ংবরা। বিপন্ন আশার এক আর্ত আভাস শেষবারের মতো ফুটে উঠল সে দৃষ্টিতে।

পুলস্ত্য মুনি বললেন, আমি প্রৌঢ় তপস্বী ; তুমি তরুণী যুবতী। তোমার আমার মাঝে এক অনতিক্রম্য বয়সের ব্যবধান। এই ব্যবধানের শূন্য বুকে প্রণয়মধুর কোনো সম্পর্কের সৌধ গড়ে তোলা সম্ভব নয় স্বয়ংবরার।

অবস্থার পাকচক্রে বাধ্য হয়ে আজ আমায় তুমি পতিত্বে বরণ করতে পার ; কিন্তু তোমার সখারূপে স্বামীরূপে কোনোদিন মেনে নিতে পারবে না তুমি আমায়। তুমি আমায় শ্রদ্ধা করতে পার ; কিন্তু ভালবাসতে পার না। তুমি আমায় তোমার মাথার উপরে আসন পেতে বসাতে পার ; কিন্তু বুকে টেনে নিতে পার না।

কেমন করেই বা পারবে। স্বয়ংবরা তুমি ভুল বুঝছ। তুমি জান না, আমার দেহের মধ্যে প্রাণ আছে, আত্মা আছে ; কিন্তু মন বলে কোনো পদার্থ নেই। ওই যজ্ঞানলে সে মন আমার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে নিঃশেষে। সেই ভস্মাবশিষ্ট মনে শ্মশানে সৃষ্টির ধ্বজা উড়িয়ে কেমন করে ঘর বাঁধবে তুমি স্বয়ংবরা !

সহসা অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজে পেলেন যেন স্বয়ংবরা। আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা।

স্বয়ংবরা বললেন, তা আমায় যে পারতেই হবে মুনিবর। এছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর নেই। আমরা এখনো পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হলেও মন আমার আপনাতেই সমর্পিত হয়েছে বহু আগে হতে। কুসুমরস শোষণকারী নিষ্ঠুর কীটের মতো আপনার চিন্তা অনুক্ষণ আমার মনের সব সুষমাকে হরণ করে ফেলেছে। আপনাকে ছাড়া আর কাকে আমার এই উচ্ছিষ্ট মন দান করতে পারি মুনিবর ?

পুলস্ত্য মুনি বিস্মিত হয়ে বললেন, একথা আগে আমায় জানাও নি কেন স্বয়ংবরা ?

স্বয়ংবরা বললেন, জানাতে গিয়ে পারি নি। মুখ ফুটে বলতে গিয়ে স্বপ্নমধুর এক লজ্জার আঘাতে মূক হয়ে গেছি মুনিবর। এক নিষ্ঠুর আশংকার কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে আমার অন্তর।

কথাটা বলতে বলতে সত্যিই লজ্জা অনুভব করলেন স্বয়ংবরা। বলা শেষ করে মুখ নত করে বসে রইলেন নীরবে।

পুলস্ত্য মুনি কিছু আর বললেন না। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক চিন্তা করার পর পুলস্ত্য মুনি বললেন, সন্ধ্যাপ্রদীপের এই শান্ত আলোকশিখাকে সাক্ষী করে আজ আমি তোমায় গ্রহণ করলাম স্বয়ংবরা।

স্বয়ংবরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন পুলস্ত্য মুনি।

আনন্দে চোখে জল এলো স্বয়ংবরার। জীবনে এত বিপুল আনন্দ কোনোদিন অনুভব করেন নি এর আগে।

আনন্দাশ্রুর সমস্ত বেগ দমন করে শান্তকণ্ঠে স্বয়ংবরা বললেন, আমি আজ ভগবানের নামে শপথ করছি, জীবনে কোনোদিন আপনার সাধনকার্যে কাঁটারূপে বিঘ্ন সৃষ্টি করব না। বরং সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করে যাব সে সাধনায়।

কয়েকদিন অনিদ্রার পর আজ সারাটি রাত ধরে এক গভীর সুষুপ্তিস্বাদ উপভোগ করলেন স্বয়ংবরা। সকালে উঠে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পরদিন সকাল হতে জোর বৃষ্টি শুরু হলো।

স্বয়ংবরা দেখলেন, মেঘগম্ভীর বিশাল মুখমণ্ডলে অশনির ঘোর দুন্দুভিনিনাদিত বিদ্যুল্লতার বিশাল ইন্দ্রধনু ও সুতীক্ষ্ম বর্ষণধারার নিশিত শায়ক হাতে বর্ষা রণসাজে এসেছে পৃথিবীতে। আর এদিকে নবজলসম্পাতে উৎফুল্ল পৃথিবী নীলাদি রত্নভূষিতা বরাঙ্গী সুন্দরীর মতো দলিত বৈদুর্যমণিসন্নিভ নবোদ্ভিন্ন শ্যামল তৃণাঙ্কুর ও পত্রাবলীতে সজ্জিত হয়ে স্নিগ্ধসজল প্রেমালাপে তাকে প্রীত করবার চেষ্টা করছে।

স্বয়ংবরার মনে হলো জলেস্থলে পৃথিবী আজ গর্ভবতী রমণীর পীন স্ফীত স্তন-মণ্ডলের ন্যায় এক রসঘন ঐশ্বর্যের প্রভাপুঞ্জে বিরাজিত।

যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন স্বয়ংবরা। কিন্তু পাছে সন্তানস্নেহ সাধনাকে ব্যাহত করে কোনোপ্রকারে এই ভেবে সন্তানকে পুলস্ত্য মুনির কাছ থেকে দূরে রাখলেন তিনি।

আগেকার বেশ ছেড়ে তপস্বিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন স্বয়ংবরা। তপস্বিনীর বেশে অতি সতর্কতার সঙ্গে শুধু সেবা করে যেতেন পুলস্ত্য মুনির।

তপস্বিনীর বেশ ধারণ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় যৌবন ফিরে পেলেন স্বয়ংবরা। নিটোল ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্ভার-সমৃদ্ধ রক্তাভ দেহাবয়ব হতে নিয়ত বিচ্ছুরিত হতে লাগল এক অনুপম লাবণ্যচ্ছটা।

কিন্তু যতদূর সম্ভব তা জানতে দিতেন না কাউকে। নিয়ত রুক্ষ ও অবিন্যস্ত রেখে দিতেন তাঁর দীর্ঘ আলুলায়িত কেশপাশ। বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ঢেকে রাখতেন তাঁর প্রতিটি অঙ্গের লাবণ্যোচ্ছ্বাস। কাঞ্চীদাম দ্বারা নির্মমভাবে পিষ্ট করে রেখে দিতেন তাঁর উদ্ধত উত্তুঙ্গ পীবরস্তন দুটিকে।

তবু প্রস্তরপ্রতিহত সাগরগামিনী নদীর মতো দিনে দিনে স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর সংযমশাসিত যৌবনসৌন্দর্যের উদ্দাম বেগ।

মাঝে মাঝে পুলস্ত্য মুনি স্বয়ংবরার পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন দেখতে থাকেন। দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ভাবেন ওর কোনো দোষ নেই। যে নির্মম অবহেলা দ্বারা একদিন অবজ্ঞাত করেছিলেন স্বয়ংবরার দেহসৌন্দর্যকে, আজ অনুরূপ অবহেলার দ্বারা তাঁর প্রতি প্রতিশোধ নিচ্ছে স্বয়ংবরা। বলবার কিছুই নেই। তাই ভয়ে কোনো কথা বলতে পারেন না স্বয়ংবরাকে।

স্বয়ংবরা কিন্তু গৃহকর্ম ও সন্তান পালন নিয়ে সব সময় এমনি ব্যস্ত থাকেন যে কোনোদিকে একবার তাকাবার কোনো অবকাশ পান না। অথবা হয়তো সে অবকাশ চান না তিনি।

এমনি করে দেখতে দেখতে বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত ও শীত তিনটি ঋতু কেটে গেল। আশ্রম প্রাঙ্গণে দিনে দিনে কত মালতী মল্লিকা ও কুন্দকেতকী ফুটে ঝরে গেল, কত ঢেউ বয়ে গেল পম্পা নদীর জলে, কোনোদিন একবার তা চেয়ে দেখলেন না স্বয়ংবরা। অবশেষে এলো বসন্ত। মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি। এমন দুরন্ত বসন্ত আর কখনো আসে নি তাঁর আশ্রমে।

পুষ্পভারানতা প্রিয়ঙ্গুলতিকার মতো ক্ষীণকটিপ্রান্তা সুন্দরী স্বয়ংবরাকে দেখে দিনে দিনে কামাবিষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন পুলস্ত্য মুনি। কিছু কিছু ত্রুটি ঘটতে লাগল তাঁর তপস্যাকার্যে।

স্বয়ংবরা তা বুঝতে পেরে স্থির করলেন, কিছুকালের জন্য তিনি পিতৃগৃহে চলে যাবেন। তারপর একে একে পুলস্ত্য মুনির অশান্ত মনটা শান্ত ও সংযত হয়ে উঠলে আবার চলে আসবেন।

সেদিন ছিল বসন্ত পূর্ণিমা। সন্ধ্যার কিছু আগে সারাদিনের গৃহকর্ম সেরে বিদায় চাইলেন স্বয়ংবরা পুলস্ত্য মুনির কাছে। স্থির করেছেন, আজই তিনি চলে যাবেন মহর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি।

ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমায় না জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তোমার উচিত হয় নি। শত হলেও তুমি আমার ধর্মপত্নী, আমার প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে।

শান্ত কণ্ঠে অনুযোগ করলেন স্বয়ংবরা, সে কর্তব্যে কি কোনোদিন অবহেলা করেছি আমি?

পুলস্ত্য মুনি বললেন, সে কথা আমি বলছি না। আমি বলছি, তুমি আগে বলো নি কেন একথা।

স্বয়ংবরা বললেন, আমি যাব না। আপনার অমতে কখনো কোনো কাজ আর করব না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শান্ত ও আশ্বস্ত হলেন পুলস্ত্য মুনি।

সন্ধ্যা হতেই চাঁদ উঠল নির্মল আকাশে। বৃক্ষশাখার ফাঁকে ফাঁকে সে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল কেতকীপরাগসুবাসিত বনভূমির উপর। মন্দ মলয়সমীরণকম্পিত ছায়াবগুণ্ঠিত সে আলোক দেখে মনে হতে লাগল যেন কোনো লজ্জাবতী সুন্দরী রমণী কৃত্রিম ক্রোধভরে প্রিয়সঙ্গ ত্যাগের জন্য উন্মুখ ও চঞ্চলা হয়ে উঠেছে।

মত্ত মাতঙ্গের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠলেন পুলস্ত্য মুনি। উদ্ধত কামাবেগকে কোনোমতেই শান্ত বা সংযত করতে পারলেন না অন্তরে।

স্বয়ংবরার একটি হাত ধরে সংগম প্রার্থনা করলেন তাঁর কাছে।

মুহূর্তে সজোরে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে কুটিরের মধ্যে গিয়ে দরজাটি অর্গলবদ্ধ করে দিলেন স্বয়ংবরা।

আর সেই রুদ্ধদ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল প্রার্থনায় বারবার করাঘাত করতে লাগলেন

পুলস্ত্য মুনি। বললেন, কথা শোন স্বয়ংবরা, অভিমান করো না, যদি কোনো দোষ করে থাকি ক্ষমা করো। মাত্র একটি বারের জন্য দরজা খোল। আমার হৃদয় হতে স্বতোৎসারিত এই কামনাটিকে একটিবারের জন্য তৃপ্ত করতে দাও। জীবনে আর কোনোদিন কোনো কিছুই চাইব না তোমার কাছে।

তবু একটিবারের জন্যও দরজা খুললেন না স্বয়ংবরা। শুধু কাঁদতে লাগলেন ফুলে ফুলে।

সহসা স্বয়ংবরার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে চমক ভাঙল পুলস্ত্য মুনির। স্বয়ংবরা তাহলে সত্যিই ভালবাসে তাঁকে। তাঁর মংগলের জন্যই আজ এতখানি কঠোর হয়ে উঠেছে সে। তাঁর ভালোর জন্যই এক তীব্র যন্ত্রণায় নিজেও জ্বলছে সে।

রাত্রি শেষ হতে দরজা খুলে বাইরে এলেন স্বয়ংবরা। এসে আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যজ্ঞভূমিতে অসময়ে ধ্যানে বসেছেন পুলস্ত্য মুনি। তাঁর দেহ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল। এমন কি শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াও রুদ্ধ।

সেই যে ধ্যানসমাধিস্থ হলেন পুলস্ত্য মুনি, আর কোনোদিন জাগলেন না। সম্বিৎ ফিরে এলো না তাঁর শত চেষ্টাতেও।

আছাড় খেয়ে ভূমির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন স্বয়ংবরা।

বালক বিশ্রবাকে নিয়ে সেই আশ্রমেই রয়ে গেলেন স্বয়ংবরা। প্রতিদিন রাত্রি গভীর হলে এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল মাথার উপরে এলে নক্ষত্রখচিত দূর আকাশের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিশ্রবাকে কি দেখান স্বয়ংবরা। বলেন, ওই যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্ছে, ওর পুরোভাগে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিরাজ করছেন। উনিই তোমার পিতা। উনি স্বর্গে গেছেন। কিন্তু ওঁর সাধনার আজও শেষ হয় নি।

সৌরলোকেরও অনেক ঊর্ধ্বে ওই সপ্তর্ষিলোক। ত্রিলোকের উপাস্য সূর্যদেব স্বয়ং সম্ভ্রমভরে ঊর্ধ্বনেত্রে চেয়ে থাকেন এই সপ্তর্ষিদের পানে। কল্পান্ত সংকটে জগতের সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বয়ং ধরিত্রীর মতে সপ্তর্ষিমণ্ডলও মহাবরাহের দশন আশ্রয় করে প্রলয় পয়োধি জল হতে উঠে আসেন, বিনাশপ্রাপ্ত হন না কখনো।

স্বয়ংবরা বিশ্রবাকে আরও বললেন, জন্মান্তরজাত তপস্যার সমস্ত ফল ওঁরা ভোগ করেন সত্য। কিন্তু তবু তপস্যার ওঁদের শেষ নেই। যাঁদের তপস্যা সকাম, ফল-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হন তাঁরা সে তপস্যা হতে। কিন্তু সপ্তর্ষিরা তপস্যার জন্যই তপস্যা করে যান যুগ যুগ ধরে।

সুগ্রীব ও তারা



ভালো করে চেয়ে দেখলে একই আকাশে পাশাপাশি দুটি নক্ষত্রের মধ্যে হয়তো কিছু না কিছু পার্থক্য চোখে পড়বে। এক বৃন্তে ফোটা দুটি ফুলের মধ্যে হয়তো আছে কিছু পার্থক্য। কিন্তু বালী ও সুগ্রীব দুই ভাইএর রূপাবয়বের মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো পার্থক্যই চোখে পড়বে না।

অন্তত বিবাহের পর নববধূ তারার তাই মনে হয়েছিল। প্রথম প্রথম দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন তারা। মনে হয়েছিল, একই আত্মা একই প্রাণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি অঙ্গের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে যেন ছলনা করছে তাঁর দৃষ্টিকে। বিভ্রান্ত করছে তাঁর মনকে।

কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হলেন তারা যখন দেখলেন, দুজনের দেহের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকলেও কী বিরাট পার্থক্য দুজনের মনে। দেহ দুটো দেখতে যত একই রকমের হোক, মনের দিক থেকে এতটুকু মিল নেই দুজনের।

দৈহিক শক্তি বালিরই বেশী কিন্তু বালির প্রকৃতি কিছু উগ্র। যেমন শক্তি তেমনি তেজ। অন্যদিকে সুগ্রীব বালির মতো অতখানি শক্তিসম্পন্ন না হলেও বেশ ধীর স্থির এবং শান্ত। চিন্তাশক্তির গভীরতা বা ব্যাপকতা কোনোটাই নেই বালির। বিশেষ ভাবনা চিন্তা না করেই হঠাৎ কোনো কাজ করে বসেন। তাছাড়া একটুতেই রেগে যান। কেউ কোনো দোষ করলেই নির্মমভাবে শাস্তি দেন তাকে। কোনোদিন কোনো ক্ষমা প্রদর্শন করেন না কারো প্রতি।

ভালভাবে কোনো কিছু বিবেচনা না করে সুগ্রীব কিন্তু কোনো কাজই করেন না। অনেক পরিণামদর্শী তিনি বালির থেকে। বেশী দোষ না করলে কখনো রাগেন না। দোষ স্বীকার করলেই দোষীকে ক্ষমা করেন।

মনের দিক থেকে যত পার্থক্যই থাক, দুই ভাইএ মিলে-মিশে থাকতে পারে। বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন বস্তুরাজিও পাশাপাশি বিরাজ করে প্রকৃতি জগতে। রুক্ষ কঠিন ভূধরের পাশে রয়েছে স্নিগ্ধ সবুজ ভূমিরুহ। বিক্ষুব্ধ লবণ সমুদ্রের পাশে রয়েছে শান্ত সুপেয় সরোবর।

তারা ভেবে পান না, দুই ভাইএর মধ্যে কেন এত বিরোধ। কেন এত অকারণ বিষমতা। দোষটা কিন্তু বালিরই বেশী বলে মনে হয়। বালি বয়সে বড়। সুগ্রীব তাঁর অগ্রজকে যতখানি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, বালি তাঁর অনুজকে স্নেহ করেন না ততখানি।

দেখে শুনে অত্যন্ত ব্যথা পান তারা, দুজনকে শান্ত করবার চেষ্টা করেন। বালিকে বলেন, তুমি বড়। বড় গাছকে সব সময় বড় ঝড় সহ্য করতে হয়। ছোট ভাই যদি কোনো দোষ করে থাকে তবে তার সঙ্গে ঝগড়া না করে বুঝিয়ে বলবে, শিক্ষা দেবে।

আবার সুগ্রীবকে বলেন, উনি তোমার বড় ভাই। যদি উনি কখনো দুটো শক্ত কথা বলে ফেলেন, তাহলে তা নীরবে সহ্য করতে হয়। তা নিয়ে রাগ করতে নেই।

সংসারে ধৈর্যের মতো বড় গুণ আর নেই। ধৈর্য ধরে সব কিছুকে সহ্য করলে একদিন না একদিন তার প্রতিফল পাবেই! যদি উনি সত্যিসত্যিই ভুল করেন তোমার প্রতি, তাহলে একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সে ভুল অথবা বাধ্য হয়ে তাঁকে করতে হবে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

সুগ্রীব তারার কথা শোনেন। তাঁর কথামত চলবার চেষ্টা করেন। স্বাধিকারপ্রমত্ত বালি কিন্তু কোনোদিন তা শোনেন না। তিনি স্পষ্ট বলেন, যুদ্ধে যেহেতু তিনি অপ্রধৃষ্য, পরের কথামতো চলবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বালির আর একটি বড় দোষ হলো, তাঁর কোনো সৌন্দর্যচেতনা বা প্রেমবোধ নেই। নিজের শক্তির দম্ভে বালি সব সময় এমনি মত্ত যে, নিসর্গ প্রকৃতির বা মানুষের কোনো সৌন্দর্যকে কোনোদিন স্বীকার করেন না তিনি। এতদিন পর্যন্ত তারা কোনোদিন কোনো জীবকে ভালবাসতে দেখেন নি তাঁকে।

তিন দিকে পর্বতশৃঙ্গপরিবেষ্টিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর শোভা বড় মনোরম। একটু দূরেই জনস্থানের প্রস্রবণগিরি, ধূম্রপ্রতিম কুহেলিজালে সতত সমাচ্ছন্ন থাকে যার অভ্রভেদী শিখরদেশ। এদিকে মাল্যবাণ পর্বত। ওদিকে ঋষ্যমূক। তার ওদিকে সুমেরু। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়, নদী আর বন। শুভ্রধবল যজ্ঞ উপবীতের মতো স্বচ্ছতোয়া কত নদী বয়ে যায় ধ্যানগম্ভীর সে সব পাহাড়ের গাত্র বেয়ে। রুক্ষ বিপুল জটাজালের মতো কৃষ্ণাভ অরণ্যকুহেলি জমাট বেঁধে থাকে তাদের মস্তকে। পুষ্পকেশরসুরভিত সেই সব অরণ্যভূমির উপান্তে নর্মবিহ্বল মৃগদম্পতি কেলি করে।

এই পাহাড়, নদী আর বনের মাঝখানে অবস্থিত হচ্ছে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। সতত-সজাগ প্রহরীর মতো পাহাড় সে নগরীকে দান করে নিরাপত্তা। অরণ্য তাকে দান করে ছায়াস্নিগ্ধ ও কুসুমগন্ধসুবাসিত মৃদু সমীরণ। নদী তাকে দান করে শীকরসিক্ত শীতলতা।

মহারাজ বালির কিন্তু সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। স্বর্ণোজ্জ্বল সৌরালোক অথবা রজতশুভ্র চন্দ্রাতপে কেমন পরিশোভিত হয়ে ওঠে সে পাহাড় একবারও তা তিনি চেয়ে দেখেন না কখনো। তিনি জানেন না কোন্ ঋতুতে কি ফুল ফোটে সে অরণ্যে। নববিকশিত কুসুমদাম হতে যে গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে শীকরকণাসিক্ত বাতাস, সে গন্ধ উপভোগ করেন না কখনো।

দেহচর্চা আর শক্তিচর্চা দিয়ে সারা দিনটা কেটে যায় বালির। ভোজন ও শয়নবিলাসী বালির আহারের জন্য উত্তম খাদ্য ও শয়নের জন্য উত্তম শয্যার যদি কখনো এতটুকু ত্রুটি ঘটে, তাহলে ভয়ংকর রকমের ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন তিনি।

সকালে উঠেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমুদ্রস্নান করতে যান বালি। স্নান করতে করতে সমুদ্র তরংগের সঙ্গে খেলা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আপন বাহুর শক্তি পরীক্ষা করেন। দূর দিকচক্রবালে শান্তনীল জলরাশির অতল গর্ভ হতে ধীরে ধীরে কিভাবে উত্থিত

হতে থাকে রক্তরশ্মিজালমণ্ডিত প্রভাতমিহির তা কোনোদিন দেখেন না বালি।
সমুদ্রস্নান থেকে এসেই আহারচিন্তা। আহারের পর বিশ্রাম। তারপর আবার ভোজন। তারপর শয়ন। বেশীর ভাগ রাজকর্ম তারাকেই সারতে হয়। অমাত্যগণ ও সুগ্রীব তাঁকে সাহায্য করেন সে কার্যে।
নৃত্যগীত একেবারে পছন্দ করেন না বালি। অন্তঃপুরের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের সমস্ত ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছেন তিনি। গভীর রাত্রিতে বালি নিদ্রিত হয়ে পড়লে বরনারীরা লুকিয়ে নৃত্যগীত করে সুগ্রীবের অন্তঃপুরে।
সারাদিন ব্যায়ামচর্চা ও প্রচুর ভোজনের ফলে সহজেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন বালি। কোনো কথা বলবার প্রয়োজন হলে ডেকে ডেকে সাড়া পান না তারা। সুন্দরী হিসাবে তারার খ্যাতি আছে। সকলেই প্রশংসা করে। কিন্তু সে সৌন্দর্যের প্রশংসায় বালি একটা কথাও বলেন নি কোনোদিন।
সুগ্রীব কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির মানুষ। বড় সৌন্দর্যপ্রবণ, ভাবুক আর প্রেমিক। রাজ্যের উন্নতির জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেন সুগ্রীব। কিন্তু গোধূলি হতে না হতেই রাজঅন্তঃপুরের উদ্যান-বাটিকায় লতাকুঞ্জবিম্বিত যে স্বচ্ছ সরোবরে ক্রৌঞ্চ ও সারস পাখি খেলা করে সেই সরোবরের মণিময় সোপানে গিয়ে একা বসে থাকেন। কোনো কোনো দিন পুষ্পোদ্যানে গিয়ে বিচিত্র ফুলের শোভা দেখতে থাকেন।
সন্ধ্যা হতেই সংগীতের সভা বসে সুগ্রীবের নিজস্ব অন্তঃপুরে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে সে সভার অনুষ্ঠান। সংগীতের তালে আর নৃত্যের ঝংকারে মুখর হয়ে ওঠে নিশীথ নিঝুম রাত্রি। এক একদিন বালির ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে করতে গিয়ে সে অনুষ্ঠান ভেঙে দেন। লণ্ডভণ্ড করে দেন সব কিছু।
এক একদিন সন্ধ্যার সময় সুগ্রীব যখন একা একা বসে থাকেন সরোবরের সেই মণিময় সোপানে, তখন বালির দৃষ্টি এড়িয়ে চুপি চুপি সেখানে গিয়ে তাঁর পাশে বসেন তারা। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে ও সুগ্রীবের সঙ্গে দুটো মনের কথা বলে অনেকটা শান্তি পান।
এদিকে সুগ্রীবের সঙ্গে তারা যদি কিছুক্ষণ বসে থাকেন অথবা কথা বলেন সুগ্রীবের স্ত্রী রুমা যেমন জ্বলে যান, বালিও তেমনি রেগে যান।
বালি বলবেন, ওর সঙ্গে কখনো মিশো না, ও লম্পট। অপদার্থ। ও শুধু মৈরেয় মধু পান করে বারবনিতাদের নিয়ে নাচ গান করতে থাকে। ওর সঙ্গে মেশা উচিত নয়।
তারা কিন্তু বালির এ কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। তাই সুযোগ ও সময় পেলেই সুগ্রীবের কাছে যান। দুটো কথা বলেন। সুগ্রীবের চরিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনো দুর্বলতা খুঁজে পান না তারা। তাঁর মনে হয় যদি কোনো দুর্বলতা থেকেও থাকে তাহলে তাঁর সমস্ত দুর্বলতার অন্তরালে সৌন্দর্য ও প্রেমের শক্তিতে সমৃদ্ধ ও সততমধুর একটি মন আছে যার ছোঁয়া পেয়ে খুশি হন তিনি।

সব দিক থেকে সুগ্রীব যে একজন আদর্শ পুরুষ সেকথা মনে করেন না তারা। তবে একজন আদর্শ মানুষের যে সব গুণ থাকা দরকার তার অনেকগুলিই আছে সুগ্রীবের মধ্যে। শুধু একটি গুণ নেই যা আছে বালির মধ্যে। অন্যদিকে বালির আবার সেই গুণটি ছাড়া আর কোনো গুণই নেই।

অনেক গুণই আছে সুগ্রীবের। কিন্তু বালির মতো দেহে তাঁর শক্তি নেই। মনের মধ্যে নেই তেমন পুরুষোচিত তেজস্বিতা। এক পুরুষালি উত্তাপে সততউত্তপ্ত হয়ে থাকে যেমন বালির মনটা, নারীসুলভ এক কোমলতায় সুগ্রীবের মন তেমনি ভিজে থাকে সব সময়।

তাই তারার মাঝে মাঝে মনে হয় বালির মতো অমনি শক্তিমান ও তেজস্বী হতো যদি সুগ্রীব এবং বালি যদি সুগ্রীবের মতো সৌন্দর্যপ্রিয় ও কোমলস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ হতেন তাহলে খুব ভালো হতো। তাহলে সবচেয়ে সুখী হতেন তিনি জীবনে।

একবার শত্রু জয়ের জন্য যুদ্ধে গেলেন বালি। সুগ্রীব বললেন, আমিও যাই। কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে।

বালি বললেন, সব বিপদকে একা জয় করব আমি। কাউকে ভয় করি না। কারো সাহায্য চাই না। বিশেষ করে তোমার সাহায্য নিয়ে জীবনে যদি বেঁচে থাকতে হয় আমাকে তাহলে আমার না বাঁচাই ভালো।

মাথা নিচু করে ক্ষুণ্ণ মনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন সুগ্রীব।

অন্তরে বড় ব্যথা পেলেন তারা। কিন্তু কিছুই বলবার নেই।

এমনি করে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা বুঝেছেন, সুগ্রীব সত্য সত্যই তার জ্যেষ্ঠকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। ভক্তি করে। শ্রদ্ধা করে। বালি কিন্তু একটুও স্নেহ করেন না তাঁর অনুজকে।

সুগ্রীবকে অনেক করে বোঝালেন তারা, রাজকার্যের জন্য তোমার রাজ্যে থাকা উচিত। তুমি কিছু মনে করো না ওঁর কথায়। উনি তো আর একা একা যাচ্ছেন না। সঙ্গে অনেক সৈন্য সামন্ত থাকবে।

কিছুদিনের জন্য রাজধানী ত্যাগ করে যুদ্ধে গেলেন বালি।

এই অবকাশে সুগ্রীবের অনেক কাছে আসবার সুযোগ পেলেন তারা।

সুগ্রীব বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী বর্তমান। তবু তিনি প্রথম হতে তারার প্রতি যেন একটু বেশী আসক্ত। তারা বুঝতে পারেন, এটা অন্যায়। তাঁর প্রতি সুগ্রীবের এ দুর্বলতা অনুচিত অবৈধ। তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারেন না তারা। তবু যখন সুগ্রীব তাঁর রূপগুণের প্রশংসা করেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তখন লজ্জারুণ কোমলতার এক বিগলিত প্রবাহে সমস্ত দৃঢ়তা ভেসে যায় তাঁর। তিনি সব কিছু ভুলে যান।

প্রতিদিন রাজকার্য হয়ে যাবার পর অপরাহ্নে সেই উদ্যানবাটিকার সরোবরে গিয়ে তারার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন সুগ্রীব। তারাও কেশবিন্যাস ও উপযুক্ত বেশভূষা

করে অধীর উদগ্রীব হয়ে ওঠেন সেখানে যাবার জন্য।

সারা উদ্যানে সমস্ত ফুটন্ত ফুলগুলির মধ্যে যে ফুলটিকে সবচেয়ে সুন্দর দেখেন সুগ্রীব, সেই ফুলটিকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিন্যস্ত কেশস্তবকে তা সযত্নে গ্রথিত করে দেন নিজের হাতে।

এক একদিন সন্ধ্যার পর তারাকে তার সংগীত সভায় নিয়ে যান সুগ্রীব। সেখানে রাত পর্যন্ত নৃত্যগীত উপভোগ করেন তারা।

এই নিয়ে রাজ অন্তঃপুরে তারার চরিত্র ইংগিত করে এক চাপা গুঞ্জন উঠতে থাকে আজকাল। সবাই বলে বালির অবর্তমানে তারা নাকি প্রণয়াসক্ত হয়েছেন সুগ্রীবের প্রতি।

একদিন বিকালে সুগ্রীবকে কথাটা জানালেন তারা। জানিয়ে বললেন, তিনি আর আসবেন না সুগ্রীবের কাছে। প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবেন না তাঁর সঙ্গে।

বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সুগ্রীব বললেন, এ নিয়ে কথা বলবার কি আছে? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি।

সত্যই কোনো অন্যায় করেন নি সুগ্রীব। তারা তা ভালভাবেই জানেন। আজ পর্যন্ত কোনো বিহ্বল মুহূর্তে কোনো ছলে স্পর্শ করেন নি তাঁর দেহ। অথবা ভোগলালসাত্মক কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করেন নি কোনোদিন। নিতান্ত নিস্পৃহচিত্তে সহজভাবে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করেন সুগ্রীব দুজনের মাঝে একটি সম্মানিত ব্যবধান বাঁচিয়ে রেখে।

সুগ্রীব দুঃখের সঙ্গে বললেন, আমি তোমায় একজন সাধারণ নারীরূপে দেখি না। দেখি দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্যের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে। নারীর মানস ও দেহসৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার যা ধারণা সেই ধারণাকে মূর্ত দেখছি তোমার মধ্যে। তোমার চেয়ে আরও রূপগুণসম্পন্ন রমণী হয়ত অনেক আছে কিন্তু আমি অন্ততঃ তা দেখি নি। তাই আমি তোমাকে কাছে পেয়েই তৃপ্ত।

তারার মুখপানে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন সুগ্রীব। চেয়ে বললেন, এর বেশী আমি কিন্তু তোমার কাছে কিছুই চাই নি। তোমার ভালবাসা আমি চাই না। আমিও ঠিক তোমাকে ভালবাসি না। আমি শুধু তোমার দেহের সৌন্দর্যকে প্রশংসা করি। তোমার মনের সুষমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার আত্মার মহত্ত্বকে ভক্তি করি। যদি কিছু তোমার কাছে পেতে চাই তো সে তোমার প্রসন্নতা, তোমার ভালবাসা নয়।

সুগ্রীবকেও তারা কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণের প্রতীকরূপেই দেখেন। সে যেন রক্তমাংসের একজন বিশেষ ব্যক্তি নয়, কতকগুলি নির্বিশেষ গুণের বিমূর্ত প্রতীক।

প্রতীক হলেও তাকেই ভালবেসে ফেলেছেন তারা। সুগ্রীবের দেহ, মন এবং আত্মাকে পৃথক করে দেখতে পারেন না তিনি। সব মিলিয়ে তাঁকে ভালবাসেন। এই সব গুণ

সুগ্রীবের পরিবর্তে যদি অন্য কারো মধ্যে থাকত তাহলে তাকেই তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু আর কাউকে তিনি জানেন না। তাই সুগ্রীবকে তিনি ভালবাসেন।

কিন্তু সুগ্রীবকে ভালবাসলেও কিছুমাত্র কমেনি তাঁর বালির প্রতি ভালবাসা। বালিকে তিনি কেন যে ভালবাসেন তা তিনি নিজেই ঠিক বুঝতে পারেন না। সম্পর্কের সূত্রে বালি তাঁর স্বামী, এ ছাড়া কী গুণ আছে তাঁর মধ্যে তা ভেবে পান না।

তবু বালিকে তিনি ভালবাসেন। বালির অনলতুল্য তেজস্বিতা ও পৌরুষদৃপ্ত ভংগিমাটি বড় চমৎকার। বালি যখন ক্রোধকুটিল ভ্রূকুটি করে শত্রুকে শাসন করেন অথবা তাঁর পেশীবহুল বিশাল বাহু তুলে কোনো পর্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত করেন তখন তা দেখতে বড় ভালো লাগে তারার। তাই বালিকে কিছুদিন দেখতে না পেয়ে তাঁর বিরহব্যথা অনুভব করেন তারা।

তারা এক এক সময় অনুভব করেন, তাঁর সমগ্র সত্তাটাই হয়ে ওঠে শুধু প্রেম। তখন প্রেম ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তাঁর জীবনে। আর সেই প্রেমময় সত্তাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি পাখি রূপে দুদিকে উড়ে যেতে চায়। সৌন্দর্যপিয়াসী একটি পাখি আকাশের ইন্দ্রধনুর রং ছুঁয়ে ছুঁয়ে অরণ্যের বুকের সবুজে ডুব দিয়ে সমস্ত ফুলের গন্ধকে আস্বাদন করে শুধু উড়ে বেড়াতে চায়। আর একটি পাখি কিন্তু একটি বিরাট জড়বস্তুকে অবলম্বন করে এই পৃথিবীর মাটিকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে চায় সারাজীবন। দুটি পাখিই কিন্তু গানে গানে তারার মনের কথাকে ব্যক্ত করে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়।

তারা খুঁজে পান না, তিনি নিজে কোন্‌টা চান। দুটির মধ্যে একটাকে গ্রহণ করতে হলে কোন্‌টাকে বেছে নেবেন তিনি।

একথা ভেবে কোনোদিন ঠিক করতে পারেন নি তিনি। ভাবতে গেলে সত্তার গভীরে টান পড়ে। অব্যক্ত ব্যথায় ভারী হয়ে পড়ে বুকটা। চীৎকার করে সবাইকে বলতে ইচ্ছা করে তিনি দুটোকেই চান। একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে গ্রহণ করে অর্ধভগ্ন সত্তার অব্যক্ত নিবিড় যন্ত্রণাকে চিরদিন সহ্য করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু লজ্জায় সেকথা প্রকাশ করতে পারেন না। এ কথা প্রকাশ করা যায় না বাইরে।

শত্রু জয় করে যথাসময়ে বিজয়গর্বে ফিরে এলেন বালি।

বালি এসে তাঁর স্বভাবমতো বিনা কারণে তিরস্কার করতে লাগলেন সুগ্রীবকে। বললেন, দিনরাত আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময় নষ্ট করে রাজকার্যে তুমি অবহেলা করেছ।

তারাকেও শাসন করলেন। অভিযুক্ত করলেন একই দোষে। অথচ আসলে কিন্তু বালি নিজেই সবচেয়ে বেশী অবহেলা করেন রাজকার্যে। কিন্তু তারা সেকথা স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না তাঁর মুখের সামনে।

তবু বালির ওই শাসনটিকে বড় মধুর মনে হয় তারার। বালি কিছুদিন না থাকলে এই শাসনের কথা মনে পড়ে। সুগ্রীবের প্রেমময়তায় যেমন তিনি মুগ্ধ হতে চান বালির শক্তিময়তায় তেমনি ভীত হতে চান মাঝে মাঝে।

বালির ভয়ে আজকাল আর অপরাহ্নে সুগ্রীবের কাছে যাওয়া হয় না তারার। কেশবিন্যাস করে উত্তম বস্ত্র পরিধান করে একা অন্তঃপুরে বসে থাকেন। মনে বড় কষ্ট পান। কিন্তু উপায় নেই।

তারা ভাবেন সুগ্রীবের হয়ত কোনো কষ্টই হয় না একা বসে থাকতে। একা বসে বসে হয় আকাশে গোধূলির রং দেখবে না হয়তো সরোবরের ঢেউ গুনবে অথবা ফুলের বনে গিয়ে খেলা করবে আপনার মনে।

একটি বছর পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন তারা। তার নাম রাখা হলো অঙ্গদ।

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল সে সন্তান। সন্তান নিয়ে অনেকটা সময় কেটে যেতে লাগল তারার।

সহসা একদিন বিপদ দেখা দিল বড় রকমের। নগরপ্রান্তে এক শত্রু এসে যুদ্ধে আহ্বান করল বালিকে। বালি ও সুগ্রীব দুজনেই বেরিয়ে পড়লেন।

একটি বছর কেটে গেল। কিন্তু দুজনের মধ্যে কেউ ফিরলেন না। দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন তারা। ভেবে ভেবে ক্ষীণকায়া ও বীতনিদ্র হয়ে উঠতে লাগলেন।

দিনে দিনে সমুদ্রের উপর দিয়ে বিশালকায় কত ঢেউ বয়ে গেল। তবু একবার স্নান করতে গিয়ে সে ঢেউ নিয়ে একবারও খেলা করলেন না বালি। চারিদিকের অরণ্যে অটুট রয়ে গেল সমস্ত বৃক্ষশাখা। একটিও উৎপাটিত করলেন না তিনি।

কত ফুল ফুটে ঝরে গেল রাজোদ্যানের লতাবাটিকায়। তবু সে সব ফুল নিয়ে একবারও খেলা করলেন না সুগ্রীব।

সেদিন নিজের ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন তারা। সহসা একজন দাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, সুগ্রীব ফিরে আসছেন।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তারা। তাঁর অন্ধকার মুখমণ্ডলে আলো ফুটে উঠল বহুদিনের পর।

কিন্তু পরক্ষণেই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তারা, মহারাজ বালিও সঙ্গে আসছেন তো?

দাসী নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তে সব আলো নিবে গেল তারার মুখ হতে। তবে কি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন বালি? অঙ্গদকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তারা। সুগ্রীব কাছে এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললেন।

বালির ভয়ে শত্রু একটি গহ্বরে গিয়ে ঢুকতেই বালিও তার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

ঢোকবার সময় সুগ্রীবকে বলে গেলেন, আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তুমি গহ্বর মুখে। কিন্তু একটি বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ফিরে এলেন না বালি। সহসা একদিন সেই গহ্বর মুখ হতে তীর বেগে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্তের ধারা। সুগ্রীব বললেন, আমি ভাবলাম, শত্রুহস্তে নিহত হয়েছে বালি। আর অপেক্ষা করা বৃথা এই ভেবে ফিরে এলাম। এবার আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন আমি নিরুপায়। ব্যথাহত। আমার বুদ্ধি বিপন্ন।

একা ফিরতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এই সংবাদ দানের জন্য কর্তব্যের খাতিরেই আসতে হলো আমায়।

রাজ্যের অমাত্যরা বালির অবর্তমানে রাজা করলেন সুগ্রীবকে। কারণ কুমার অঙ্গদ এখন নাবালক। কোনো আপত্তি করলেন না তারা। এতে আপত্তি করবার কিছু নেই।

প্রথামত অভিষেকের সময় সুগ্রীবের পাশে এসে সিংহাসনে বসলেন তারা।

বড় ভাইএর মৃত্যুর পর তার রাজ্য ও স্ত্রীতে ছোট ভাইএর অধিকার। সে অধিকারকে অস্বীকার করতে পারলেন না তারা।

তারাকে পেয়ে যতখানি খুশি হলেন সুগ্রীব, সুগ্রীবকে পেয়ে কিন্তু ততখানি খুশি হতে পারলেন না তারা।

সুগ্রীবের সঙ্গে যখন মাঝে মাঝে দেখা হতো তারার, দেখা হওয়ার জন্য যখন ছিল ব্যগ্রব্যাকুল এক প্রত্যাশা আর উৎকর্নিবিড় প্রতীক্ষা তখন সুগ্রীবকে খুব ভালো লাগত তারার। তখন একবার সুগ্রীবকে কাছে পেলে তাঁকে ছাড়তে ইচ্ছা হতো না।

এখন কিন্তু দিনরাত কাছে পেয়েও ভালো লাগে না সুগ্রীবকে। বড় তিক্ত মনে হয় তাঁর এই অবিরাম সাহচর্য। দিনের বেলায় বাধ্য হয়ে সিংহাসনে সুগ্রীবের পাশে বসলেও রাত্রিতে অন্য কক্ষে শয়ন করেন তারা।

সুগ্রীব তা বুঝতে পেরে তারাকে বললেন, তোমার কাছ হতে আমি কিছুই চাই না দেবী। তুমি প্রসন্নচিত্তে যখন যেটুকু দেবে সন্তুষ্টচিত্তে তাই গ্রহণ করব আমি। তুমি মনে প্রাণে মহারাজ বালিরই থাকবে। আমি রাজা হতে চাই না। রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করে যাই শুধু। বাধ্য হয়ে রাজসিংহাসনে বসলেও তোমার অন্তরের মধ্যে বালির যে সিংহাসন পাতা আছে সেখানে কোনোদিন বসতে চাইব না আমি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার দেবী।

তবু কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারেন না তারা।

তাঁর দ্বিধাবিভক্ত সত্তার যে দুটি পাখি পৃথিবী ও আকাশে মনের আনন্দে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াত, আজ তাদের মধ্যে একটি নেই। যে পাখিটি শুধু এই মাটির পৃথিবীতেই ঘুরে বেড়াত আর শুধু যত সব জড়বস্তু নিয়েই খেলা করত, সে পাখিটি আজ

আকাশ পৃথিবীর সমস্ত সীমানা পার হয়ে কোন্ অজানা জগতে চলে গেছে আর সে ফিরে আসবে না কোনোদিন।

তারার তাই মনে হয় পৃথিবীতে তাঁর যেন আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। পৃথিবীতে যেন কোনো আনন্দ নেই।

একটি পাখিকে হারিয়ে অন্য পাখিটি সাথীহারা বেদনায় আর উড়তে চায় না আকাশে। সহসা নিঃশেষিত হয়ে গেছে যেন তার সমস্ত সৌন্দর্যপিপাসা আর সুদূরের আকাঙ্ক্ষা। আজ স্বেচ্ছায় এক দুঃসহ বন্ধনকে মেনে নিয়ে সে পাখি তার অন্তরের খাঁচার মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে থাকে দিনরাত।

আজ যেন আকাশে ইন্দ্রধনুর মধ্যে কোনো রং নেই। ফুলের মধ্যে কোনো গন্ধ নেই। অরণ্যের মধ্যে কোনো সবুজ মায়া নেই।

অথচ সুগ্রীবের জন্য মায়া হয় তাঁর। সুগ্রীবকে যে একেবারে ভালবাসেন না তা নয়। শুধু সে ভালবাসার কোনো বাস্তব অভিপ্রকাশ নেই তাঁর মধ্যে।

সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে প্রায়ই বলেন তারা, তুমি সুগ্রীবকে দেখো। আমাকে তোমরা একেবারে বাদ দাও। আমি অর্ধমৃত হয়ে বেঁচে আছি। সুগ্রীব বড় অভিমানী। ভালবাসার কাঙাল। ভালবাসাকে ও রাজ্যসম্পদ অপেক্ষা বড় বলে মনে করে। তুমি ওকে ভালবেসে সুখী করো।

সুগ্রীবকে ভালবেসে সুখী করবার চেষ্টা করেন রুমা। কিন্তু পারেন না। তারা বুঝতে পারেন, তিনি ছাড়া আর কেউ সুখী করতে পারবে না সুগ্রীবকে। কিন্তু তিনি তো কোনোদিনই করতে পারবেন না।

আজকাল সুগ্রীব হয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। রাজকার্য সব ঠিকমত করে চলেন। যথাযথ পালন করে চলেন সমস্ত কর্তব্য। কোনো কর্তব্যেই কোনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু নিজের সাধ আহ্লাদ একেবারে সব ভুলে গেছেন সুগ্রীব।

দিনের শেষে আজকাল আর রাজোদ্যানের সেই মণিময় সোপানে গিয়ে বসেন না। ফুল নিয়ে খেলা করেন না। রাত পর্যন্ত নৃত্যগীত উপভোগ করেন না।

আজকাল আর সংগীতের কোনো অনুষ্ঠান বসতে দেন না সুগ্রীব তাঁর অন্তঃপুরে; বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে সব বরনারীরা। নিয়ত শোকস্তব্ধ হয়ে থাকে সমস্ত রাজপুরী।

একদিন সহসা আশ্চর্য এক পরিবর্তন দেখা দিল তারার মধ্যে। রাজ অন্তঃপুরে ঘোষণা করলেন তারা, আজ তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে বিহার করবেন। আজ রাত্রিতে সুগ্রীবের অংকশায়িনী হবেন স্বেচ্ছায়।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে। আশ্চর্য হলেন সুগ্রীব।

কোনো কথা বলতে পারলেন না সুগ্রীব। বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন। আনন্দ এবং বেদনা দুইই ছিল সে বিস্ময়ের মধ্যে।

সারাদিন ধরে রাজকার্য পরিচালনার পর অপরাহ্ণ হতেই কেশবিন্যাস করলেন

তারা। তারপর উত্তম সুবাসিত বস্ত্র ও রত্নালংকারে ভূষিত হয়ে রাজোদ্যানের সেই সরোবরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিছু আগে হতেই সেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন সুগ্রীব। হাতে ছিল তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও সুগন্ধি একটি ফুল। তারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেঘচিকুরিত ও চন্দ্রোপলশোভিত কেশকলাপের উপর গ্রথিত করে দিলেন সুগ্রীব সে ফুলটিকে।

কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল তারাকে। সুগ্রীব ভাবলেন, কিছুক্ষণ পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ধীর মন্থর পদক্ষেপে সরোবরের সেই মণিময় সোপানে গিয়ে বসলেন তারা। সুগ্রীবও নীরবে তার পাশে গিয়ে বসলেন।

সোপানে বসে একটু মুখটা সামনের দিকে বাড়াতেই নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন তারা সরোবরের শান্ত জলের উপর। তাঁর বেশভূষা ও মুখাবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল যেন প্রিয়াভিসারে এসেছে মদচঞ্চল কোনো কামিনী। নিজের মুখখানাকে দেখতে নিজেরই খারাপ লাগছিল তারার।

তাই হাত দিয়ে জলের উপর ছোট ছোট ঢেউ জাগিয়ে সেই প্রতিবিম্বটাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন তারা। সুগ্রীব ভাবলেন, জলকেলি করছেন তারা।

দেখে খুশি হলেন সুগ্রীব।

তারার আদেশে আজ সন্ধ্যা হতেই সংগীতের আসর বসবে। তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন সে আসরে।

সন্ধ্যার গন্ধতৈল-দীপ জ্বলে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সরোবরের সেই সোপান হতে সোজা অন্তঃপুরের সেই বিশাল সংগীতভবনটিতে চলে গেলেন তারা। সঙ্গে রইলেন সুগ্রীব।

সেখানে তখন স্বরলংযন্ত্রযোগে তাল ধরেছে বরনারীরা। মধুর পদঝংকারে নৃত্য শুরু করেছে নৃত্যপটীয়সী বরনারীরা। বহুদিন পর আবার সুরের সোচ্চার প্রাচুর্যে মুখর হয়ে উঠেছে শোকস্তব্ধ প্রাসাদপুরী।

সংগীতের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে এবং বরনারীরা একে একে বিদায় নিলে সুগ্রীব নিজের হাতে একপাত্র মৈরেয় মধু এগিয়ে দিলেন তারার দিকে।

নিজের হাতে তা গ্রহণ করলেন তারা। কিন্তু তা পান করলেন না। এ মধু পান করার অর্থ জানতেন তারা। ইক্ষু ও ধান্যরস দিয়ে তৈরি সবচেয়ে কামোদ্দীপক এই মধু পান করার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গারমত্ত হয়ে ওঠে সমস্ত নরনারী।

তবু সুগ্রীবের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই মধু পান করতে যাচ্ছিলেন তারা।

কিন্তু মুখের কাছে পাত্রটি নিয়ে যেতেই চমকে উঠলেন তারা তার মধ্যে কি দেখে। রজতশুভ্র পানপাত্রের মধ্যে শুধু শ্বেতবর্ণের মৈরেয় মধুর বুদ্বুদ ভাসে। আর তো কিছুই নেই তার মধ্যে। কিন্তু তারার মনে হলো, শুভ্রধবল এক বিরাট লোমশ দেহ রয়েছে সে পাত্রের মধ্যে। সে দেহ বালির।

যতই পাত্রটি মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে আসতে লাগলেন ততই মনে হলো ভ্রূকুটি কুটিল সে দেহ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সহসা মনে পড়লো মৈরেয় মধুর নাম শুনলে জ্বলে যেতেন বালি।

ভয়ে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তারা।

তারার জ্ঞান ফিরে এলে তারাকে ধরে-ধরে বালির অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজস্ব কক্ষে শুইয়ে দিয়ে এলেন সুগ্রীব। তারা একা থাকতে পারবেন না। তাই কুমার অঙ্গদকে তাঁর কোলে দেওয়া হলো।

পরদিন যথারীতি সুগ্রীবের পাশে সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন তারা। এমন সময় সহসা পদভরে সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যা নগরীকে কম্পিত করে বালি এসে উপস্থিত হলেন।

এক বিপুল বিপন্ন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল সকলে।

সিংহাসন হতে উঠে দাঁড়ালেন তারা। সুগ্রীব উঠে গিয়ে বালির পাদস্পর্শ করে প্রণাম করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড পদাঘাতে সুগ্রীবকে ভূলুণ্ঠিত করে দিলেন বালি।

অমাত্যদের কাছে অভিযোগ করলেন বালি, সুগ্রীবকে আমি গহ্বর মুখে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পর ও চলে এসে অন্যায়ভাবে আমার রাজ্য ও স্ত্রীকে অধিকার করেছে। এই ভোগের জন্যই সে আমাকে বিপদের মুখে একা ফেলে রেখে চলে আসে। সুগ্রীব বললেন, আমি একটি বছর নীরবে প্রতীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু গহ্বরের মুখ হতে রক্তধারা নির্গত হতে দেখেই ফিরে এলাম।

বালি বললেন, মূর্খ, সে রক্ত আমার শত্রুর। কিন্তু আসবার সময় সেই গহ্বর মুখটিকে প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করে এসেছিলে কেন? পরে আমি আর আসতে না পারি এই জন্যই নয় কি?

সুগ্রীব বললেন, শত্রু যাতে পুনরায় আমাদের নগরী আক্রমণ করতে না পারে এই জন্যই মহারাজ।

তারা ও অমাত্যগণ বালিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

সকলে বললেন, এক মিথ্যা অনুমানের বশবর্তী হয়েই সুগ্রীব একাজ করেছেন। এতে ও'র অন্যায় নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না। তাছাড়া অন্যায় যদি করেই থাকেন আপনি ও'কে ক্ষমা করুন।

কিন্তু সুগ্রীবকে রাজ্য হতে চিরদিনের মতো নির্বাসিত করলেন বালি। কারো কোনো কথা শুনলেন না।

বালিকে দেখে মৃতবক্ষে প্রাণ পেয়েছিলেন তারা। কিন্তু আবার নিষ্প্রাণ হয়ে পড়লেন।

গুরুজনদের প্রণাম করে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিলেন সুগ্রীব।

আবার অন্তরে অন্তরে ভেঙে পড়লেন তারা। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত

প্রেমসত্তার দুটি পাখির মধ্যে একটি হারিয়ে গিয়েছিল। সে পাখিটি ফিরে আসতেই আবার আর একটি পাখি উড়ে গেল।

কোনোদিন শান্তি পেলেন না তারা। তাঁর সত্তার এই অপূর্ণতা আর কোনোদিন দূরীভূত হলো না। এমনি করে চিরদিন তাঁর সত্তা রয়ে গেল অপূর্ণ। মন রয়ে গেল ভগ্ন। জীবন হয়ে রইল খণ্ড।

যে বালির জন্য প্রায় দুটি বছর ধরে মরমে মরেছিলেন তারা সেই বালিকে পেয়েও উৎফুল্ল হতে পারলেন না আজ। হতে পারতেন আজ যদি সুগ্রীব কাছে থাকতেন তাঁর।

এমনি করে বহুদিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন সুগ্রীব নগরপ্রান্তে এসে যুদ্ধ ভিক্ষা করলেন বালির কাছে!

তারা বালিকে বললেন, সন্ধি করো সুগ্রীবের সঙ্গে। পুরনো বিরোধ মিটিয়ে ফেলো। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড হুংকারে স্তব্ধ হলো সে অনুরোধ।

যুদ্ধে সুগ্রীবকে পরাজিত করে ফিরে এলেন বালি।

কিন্তু পরদিন আবার বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন সুগ্রীব। বুদ্ধিমতী তারা বালিকে বললেন, নিশ্চয় সুগ্রীব শক্তি সংগ্রহ করে এসেছে; তাকে অবহেলা করো না। তার সঙ্গে সন্ধি করো; শান্তিস্থাপন করো।

কিন্তু সেকথা না শুনে আবার রণহুংকার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বালি। তারাও পিছু পিছু গিয়ে দূর হতে সে যুদ্ধ দর্শন করতে লাগলেন।

যুদ্ধকালে দুই ভাইকে দেখতে একই রকমের মনে হচ্ছিল। এক জীবন-মরণ সংগ্রামে ভয়ংকরভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে যেন একই বৃন্তে ফোটা দুটি ফুল।

বুকের ভিতরটা কাঁপছিল তারার। তিনি অনুভব করছিলেন, তাঁর বুকের ভিতরে যেন দুটি পাখি প্রবলভাবে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এক রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে মেতে উঠছে।

নিজের শক্তিতে বালিকে পরাজিত করতে পারতেন না সুগ্রীব। সহসা একটি তীর এসে বিঁধল বালির বুকে। সে তীর রামচন্দ্রের। রামচন্দ্র অন্যায়ভাবে হত্যা করলেন বালিকে।

মনে হলো একটি বিরাট পাহাড় যেন ভেঙে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল সমস্ত পৃথিবী। যে পৃথিবী ও তার সহস্র পার্থিবতাকে সারা জীবন আঁকড়ে ধরেছিলেন বালি, আজ সে পৃথিবীকে অকালে ছেড়ে যেতে হলো বালিকে।

সে পৃথিবীর আনন্দ হতে চিরতরে বঞ্চিত হলেন তারা। বালির চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। সুগ্রীব তাঁকে হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, তাহলে আমিও এ প্রাণ রাখব না।

সুগ্রীবের মুখ চেয়েই ভগ্ন প্রাণে ভগ্ন মনে চিতা থেকে ধীরে ধীরে উঠে এলেন তারা।

তখন সবেমাত্র বর্ষা পড়েছে। মেঘমেদুরিত ধূসর আকাশের তলে স্নিগ্ধসবুজ-পরিসর তৃণসমাচ্ছন্ন গোদাবরী তটে গিয়ে দুজনে বসলেন। দূরে বালির প্রধূমিত চিতাবহ্নির পানে একবার তাকিয়ে তারা বললেন, আজ হতে তুমি অসিধার ব্রত করতে পারবে সুগ্রীব?

বিমূঢ়ের মতো তারার মুখপানে একবার শুধু চাইলেন সুগ্রীব। তারা বললেন, অসির মতো ক্ষুরধার এই ব্রত। জীবনে তোমার সবচেয়ে যে আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়বস্তু তার প্রতি সবচেয়ে নির্লিপ্ত থাকতে হবে তোমায়। আমার শত কাছে থেকেও তুমি থাকবে আমা হতে সবচেয়ে দূরে।

সহসা জলদগম্ভীর আকাশের মতো মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল সুগ্রীবের। কোনো কথা না বলে সেখান হতে নিঃশব্দে উঠে গেলেন সুগ্রীব। দূর দিগন্তপটে অংকিত নিরন্ধ্রনীলিম অরণ্যবলয়ে বলয়িত নীল নীরদমালাসদৃশ শৈলশ্রেণীর পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তারা। দূরে বালির চিতা তখনো বহ্নিমান। তাঁর মনে হলো এই চিতায় তাঁরও দেহত্যাগ করা উচিত ছিল।

দেখতে দেখতে বাষ্পায়িত হয়ে উঠল তারার শোকসন্তপ্ত চক্ষুদুটি।

লক্ষ্মণ ও উর্মিলা



সখি, নীল আকাশ ভালো না কাঞ্চনবর্ণের রৌদ্র ভালো ? সখি, ঘনশ্যাম মেঘ ভালো না কনকবর্ণাঙ্গী বিদ্যুল্লতা ভালো ? সখি ম্লান ছায়া ভালো, না উজ্জ্বল আলো ভাল ? সখিরা ঊর্মিলার এই সব অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেবে কি, হেসেই আকুল।

মিথিলার রাজদরবারে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যখন চলছিল হরধনু ভঙ্গের পর্ব, তখন প্রাসাদশীর্ষে অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে চলছিল এক অবান্তর তর্কের উচ্ছ্বসিত তুফান। সেখানে বইছিল তখন লঘু হাস্য-পরিহাসের এক উল্লসিত ঝড়।

হরধনু ভঙ্গ করবার পূর্বেই রামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি সীতা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং হরধনু ভঙ্গের পর রাজা জনক স্থির করেছেন, সীতাকে রামের হাতে এবং ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হাতে সমর্পণ করবেন। এ কথা জানতে পারার পর থেকে অন্যান্য সখিদের সাহায্যে সীতাকে পরিহাসের মধ্য দিয়ে রাগাবার চেষ্টা করছিলেন ঊর্মিলা। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এই যে, রাম শ্যামবর্ণ, লক্ষ্মণ গৌরবর্ণ। তাঁরা বলতে চান শক্তিতে রাম শ্রেষ্ঠ হলেও রূপের দিক থেকে লক্ষ্মণই শ্রেষ্ঠ।

ঊর্মিলার কথায় সখিরা কিছুক্ষণ পর হেসে বলল, সখি তুমি যাই বলো, এই পৃথিবীতে যা কিছু শ্যামল তাই শীতল আর স্নিগ্ধ। অংগে রাখলে অংগ জুড়িয়ে যায়। প্রাণ শীতল হয়।

ঊর্মিলাও হাসিমুখে বললেন, তোমরাও ভুলে যেও না সখি, জগতে যা কিছু স্বর্ণিল, তা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। মন ভরে ওঠে।

সীতার একজন সহচরী ছিল। সে বলল, কিন্তু বৃক্ষছায়া শ্যামল ; তবু কাঞ্চন-বর্ণের রৌদ্রে তপ্ত হয়ে সেই ছায়াকেই আশ্রয় কর কেন সখি ? বিদ্যুল্লেখা সোনার বরণ হলেও পৃথিবী কেন মেঘকে চায় সখি ?

অন্য একজন সখি বললেন, তা ছাড়া যা কিছু সোনার বরণ তার তাপ বড় বেশি সখি, হয়ত সেটা অহংকার। তা অংগে রাখলে বড় জ্বালা ধরে। কালোর মন ভালো। ঊর্মিলাও তাতে দমলেন না। বললেন, তা যদি হবে অংগে তবে ভূষণ পর কেন সখি ? এবার সোনার ভূষণ না পরে শ্যামল বৃক্ষপত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করে রাখবে সে অংগ। সোনার বরণে যদি তাপ থাকে তো সে তাপে তপ্ত করে নিতে চাই আমার দেহমন। মনে রেখো তাপই জীবন। শীতলতা যত ভালোই হোক তা মৃত্যু ও জড়তার প্রতীক।

এর পরও বলার কথা হয়ত ছিল অনেক সখিদের। এর পরও হয়ত চলত পরিহাস-বিহসিত বিতর্কের লীলালহরী।

কিন্তু তা আর হলো না। রাজা জনক নিয়ে গেলেন কন্যাদের। শুভ পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তাঁদের।

সম্প্রদানকার্যের পর শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠান কালে কুণ্ঠিত অপাঙ্গে লক্ষ্মণ যখন

ঊর্মিলার পানে চাইলেন, তখন কেমন যেন সহসা সংকুচিত হয়ে উঠল কোমলাঙ্গী ঊর্মিলার দেহলতা। তখন তাঁর মনে হলো লক্ষ্মণের দৃষ্টির মধ্যে কোথায় আছে যেন এক আগ্নেয় অহংকারের উত্তাপ। শুভ বিবাহের মংগলচূর্ণরঞ্জিত সূত্রে শোভিত হাতখানি ঊর্মিলা যখন লক্ষ্মণের বিবাহসূত্রসংবন্ধ হাতখানিকে সর্বপ্রথম ধারণ করলেন, তখন তাঁর মনে হলো, লক্ষ্মণের গৌরবর্ণ দেহটি সত্যিই যেন একটু তপ্ত।

তারপর বাসর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। পূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ দ্বারা পরিশোভিত হয়েছে সে ঘরের দ্বারদেশ। বিচিত্র কুসুমরাশি ও মংগলসূচক আলিম্পনাদি দ্বারা সজ্জিত হয়েছে তার অন্তঃপুর। ভূমিতলে স্থণ্ডিলে শয্যা বিরচিত হয়েছে বর-বধূর জন্য।

বাসর ঘরে ঊর্মিলার একবার ইচ্ছা হলো লক্ষ্মণের দেহগাত্রে হাত দিয়ে ভালো করে দেখেন, সত্য সত্যই লক্ষ্মণের সোনার মতো উজ্জ্বল দেহটা তপ্ত কিনা। কিন্তু স্পর্শ করতে পারলেন না বিধি-নিষেধের জন্য। স্পর্শ করলেন ফুলশয্যার রাত্রিতে নব-পরিণয়লজ্জাজনিত সমস্ত সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সে রাত্রিতে ঊর্মিলা হাত দিয়ে লক্ষ্মণের দেহটাকে বারবার স্পর্শ করে কি যেন পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

লক্ষ্মণের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলেন ঊর্মিলা, মুখে কিছু না বললেও মনে মনে রুষ্ট হয়ে উঠেছেন লক্ষ্মণ। এরই মধ্যে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছেন ঊর্মিলা, স্বভাবতঃ লক্ষ্মণ একটু গম্ভীর প্রকৃতির। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছেন, সমস্ত রাজকুমারদের মধ্যে লক্ষ্মণই সবচেয়ে মিতভাষী, তেজস্বী এবং স্পষ্টবাদী।

লক্ষ্মণের গায়ে হাত দিয়ে ঊর্মিলা অনুভব করলেন, লক্ষ্মণের দেহটা যেন আর পাঁচজনের দেহ হতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। মনে মনে ভয় হলো ঊর্মিলার, তবে কি সখিদের কথাই ঠিক। আপন বর্ণোজ্জ্বল দেহসৌন্দর্যের অহমিকাজনিত এক উষ্ণতা সকল সময়ের জন্য ছড়িয়ে আছে তাঁর সারা অংগে। সে অংগ বড় জ্বালাময়।

ঊর্মিলা ভাবলেন, আবার এমনও হতে পারে, অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ লক্ষ্মণ এবং তাঁর মনের সেই অসাধারণ তেজস্বিতাই তাপ হয়ে ফুটে উঠেছে তাঁর দেহে।

ঊর্মিলা আরও ভাবতে থাকেন, এ জগতে যা কিছু যত বিশুদ্ধ যা কিছু যত খাঁটি তাই হয়তো তত তপ্ত। আপন অন্তর্নিহিত প্রদাহ ও প্রকৃতিসিদ্ধ শুচিতার দ্বারা সব কিছুকে দগ্ধ ও শুচি করে তোলে বলেই অগ্নিতে হয়ত এত জ্বালা। সমস্ত পাপগর্ভ অন্ধকারকে বিদূরিত করে বলেই হয়তো সূর্যকিরণে এত তাপ। জ্বলন্ত বলেই অগ্নি কখনো মলিনতা প্রাপ্ত হয় না। তপ্ত বলেই ম্লান হয় না সূর্যকিরণ।

অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন ঊর্মিলা।

তবু একটা গোপন দুঃখ দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠতে লাগল ঊর্মিলার মনে। লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে হেসে বা আদর করে কোনো প্রণয়ালাপ করেন না কোনোদিন। কোনোদিন সে দুঃখ ভুলেও কারো কাছে প্রকাশ করেন না ঊর্মিলা।

অন্যান্য সব ভাইদের থেকে লক্ষ্মণই সবচেয়ে রামের অনুগত। রামের কাছে কাছেই

সারাদিন থাকেন লক্ষ্মণ। তারপর রাত্রিতে অন্তঃপুরের শয়নগৃহে এসে গম্ভীরভাবে শুয়ে পড়েন। বিশেষ কোনো কথাই বলেন না ঊর্মিলার সঙ্গে। লক্ষ্মণ অতিশয় স্বল্পবাক বলেই হয়তো তাঁর মুখ থেকে অনেক কথা শুনতে ইচ্ছা হয় ঊর্মিলার। কিন্তু প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে কোনো কথা বলেন না লক্ষ্মণ।

রামও তো সারাদিন একরকম বাইরে থাকেন। তবু অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা বলেন সীতাকে। অনেক প্রেম ও প্রয়োজনের কথা। সোহাগসিক্ত কতো প্রেমালাপের ফুল ঝরে পড়ে যেন রামের মুখ হতে আর সেই ফুলের সুরভিত নির্যাসে বড় মধুর হয়ে ওঠে তাঁদের নৈশনিবিড় সাহচর্যের মুহূর্তগুলি। সে সব কথা পরদিন ঊর্মিলাকে খুলে বলেন সীতা গল্পের ছলে।

কিন্তু লক্ষ্মণের মুখ থেকে কোনো কথার ফুল ঝরে না বলে ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁদের শয়নপর্যঙ্কের উপর ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত সমস্ত ফুলের সুবাস। এক অব্যক্ত ব্যথার হাহাকারে ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁদের নৈশমিলন।

যে রাম জগতের মধ্যে একমাত্র আদর্শ পুরুষ লক্ষ্মণের কাছে, সেই রামের কাছেই তো পত্নীপ্রেম কাকে বলে তা শিখতে পারেন লক্ষ্মণ। কিন্তু একথা কে বলবে তাঁকে? ঊর্মিলা তো প্রাণ গেলেও বলতে পারেন না সেকথা।

সীতা ও অন্যান্য বধূরা ঊর্মিলাকে বলেন, তুই বড় চাপা। আমরা আমাদের সব কথা বলি। তুই কিন্তু তোদের কোনো কথাই বলিস না।

ঊর্মিলা হাসিমুখে বলেন, আমরা খুব সুখে আছি। আমাদের দুজনে খুব মিল। এছাড়া কি কথা বলব?

একথায় তবু সন্তুষ্ট হন না তাঁরা। তাঁরা বলেন, আমাদের মনে হয় তোর স্বামী সবচেয়ে সুন্দর। তাই বোধহয় তুই গর্ব অনুভব করিস মনে মনে।

ঊর্মিলা তেমনি হাসিমুখে কৃত্রিম কপট এক কলহের সুরে বলেন, হ্যাঁ, করি তো। গর্বের বস্তু থাকলেই মানুষ গর্ব করে। আমি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা কোনোদিন কারো কাছে বলব না। এসব গোপন কথা হৃদয়ের নিভৃতে অতি যত্নে রেখে দিতে হয়। কানে কানে ছড়িয়ে দিতে নেই।

এমনি করে কৌশলে এড়িয়ে যান ঊর্মিলা। কেউ জানতে পারে না তাঁর মনের গোপন কথা। কেউ জানতে পারে না, ঊর্মিলা তাঁর স্মিতমুখের অন্তরালে কত বড় এক অশ্রুমতী বিষাদকে গোপনে পোষণ করে চলেছেন তাঁর অন্তরে। আপাতদৃষ্ট প্রশান্তির অন্তরালে চিত্তের কতো বড় একটা সংক্ষোভ ঢেকে রেখেছেন সকলের অলক্ষ্যে।

তবে কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্মণের চরিত্রের মধ্যে একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করলেন ঊর্মিলা। জীবনে সমস্ত গুণের মধ্যে একমাত্র কর্তব্যবোধকেই সবচেয়ে বড় বলে মেনে চলেন লক্ষ্মণ। জীবনের প্রতি পদে প্রতিটি কার্যকে এক তীক্ষ্ম কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে চলেন তিনি।

মাঝে মাঝে এক একদিন রাত্রিতে শুতে এসে লক্ষ্মণ শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করেন ঊর্মিলাকে, তোমার কোনো অসুবিধা হলে বলবে, কোনোরূপ লজ্জা বা সংকোচ করবে না। আমি সাধ্যমত সে অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করব।

কথাটা শুনে অসম্ভব রকমের আনন্দ হয় ঊর্মিলার। আনন্দাশ্রুর এক প্রবল বেগকে কোনোমতে সংবরণ করে বলেন, না তো, কোনো অসুবিধা হয়নি আমার। আমি খুব সুখে আছি। আপনি কোনোরূপ উদ্বিগ্ন হবেন না আমার জন্য।

ঊর্মিলা আরও বলেন, অসুবিধা হবে কেন, আমি আপনাকে আমার থেকে পৃথক রূপে দেখি না। আপনার পিতামাতা আমার পিতামাতা। আপনার ঘর আমার ঘর। আপনার আত্মীয়-স্বজন আমারও আত্মীয়-স্বজন। আমি তো সুখেই আছি আর্য।

স্বামী হিসাবে ঊর্মিলার প্রতি তাঁর যে কর্তব্য সে কর্তব্য হতে তিনি যাতে কোনো-রূপ বিচ্যুত না হন, এই কারণেই মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন লক্ষ্মণ।

সকলের প্রতি তাঁর কর্তব্যকে সমানভাবে মেনে চলেন লক্ষ্মণ। তবু ঊর্মিলার মনে হয় তাঁর এই কর্তব্যপালন বড় নীরস এবং কৃত্রিম। মনে হয়, সকলের প্রতি শুধু এক নীরস কর্তব্যবোধ আছে লক্ষ্মণের অন্তরে; কিন্তু সহজ সরল কোনো হৃদয়ানুভূতি নেই কারো প্রতি।

কখনো বিশেষ কোনো আবেগ বা অনুভূতির বশবর্তী হওয়া লক্ষ্মণের স্বভাব নয়। সহসা কোনো তুচ্ছ কারণে ক্রুদ্ধ হন না লক্ষ্মণ। কিন্তু একবার ক্রুদ্ধ হলে সে ক্রোধ হয়ে ওঠে বড় ভীষণ। সে ক্রোধ কোনোদিন দেখেন নি ঊর্মিলা। একদিন দেখলেন। লক্ষ্মণের সে অগ্নিমূর্তি দেখে ভীত হয়ে উঠলেন ঊর্মিলা। রাজা দশরথের আদেশে মহামুনি বশিষ্ঠ যখন অথর্ববেদমতে রামের রাজ্যাভিষেক কার্য সম্পন্নে ব্যস্ত এবং সেই পবিত্র অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে উঠেছে অযোধ্যানগরী, তখন সহসা এক বিষম কাণ্ড ঘটল রাজঅন্তঃপুরে। সহসা পূর্ব প্রতিশ্রুত দুটি ভীষণ বর চেয়ে নিলেন কৈকেয়ী রাজা দশরথের কাছ থেকে। এক বরে রামের পরিবর্তে ভরত হবে রাজা। অন্য বরে রামকে বনবাসে যেতে হবে চতুর্দশ বৎসরের জন্য। বিপুল বেদনাভারে আচ্ছন্ন ও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন রাজা দশরথ। বাক্যস্ফূর্তি ঘটল না তাঁর অনুরুদ্ধ কণ্ঠে। দশরথ নিজে কোনো কথা বলতে না পারলেও সেই দুটি বরের অন্তর্নিহিত দুটি ভীষণ সত্যকে পিতৃসত্য হিসাবে মেনে নিলেন রাম।

রাম মানলেও লক্ষ্মণ কিন্তু তা মানলেন না। অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন ক্রোধে। বললেন, স্ত্রৈণ রাজা নারীর কুমন্ত্রণাবশে বিভ্রান্ত হয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁকে বন্দী করে স্থানান্তরে রেখে আসব। ভরত তার মামার বাড়ী হতে এসে যদি বিরোধিতা করে তো তাকে বধ করব। রাজ্যে কোনো বিদ্রোহ ঘটলে কঠোর হস্তে তা দমন করব। তবু এ অন্যায়কে মেনে নেব না।

এক ভয়ংকর অমংগলের আশংকায় ভীত হয়ে উঠলেন ঊর্মিলা। কাঁদতে কাঁদতে আকুল

হয়ে ছুটে গেলেন সুমিত্রার কাছে। বললেন, আপনার সন্তানকে শান্ত করুন মাতা ঠাকুরাণী। তীব্র আশংকায় বুক আমার কেঁপে উঠছে। ভয় হচ্ছে কখন কি অঘটন ঘটিয়ে বসেন।

অবশেষে রাম শান্ত করলেন লক্ষ্মণকে।

লক্ষ্মণ বললেন, যাবে যদি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাম বাধা দিলেন। লক্ষ্মণ কিছুতেই তা শুনলেন না।

কথাটা শুনে বুকখানা শুধু একবার প্রবলভাবে কেঁপে উঠল ঊর্মিলার। কিন্তু জোর করে সে বুকের সমস্ত কম্পনকে স্তব্ধ করে ঊর্মিলা বললেন, উনি তাই যান। রাজ্যে থাকলে অনর্থ ঘটতে পারে ভরত আসার সঙ্গে সঙ্গে।

ঊর্মিলা জানতেন, লক্ষ্মণ এক সময় ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আসলে ভরতেরই চক্রান্ত। নিজে অনুপস্থিত থেকে মাকে দিয়ে কৌশলে এই হীন কার্য করেছে ভরত।

সীতা ও লক্ষ্মণ প্রস্তুত হলেন রামের সঙ্গে যাবার জন্য।

সকলে একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল লক্ষ্মণ ও সীতার। সকলে বলল, তাদের এই ত্যাগের আদর্শ সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু একবার ঊর্মিলার কথাটা ভাবল না কেউ।

কেউ একবার ভেবে দেখল না, আজ সবচেয়ে বড় ত্যাগ করতে চলেছেন ঊর্মিলা। তাদের বোঝা উচিত, রাম হচ্ছেন সীতা ও লক্ষ্মণ দুজনেরই সবচেয়ে প্রিয়বস্তু। জীবনে সবচেয়ে প্রিয়বস্তুর সঙ্গ লাভ হচ্ছে পরম এবং সবচেয়ে বৃহৎ পাওয়া। সামান্য পার্থিব আরাম উপভোগের বস্তুত্যাগ তো তুচ্ছ কথা, সেই পরম পাওয়ার কাছে কোনো ত্যাগই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু জীবনের সবচেয়ে প্রিয়বস্তুকে ত্যাগ করে তার বিনিময়ে কি পাবেন ঊর্মিলা? শুধু এক অশরীরী স্মৃতি আর বিমূর্ত চিন্তাকে ঝরা ফুলের বিলীয়মান সুরভির মতো বাঁচিয়ে রাখতে হবে অন্তরে। জীবনে চারিদিকের নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে একটি আশার প্রদীপকে সযত্নে জ্বালিয়ে রাখতে হবে সুদীর্ঘ যুগ ধরে। এক সূক্ষ্ম সুরমূর্ছনা দিয়ে ভরে তুলতে হবে ভগ্ন বুকের সমস্ত শূন্যতাকে।

কেউ কেউ ঊর্মিলাকে পরামর্শ দিলে লক্ষ্মণের সঙ্গে যাবার জন্য। সর্বত্র স্বামীর সহগমন করাই সতী নারীর কর্তব্য।

দৃঢ়তার সঙ্গে ঊর্মিলা বললেন, আপনারা ভুল করছেন। আমার স্বামী বনগমন করছেন কোনো এক বৃহত্তর কর্তব্য পালনের জন্য। সেখানে তিনি তাপসের বেশে ব্রহ্মচর্য সাধন করবেন। সেখানে আমি কাছে থাকলে তাঁর কর্তব্যপালনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নেবার এই অনুরোধ আমি তাঁকে করতে পারব না। স্বামীর বৃহত্তর কর্তব্য সাধনের পথে প্রকারান্তরে অন্তরায় সৃষ্টি করা কোনো স্ত্রীরই কর্তব্য হতে পারে না কখনো। তার চেয়ে আমি এখানে থেকেই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করব তাঁর নিরাপত্তার জন্য। কবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অক্ষত দেহে ফিরে

আসবেন দিন গণনা করব তার জন্য। এইভাবে দূরে থেকে সাহায্য করব তাঁকে।
আর কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন উর্মিলা। তিনি কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ একা থাকতে চাইলেন। একা একা কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করে হালকা করে তুলতে চাইলেন তাঁর ব্যথা-ভারটাকে।
কিন্তু যা মনে করেছিলেন তা হলো না।
সহসা লক্ষ্মণ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। যাবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন বলেই হয়তো তিনি এলেন। লক্ষ্মণ এসেছেন নিছক কর্তব্যের খাতিরে, তাঁর প্রতি কোনো ভালবাসাবশতঃ নয়। একথা ভেবে মনে কিছুটা কষ্ট পেলেন উর্মিলা। কিন্তু সে মনোকষ্টের বিন্দুমাত্র বাইরে প্রকাশ করলেন না। বরং হাসিমুখে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।
লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকে উর্মিলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। উর্মিলাই প্রথমে কথা বললেন, আমি সব জেনেছি। আমিও বলছি, আপনার যাওয়াই কর্তব্য। আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাইব না, কারণ তাহলে আপনার বৃহত্তর কর্তব্য পালনের পথে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।
চোখে জল আসছিল উর্মিলার। কিন্তু অতিকষ্টে সে অশ্রুর বেগ সংবরণ করলেন। উর্মিলা বললেন, আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। আপনার মতো কর্তব্যপরায়ণ ও আদর্শ স্বামী পেয়েছি এজন্য গর্ব অনুভব করছি আমি।
অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন উর্মিলা। লক্ষ্মণ তবু কোনো কথা বললেন না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে।
প্রাসাদের বাইরের দিকের একটি মুক্ত বাতায়নের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন উর্মিলা। তারপর বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন দূরে। উর্মিলা ভাবলেন, এখানে থাকাকালে বিশেষ কোনো কথা বলতেন না লক্ষ্মণ। তবু রোজ একবার করে তাঁর দেখা পেতেন। তাঁর রুক্ষ কঠিন মনের নিষিদ্ধ প্রান্তরে কোনোদিন প্রবেশাধিকার পান নি তিনি। তবু রোজ একবার করে তাঁর সোনার অংগকে স্পর্শ করতে পেতেন। কিন্তু আর তা পাবেন না। চোদ্দটি বছর দেখা হবে না তাঁর সঙ্গে। লক্ষ্মণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেই চোখে জল আসছিল। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উর্মিলা।
বাইরে বেলা প্রথম প্রহরের স্বর্ণাভ রোদ শ্বেতাভ হয়ে ওঠে নি তখনো। এক কোমল স্নিগ্ধতা অপসারিত হয় নি তখনো শান্ত হাওয়ার বুক হতে।
সহসা উর্মিলাকে একবার কাছে ডাকলেন লক্ষ্মণ, শোন।
চমকে উঠলেন উর্মিলা। কাছে সরে এলেন লক্ষ্মণের। মুখপানে চোখ দুটো তুলে তাকালেন।
লক্ষ্মণ বললেন, আমার কেবলি ভয় হচ্ছে উর্মিলা, আমি যেন একটা কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আর একটি কর্তব্যে অবহেলা করছি। আমি অনেক দিনের জন্য অনেক

দূরে চলে যাচ্ছি তোমার কাছ হতে, এতে তুমি নিশ্চয়ই অনেক মনোকষ্ট পাবে। তোমায় না জানিয়ে আমার এ সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হয়তো উচিত হয় নি। হয়তো আমি তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে ফেলেছি।

দৃঢ়কণ্ঠে উর্মিলা বললেন, না আর্য, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলছি আপনি যান। জন্মের পর হতে যাঁর পাশে থেকে যাঁর সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে এসেছেন, যিনি আপন অংগের মতো ভালবাসেন আপনাকে, তাঁকে একা বনে ছেড়ে দেওয়া কখনই উচিত হবে না আপনার পক্ষে।

তাছাড়া আমার কোনো কষ্টই হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনারা অক্ষত দেহে আবার ফিরে আসবেন। আমি ব্রত পালন করব আপনার জন্য।

উর্মিলাকে বুকের কাছে টেনে গভীরভাবে আলিংগন করলেন লক্ষ্মণ।

অবাধ্য অশ্রুর যে দুরন্ত বেগকে এতক্ষণ অতিকষ্টে দমন করে রেখেছিলেন উর্মিলা, এবার তা আর পারলেন না। অবুঝ শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন উর্মিলা। চোখের জল মুছে বললেন, কে বললে আপনি দূরে যাবেন। সোনার আলো হয়ে আপনি ভেসে বেড়াবেন আমার অন্তরের নির্জন আকাশে। মাঝে মাঝে বিরহের বিষাদগম্ভীর বিপুল মেঘান্ধকার সে আকাশকে ঢেকে দিলেও স্বর্ণস্মৃতিরেখা বিদ্যুল্লেখার মতো বিদীর্ণ করে দেবে সে অন্ধকারকে। আপনার সোনার অংগ আমার অংগের ভূষণ হয়ে জড়িয়ে থাকবে আমার অংগকে। আপনি হয়তো জানেন না, জগতে যা কিছু স্বর্ণিল যা কিছু আলোময় যা কিছু উজ্জ্বল তারই মধ্যে আপনি ছড়িয়ে আছেন অপরূপভাবে। আপনাকে কেউ কখনো ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না আমার কাছ থেকে।

চোখের সমস্ত জল মুছে হাসিমুখে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন উর্মিলা।

লক্ষ্মণের যাওয়ার পর দিনে দিনে মনকে শক্ত করে তুলতে লাগলেন উর্মিলা। তবু মাঝে মাঝে এক একবার মনে হতে লাগল, সব কথা বলা হয় নি লক্ষ্মণকে। তাঁকে যা বলেছেন, তা হচ্ছে মনগড়া সাজানো কথা। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের যা কিছু গূঢ় অভিব্যক্তি এখনো তার কিছুই বলা হয় নি। যদি এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে দুজনের কারো মৃত্যু হয় তাহলে সে কথা আর কোনোদিন বলা হবে না।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিজে বোঝালেন উর্মিলা। এ জগতে প্রকাশিত বস্তুর মতো যা কিছু প্রচ্ছন্ন তাও সমান সত্য। যে নক্ষত্রের আলো আজও চুম্বন করতে পায়নি পৃথিবীকে, যে ফুল বৃক্ষের গর্ভ হতে বেরিয়ে এসে সূর্যকে দেখতে পায় নি আজও, যে নদী তার ক্লান্ত কামনার অজস্র ঢেউ নিয়ে ঢলে পড়তে পারে নি আজও সমুদ্রের বুকে, তারা কেউ মিথ্যা নয়। তাঁর অন্তরের গূঢ় গোপন কথাগুলিও মিথ্যা হতে

পারে না কিছুতেই। তাদের অদৃশ্য বেগ বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে একদিন না একদিন স্পর্শ করবে লক্ষ্মণের মনের অণু পরমাণুগুলিকে।

এতদিন একরকম বেশই ছিলেন ঊর্মিলা। শুধু দশরথের মৃত্যু, ভরতের প্রত্যাগমন, ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্তৃক মন্থরাকে ভর্ৎসনা প্রভৃতি কতকগুলি ঘটনার দ্বারা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তাঁর মনটা।

সহসা একদিন একটা কথা শুনে মনটা আবার প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল ঊর্মিলার। শুনলেন ভরত স্থির করেছেন সকলে মিলে বনে গিয়ে রামকে ফিরিয়ে এনে তাঁরই হাতে রাজ্যভার ফিরিয়ে দেবেন। ভরত কিছুতেই রাজা হবেন না। আরও শুনলেন, ভরত একা যাবেন না, রাজমহিষীরাও সকলে সঙ্গে যাবেন।

ঊর্মিলার যাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শূন্য রাজঅন্তঃপুরে একা থাকতে পারেন না তিনি। বাধ্য হয়েই যেতে হবে তাঁকে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, গিয়ে কোনো ফল হবে না। পিতৃসত্য পালনের যে ব্রত গ্রহণ করেছেন রাম, অকালে সে ব্রত কিছুতেই ত্যাগ করবেন না তিনি।

লক্ষ্মণকে দেখে নিজের মনকে সংযত রেখেছিলেন ঊর্মিলা। কিন্তু বনে গিয়ে দেখা হতেই মন আবার ভীষণ ভাবে বিচলিত হয়ে পড়বে তাঁর। শূন্য ও ভগ্ন মনে ফিরে আসতে তীব্র বেদনার আঘাতে শিথিল হয়ে উঠবে তাঁর সংযমসংবন্ধ গ্রন্থিগুলো।

পথে যেতে কিন্তু বেশ লাগছিল ঊর্মিলার। সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে রাজ্যের বহু প্রজাও সঙ্গে আসছে। ক্ষীণ আশা জাগল তাঁর মনে। ভাবলেন এতোজনের সম্মিলিত অনুরোধ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করবেন না রাম। হয়তো তিনি ফিরে আসবেন। আশা-নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্বে মথিত হতে লাগল ঊর্মিলার মন।

তবু পথে যেতে যেতে পথের দুপাশের সব কিছুকে বড় মধুর মনে হচ্ছিল তাঁর। এই পথ দিয়েই দুদিন আগে হেঁটে গেছেন তাঁর বহুবাঞ্ছিত প্রিয়বল্লভ। এ পথের ধূলিকণা আজও ধারণ করে আছে তাঁদের পবিত্র পদরেণু। এ পথের বাতাসে আছে তাঁদের দেহের অশরীরী স্পর্শ। এ পথের নদীজলের সঙ্গে মিশে আছে তাঁদের দেহ-নিঃসৃত ঘর্ম। রথে করে নয়, ঐ পথে পা দিয়ে হেঁটে যেতে ইচ্ছা হলো ঊর্মিলার। সর্বাঙ্গে মেখে নিতে ইচ্ছা হলো সে পথের ধূলিকণাগুলিকে।

ভরদ্বাজ আশ্রমে এক রাত্রি কাটিয়ে পরদিন গিয়ে পেঁছিলেন সেই অরণ্যে।

রাম সীতার সঙ্গে কুটিরের মধ্যেই ছিলেন। লক্ষ্মণ ছিলেন বাইরে। রাম লক্ষ্মণ দুইজনেরই পরিধানে বল্কল। মাথায় রুক্ষ জটাভার।

রামের থেকে লক্ষ্মণকে অনেক বড় বলে মনে হলো ঊর্মিলার। সন্ন্যাসীর বেশে বনবাসে কাটালেও আসলে একজন ভোগী গৃহীর মতোই দিন যাপন করছেন রাম। গৃহহারা হয়ে এসে নূতন পর্ণগৃহ স্থাপন করেছেন বনে। রাজসিংহাসন ও আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে এসে পেয়েছেন প্রিয়তমা পত্নীর অবিরাম সাহচর্য এবং তাঁর অখণ্ড অন্তরের অন্তহীন ভালবাসা।

প্রায় সব সময় সীতার কাছে কাছেই থাকেন রাম। কখনো পুষ্পিত লতাকুঞ্জে কখনো নদী সরোবরের স্নিগ্ধ জলে দুজনে বিহার করেন মনের উল্লাসে। লক্ষ্মণ আহার সংগ্রহ করে আনেন।

কিন্তু লক্ষ্মণ? তাঁকে সাহচর্য দান করবার কেউ নেই। একা একা বিরস মনে তাঁকে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে হয়। কখনো প্রতিরক্ষায়, কখনো বা আহার সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। তাঁরই সন্ন্যাস বেশ সার্থক। তাঁরই ভ্রাতৃপ্রেম সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ। তাঁর ত্যাগ সত্যিই তুলনাবিহীন।

রাজমাতাদের সঙ্গে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা বললেন লক্ষ্মণ। কিন্তু ঊর্মিলার প্রতি একটি বারের জন্যও মুখ তুলে তাকালেন না।

ঊর্মিলা শুধু বারবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। লক্ষ্মণকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আরও দেখার আগ্রহ উন্মাদ করে তুলল যেন তাঁকে। অবশেষে ঊর্মিলা অতিকষ্টে সংবরণ করলেন নিজেকে।

ঊর্মিলা যা ভেবেছিলেন হলোও ঠিক তাই। রাম প্রত্যাখ্যান করলেন ভরতের অনুরোধ। লক্ষ্মণ তাঁকে সমর্থন করলেন। রামের পাদুকা নিয়ে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলেন ভরত।

রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও গুরুজনদের প্রণাম করলেন। তবু একবার ঊর্মিলাকে কাছে ডেকে একটা কথাও বললেন না। একবার ফিরে তাকালেন না। কোনো নিভৃত বনান্তরালে নিয়ে গিয়ে একবার তাঁকে আলিংগন করলেন না। এমনই নিষ্ঠুর তিনি।

আসবার সময় যেমন আশা-নিরাশা ও আনন্দ বেদনায় মিশ্র অনুভূতির তরংগ দোলায় দুলতে দুলতে এসেছেন ঊর্মিলা, ফিরবার সময় তেমনি শুধু অবিমিশ্র বেদনার আঘাতে নিষ্পেষিত হতে লাগলেন মনে মনে।

রাজপ্রাসাদে ফিরে লক্ষ্মণের নিরাপত্তার জন্য ব্রত পালন করতে লাগলেন ঊর্মিলা। নাম মাত্র অল্পমাত্রায় আহার করতে লাগলেন। যথাসম্ভব সরল ও অনাড়ম্বর করে তুললেন বেশভূষা। স্বর্ণপালংক ছেড়ে ভূমিতলে সামান্য পর্ণশয্যায় শয়ন করতে লাগলেন। তবু অংগের স্বর্ণভূষণ ত্যাগ করলেন না। কারণ ও-ভূষণ লক্ষ্মণের সোনার অংগের প্রতীক।

আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে চোদ্দটি বছর কোন্ দিকে কেটে গেল বুঝতেই পারলেন না ঊর্মিলা। একদিন হিসাব করে দেখলেন চোদ্দ বছর পূর্ণ হতে মাত্র আর কয়েক মাস বাকি আছে।

এই কয়েকটা মাসও হয়তো কোন্ দিকে কেটে যেত। কিন্তু আগেই একটা বড় দুঃসংবাদ শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন ঊর্মিলা। লঙ্কার রাজা রাবণ নাকি সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তাই রাম লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীবের সহায়তায় সমুদ্রের

উপর সেতুবন্ধন করে লংকা আক্রমণ করেছেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে এখনো সেখানে।

এক তীব্র আশংকায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন ঊর্মিলা। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, কোনো চিন্তা নেই, রাবণকে বধ করে সীতাকে ঠিক উদ্ধার করে যথাসময়ে ফিরে আসবেন রাম লক্ষ্মণ। তবু ঊর্মিলার মনে হলো, রাবণের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ হচ্ছে না, এক বিপুলতম বর্বর অন্ধকার গ্রাস করতে চাইছে জগতের সব আলো। তাই মনে হলো যেন সূর্যের মধ্যে কোনো উজ্জ্বলতা নেই ; অগ্নির মধ্যে কোনো তাপ নেই ; বিদ্যুতের মধ্যে অন্ধকারবিদীর্ণকারী কোনো ক্ষমতা নেই। অংগের স্বর্ণভূষণ ম্লান মনে হতে লাগল ঊর্মিলার।

অবশেষে একদিন সত্যসত্যই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ঊর্মিলা। সুদূর লংকা হতে দূত এলো সুসংবাদ নিয়ে। আগামীকালই রাম লক্ষ্মণ ফিরছেন সীতাকে নিয়ে। ভরত সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রয়োজন হয় নি। তার আগেই রাবণকে পরাজিত ও নিহত করেছেন রাম লক্ষ্মণ।

ভরত এতদিন অযোধ্যা হতে কিছুদূরে নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করে সেখান থেকে সন্ন্যাসীর মতো রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করতেন। রাম প্রথমে এসে সেখানেই উঠবেন বলে সকলে সেখানে গেল তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য।

ঊর্মিলা কিন্তু প্রাসাদেই রয়ে গেলেন। যে ঘরটিতে লক্ষ্মণ বিদায় নিয়েছিলেন তাঁর কাছে, সেই ঘরটির মধ্যে বসে অভিমানে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন ঊর্মিলা। লক্ষ্মণ এসে অভিমান ভঞ্জন করবেন তাঁর। এবার হতে লক্ষ্মণ আগে কোনো কথা না বললে তিনিও কোনো কথা বলবেন না তাঁকে।

তন্দ্রা এসেছিল ঊর্মিলার। ভূমিতলে শয়ন করেছিলেন। নিঃশব্দে সে ঘরে এসে লক্ষ্মণ কখন দাঁড়িয়েছেন তাঁর পাশে তা কিছুই বুঝতে পারেন নি ঊর্মিলা।

এদিকে ঊর্মিলাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণ। তাঁর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ এমন কৃশ ও ম্লান হয়ে পড়েছে যে হাতের স্বর্ণবলয়গুলি খুলে খুলে পড়ছে। তাঁর তৈলহীন শুষ্ক কুন্তলচূর্ণগুলি শুষ্ক ম্লান মুখের চারিদিকে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি স্বর্ণপালংক ছেড়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছেন।

সহসা কার স্পর্শে তন্দ্রা ছুটে গেল ঊর্মিলার। তিনি দেখলেন, তাঁর পাশে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু অভিমানে কোনো কথাই বললেন না ঊর্মিলা। শুধু তাঁর অধরোষ্ঠটা একবার কেঁপে কেঁপে উঠল অভিমানে। লক্ষ্মণ তা বুঝতে পেরে বললেন, এবার তোমার ব্রত পালন সমাপ্ত ও সার্থক হয়েছে ঊর্মিলা, ওঠ।

তবু কোনো কথা বললেন না ঊর্মিলা। শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল নিঃশব্দে। এতদিনের না বলা কথার অপরিসীম হাহাকার তাঁর অব্যক্ত অবরুদ্ধ প্রেমের অন্তহীন গভীরতা নীরব উচ্ছ্বাসে যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠল সে অশ্রুর মধ্যে।

বিশ্রবা ও কৈকসী



জোনাকীখচিত পাতালপুরীর মাঝে রাক্ষসরাজ সুমালীর স্ফটিকশিলাময় প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিকচযৌবনা এক কুমারীর স্বপ্নবিহসিত একটি গোপন আবেগ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে দিনে দিনে। বক্ষে স্ফুটকুসুমের বর্ণগন্ধময় ঐশ্বর্যের এক উচ্ছ্বাস নিয়ে কজ্জলমসিরেখাঙ্কিত দুটি চক্ষে মদমদির এক বিহ্বলতা নিয়ে অশান্ত চরণমঞ্জীরে লীলাচপল এক প্রগলভতা নিয়ে নিশিদিন একটি স্বপ্নমূর্তিকে রচনা করে চলে রাক্ষসরাজতনয়া কৈকসী। প্রভাতের মৃদুসমীরিত কুসুমকিঞ্জল্ক সে স্বপ্নকে মেদুর করে দেয়; মধ্যাহ্নের বনচ্ছায়াস্নাত কোনো কপোতদম্পতীর ক্ষণপ্রণয়িত কুজনালাপ সে স্বপ্নের মাঝে এনে দেয় এক দুঃসহ তীব্রতা; আবার সন্ধ্যাকাশের শান্ত রক্তরাগরেখা রঞ্জিত করে দেয় হৈমন্তী কুহেলিকার মতো মায়াময় সেই স্বপ্নকে।

স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। তবু নিশিদিন শুধু আপন অন্তরের নিভৃতে কামনা ও কল্পনার বিচিত্র কারুকার্য দিয়ে নিপুণ ভাস্করের মতো সেই আশ্চর্য স্বপ্নের মূর্তিটিকে খচিত করে চলে কৈকসী। কখনো উদ্যান-বাটিকার শ্যামস্নিগ্ধ তমাল অথবা নক্তমালের ছায়ায়, আবার কখনো বা রত্নপর্যঙ্কের সুখশয্যায় স্বপ্ন দেখে কৈকসী, কোনো সুরাসুর বা যক্ষরাক্ষস নয়, রূপরম্য রত্নকান্তি এক গন্ধর্বযুবার বিদ্রুমসঙ্কাশ বিস্তৃত বক্ষঃপটের উপর প্রিয়ঙ্গুলতিকার মতো এক বিহ্বল মদাবেশে ঢলে পড়ছে সে। কিন্তু কে সে যুবা? কৈকসী তা জানে না। চক্ষু বা চিত্রমাধ্যমে কোনোদিন দেখে নি তাকে। তবু তার কল্পনাঙ্কিত মূর্তিটিকে কেন্দ্র করেই শুভপ্রণয়িত আনন্দঘন এক উৎসবরজনীর স্বপ্ন দেখে কৈকসী। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র ও মাঙ্গলিক শঙ্খের মুহুর্মুহু ধ্বনিমুখরিত দীপাবলীশোভিত পুষ্পপরিমলাপ্লুত সেই উৎসব রজনীতে আলিম্পিত অঙ্গনতলে তার পিতা যেন প্রাজাপাত্য রীতি অনুসারেই তাকে সম্প্রদান করছেন সেই গন্ধর্ব-যুবার হাতে।

সেদিন ছায়ামেদুর এক অপরাহ্নে যখন দিগন্তবর্তী অরণ্যবলয়ে রক্তরশ্মিচুম্বিত তরু-বীথিকা এক শ্যামাঙ্গিত বিহ্বলতায় মদালস হয়ে উঠে, তখন কাননসরোবরের স্বচ্ছ সলিলে স্নানামোদে মত্ত হয়ে ওঠে কৈকসী। তারপর স্নানান্তে চন্দন, কুঙ্কুম ও পুষ্প-পরাগ বিলেপনে তার কোমলাঙ্গকে চর্চিত করবার পর ব্যজনিকা সহচরী তার করবী-স্তবকে চন্দ্রোপল, স্তনাভিরাম বক্ষঃপটে কনককাঞ্চী, কটিতটে রত্নমেখলা ও চরণে স্বর্ণমঞ্জরী দ্বারা সজ্জিত করতে থাকে যখন তার বরতনুকে, তখন সেই মদাবেশবিহ্বল মুহূর্তে তাকে সেই একান্ত গোপন স্বপ্নের কথাটি বলে ফেলে কৈকসী। আর ঠিক সেইক্ষণেই রাজা সুমালীর কক্ষে ডাক পড়ে তার।

দ্বারপ্রান্ত হতে রাজা সুমালীর চিন্তান্বিত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে কৈকসী। শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলেন সুমালী, আমি এক বিশেষ কারণে তোমায় ডেকেছি তনয়া। তুমি হয়তো জান, সম্প্রতি আমি মর্ত্যলোক পরিভ্রমণ করে ফিরেছি।

শঙ্কাবিহ্বল কণ্ঠে অবনত মস্তকে উত্তর করে কৈকসী, হ্যাঁ পিতা, জানি।

নিদাঘদিনের সলিলশূন্য সরোবরের মীনপঙ্‌ক্তির মতো বেদনামলিন হয়ে ওঠে কৈকসীর অতনুবিমোহন মুখচ্ছবি।
সুমালী বলেন, ফিরেছি, কিন্তু আমার প্রাণমনের সকল শান্তি আমি চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছি তনয়া। এক তীব্র অন্তর্জ্বালায় অনুক্ষণ আমি দগ্ধ হচ্ছি। জ্বালা-বিগলিত বক্ষে শুধু ভাবছি প্রতিকারের কথা।
কিন্তু আপনার অশান্তির কারণ কি পিতা? দুষ্প্রবেশ্য এই পাতালপুরী কোনো শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হবার তো কোনো সম্ভাবনা নেই।
না কন্যা, আমি সে চিন্তায় চিন্তিত নই। মর্ত্যভূমি পরিভ্রমণকালে অকস্মাৎ আমি স্বর্ণলঙ্কাপুরীর অমিত ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মতো কৌশলে সেখানে প্রবেশ করি। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস কন্যা! যে লঙ্কাপুরী একদিন আমাদেরই নির্দেশানুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ত্রিকূট পর্বতের উপর মর্ত্যের সকল দুর্লভ মণিমাণিক্য ও রত্নসম্ভার সহযোগে নির্মাণ করেন, সর্বতোভাবে সুরম্য সেই স্বর্ণপুরী হতে আমরা চিরতরে নির্বাসিত হয়ে হীন তস্করের মতো এই ভূগর্ভস্থ পাতালপুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। যে লঙ্কাপুরী ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমাদেরই উপভোগ্য, আজ তা অন্যায়ভাবে নলকুবেরের দ্বারা অধিকৃত ও উপভুক্ত। দেবতাদের অন্যায় চক্রান্তে বিষ্ণুসেনা কর্তৃক নির্জিত হয়েই প্রাণভয়ে আমরা এখানে এসে নূতন পুরী নির্মাণ করে বাস করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু নিষ্ঠুরা নিয়তির এই অন্যায় বিধানকে আমি আর অমোঘ বলে মেনে নিতে পারব না কৈকসী। লঙ্কাপুরীর বর্তমান অধীশ্বর কুবেরের অপরিমিত ঐশ্বর্যে ঈর্ষা সঞ্জাত হয়েছে আমার অতৃপ্ততাপিত অন্তরে। এই মরকতমণ্ডিত ও রত্নশিলাবিভূষিত বিশাল প্রাসাদের সকল ঐশ্বর্যচ্ছটা ম্লান মনে হচ্ছে আমার ক্রোধতপ্ত ঈর্ষালাঞ্ছিত দুটি চক্ষে। তবে মায়াবী দেবতাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হয়ে আমি এক সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করতে চাই তনয়া, আর তুমিই হবে সে কৌশলের একমাত্র নায়িকা।
বিস্ময়াদ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে কৈকসী, কী সে কৌশল পিতা?
ক্ষোভপুঞ্জিত কণ্ঠে উত্তর করেন সুমালী, তুমিই আমার সকল কন্যাদের মধ্যে বর্তমানে সন্নদ্ধযৌবনা ও সর্বাপেক্ষা রূপবতী, সুতরাং তোমাকেই হতে হবে এ অপকৌশলের কপটিনী নায়িকা। মায়াশক্তিসমন্বিত হীন অপকৌশল প্রয়োগে রক্ষঃকুলের মতো দেবকুলও কম পারঙ্গম নয় কন্যা। সমুদ্রমন্থনকালে অসুরকুলের কাছ থেকে সমপরিমাণ শ্রম গ্রহণ করেও সমুদ্রোত্থিত অমৃতকুম্ভ হতে অসুরকুলকে বঞ্চিত করে নিজেরাই তা ভোগ করে আসছে অন্যায়ভাবে। ফলে অসুরকুল হতে কম শক্তিশালী হয়েও দেবকুল চির অমর চির অপরাজেয়; আর মহা তেজ ও বিক্রমের অধিকারী হয়েও অসুরকুলের সকল শক্তি সীমায়িত ব্যর্থতাবিধৃত ও মৃত্যুসন্ধুক্ষিত।
তবু পিতা সুমালীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না কৈকসী। এক শঙ্কাকীর্ণ উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

সুমালী বলেন, আমাদের এই পরম শত্রু কুবেরের যথার্থ পরিচয় জান? ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবের হচ্ছে ভরদ্বাজকন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভজাত ও পুলস্ত্যতনয় মহামুনি বিশ্রবার পুত্র। ত্রিকূট পর্বতস্থিত এক উপবনস্থলীতে তপস্যানিরত আছেন মহাতেজা মুনিবর বিশ্রবা। তুমি ভক্তিনম্র চিত্তে তাঁর সমীপে গিয়ে তোমার যৌবনান্বিত দেহসম্ভার তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে পুত্রবর প্রার্থনা করবে। মুনিবর দয়ার্দ্রচিত্ত, কখনই ব্যর্থ হতে দেবেন না তোমার প্রণয়াকুলিত প্রার্থনাকে।
এক নির্মম বেদনাঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে কৈকসীর অন্তরাত্মা। মহামুনি বিশ্রবা সকাশে তার প্রার্থিত বর ব্যর্থ হবে কি না জানে না কৈকসী; কিন্তু তার এতদিনের হৃদয়লালিত স্বপ্নবিহসিত একটি কামনা অকস্মাৎ নিঃসংশয়িতরূপে ব্যর্থ হয়ে যায় চিরতরে। তার কল্পলোকের নিভৃতে প্রিয়দর্শী এক যুবার যে স্বপ্ন-মায়ালীন মূর্তিটিকে রচনা করে এসেছে এতদিন, একটি মাত্র কথার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় সে মূর্তি। বিদ্রুমদেহোবিচ্ছিন্ন ধূল্যবলুণ্ঠিত কোনো ব্রততীর মতো এক সকরুণ অসহায়তাবোধের অভিঘাতে বিকম্পিত হয়ে ওঠে তার শোকভীরু চিত্ত। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় তার যৌবনমদান্বিত কুমারীজীবনের লাস্যবিলোল সকল লীলাচঞ্চলতা।

তবু পিতা সুমালীর এই নিষ্ঠুর আদেশবাক্যের কোনো প্রতিবাদ করবার সাহস পায় না কৈকসী। নীরবে অবনত মস্তকে সে আদেশ মেনে নিয়ে আপন শিলাকুট্টিমে ফিরে আসে। বাষ্পাবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, আমার এতদিনের স্বপ্ন ও সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল সহচরী। বৃথাই এতদিন বিচিত্র পুষ্পপরাগ প্রসাধনে কোমল ও কমনীয় করে এসেছ এ অঙ্গকে; বিবিধ রত্নাভরণে ভূষিত করে অভিশপ্ত এই যৌবনসৌন্দর্যকে বর্ধিত করবার বৃথাই প্রয়াস পেয়েছ সখি।
ব্যজনিকা সহচরী কিছু বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে কৈকসীর মুখপানে। কৈকসী অভিমানস্ফীত কণ্ঠে বলে, খুলে দাও সখি আমার অঙ্গের সমস্ত ভূষণ। এই কনক কেয়ূর ও কর্ণাভরণ, এই কনককাঞ্চী, রত্নমেখলা, আর স্বর্ণমঞ্জীর ভোগবতীসলিলে নিক্ষেপ করব আমি। তার পরিবর্তে নিয়ে এস বল্কল বসন, উৎপলমেখলা পুষ্পাভরণ। যৌবনোৎফুল্ল কোনো প্রিয়দর্শী যুবাপুরুষের পরিবর্তে জরাগ্রস্ত এক তপস্বীর অঙ্কশায়িনী হতে হবে আমায়। সেবার দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করে পুত্রবর প্রার্থনা করতে হবে, যে পুত্র একদিন আমাদের পিতৃবংশের সকল অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করবে।
উৎফুল্ল হয়ে উত্তর করে ব্যজনিকা, এক মহামুনির তেজ গর্ভে ধারণ করতে পারা তো সৌভাগ্যের কথা রাজনন্দিনী। বৃথা বিচলিত হচ্ছ কেন তুমি? আত্মসুখসম্ভোগই কি প্রণয় অথবা পরিণয়ের একমাত্র লক্ষ্য? তার সঙ্গে সমাজকল্যাণের কোনো বৃহত্তর তাৎপর্য জড়িয়ে নেই? তোমাদের এই অসম মিলনে হয়তো তোমার আত্মসুখ চরিতার্থতার অবকাশ অল্প থাকবে; কিন্তু এ মিলনের ফলে তোমাদের যে বংশ

গৌরব বৃদ্ধি পাবে, সমাজের যে কল্যাণ ও উন্নতি সাধিত হবে তার কথা একবার ভেবে দেখ রাজতনয়া।

সেকথা বারবার ভেবে দেখে কৈকসী। তবু শান্ত হয় না তার মন। তবু প্রশমিত হয় না তার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের জ্বালা।

পরদিন প্রভাতেই বল্কলবসনা বিভ্রমবিলাসহীনা কৈকসীকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিকুট পর্বতোপরি সেই উপবনাশ্রমে উপনীত হন রাজা সুমালী। ধ্যানমৌন মুনিকে দূর হতে প্রণাম নিবেদন করে ফিরে যান সুমালী। পার্বত্য অরণ্যসংলগ্ন সেই নির্জন উপবনভবনপ্রাঙ্গণে বল্মীকস্তূপসদৃশ এক নিস্পন্দদেহ তপস্বীর সম্মুখে নিশ্চল হয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকে কৈকসী। কোনোরূপ সম্ভোগের জন্য বক্ষে যাঁর কোনো ব্যাকুলতা নেই, পৃথিবীর রূপ রস, শব্দ, বর্ণ, গন্ধের প্রতি কোনো ইন্দ্রিয়াশক্তি নেই যাঁর মনে, তৃষ্ণা ও তৃপ্তির মধ্যে কোনো ভেদজ্ঞান নেই যাঁর চিত্তে, সেই ইন্দ্রিয়চেতনাতীত বয়োবৃদ্ধ সাধককে পতিত্বে বরণ করে নেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় পর্যাপ্তযৌবনা কৈকসী। সাগরসঙ্গমে এসে অগাধ অতলান্ত বারিধিগর্ভে নিজেকে বিলীন করে দেবার বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে যেমন আশিঞ্জিতনূপুরা ফেনোচ্ছলা কোনো তটিনী।

মৌলিনীলশিখর ত্রিকূট পর্বতের কুহেলিসমাচ্ছন্ন গাত্রদেশে অপরাহ্নসূর্য এক মায়াময় বর্ণজাল বিস্তার করে। দক্ষিণসমীরচঞ্চালিত পুঞ্জ পুঞ্জ লবঙ্গকেশর সৌগন্ধে আকুল করে তোলে চারিদিক। আশ্রমসংলগ্ন অরণ্যদেশ কখনও নীরব ও নিষ্কূজস্তিমিত, আবার কখনও বা বিচিত্র শব্দসমারোহে সমাকুল। সে অরণ্য কোথাও সুজটিল লতাপল্লবগুল্মজালে জর্জরতনু; আবার কোথাও বা সুসন্নিবেশিত তরুরাজির উদারবিপুল শ্যামলতায় শোভনাঙ্গী।

কলোচ্ছলা এক নির্ঝরের স্বচ্ছ সলিলপ্রবাহিকায় শুচিস্নাত হয়ে আসে কৈকসী। তারপর নূতন বল্কলবসন পরিধান করে ও ঘনকৃষ্ণ কেশস্তবকে কবরীবন্ধন রচনা করে মুনিবরের ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। বলির পূর্বমুহূর্তে উৎসর্গীকৃত কোনো এক ছাগশিশু যেন আপন পূর্বানুভূতির জারকরসে ধীরে ধীরে জারিত করে তুলতে থাকে তার মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতাকে।

অবশেষে ধ্যাননেত্র উন্মীলিত করেন বিশ্রবা। বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কে তুমি চপলযৌবনা? সায়াহ্নকালের এই নির্জন অরণ্য প্রদেশে কি হেতু আগমন তোমার?

আর কোনো ভয় অনুভব করে না কৈকসী। এক তীব্র অন্তরাবেগের উষ্ণতা দিয়ে এর আগেই নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছে যেন আসন্ন বিপদের সমস্ত ভয়াবহতাকে। নিঃসঙ্কোচ ও নির্ভীক দৃষ্টি সমুত্থিত করে কৈকসী বলে, আমি সুমালীতনয়া কৈকসী। পিতার আদেশে আপনার নিকট পুত্রবরপ্রার্থিনী হয়ে এসেছি ঋষিবর। এই মুহূর্ত হতে আপনার শ্রীচরণের দাসীরূপে আপনার সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করতে চাই। এখন হতে নিরন্তর সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করাই

হবে আমার নারীজীবনের একমাত্র ব্রত।

বয়োবৃদ্ধ বিশ্রবার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয় কৈকসী। বয়সে বৃদ্ধ হয়েছেন বিশ্রবা, কিন্তু বার্ধক্যে জর্জরিত হয় নি তাঁর তপোসিদ্ধ তনুশোভা। পুষ্পোচ্ছ্বাসবিগত অথচ পত্রপল্লবশ্যামলিত এক ফলবান বনস্পতির মতো নিবিড়তম পূর্ণতার মাঝে এক সারবান রসপরিণতি লাভ করেছে যেন বিশ্রবার দেহ। বসন্তবায়ু-চঞ্চলিতা পুষ্পান্বিতা তরুলতার মতো সে-দেহকে আলিঙ্গন করে নিজের ক্ষণভঙ্গুর যৌবনাঙ্গকে সার্থক করে তোলবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠে কৈকসী।

কৈকসীকে পরীক্ষা করবার জন্য এক কপট ভ্রূকুটিতে অক্ষিপল্লব দুটিকে কুঞ্চিত করে বিশ্রবা বলেন, আমি বুঝতে পারছি না সুযৌবনা, কেন তুমি শুধু পিতার আদেশে তোমার এই নবমুকুলিত দেহের অমিত যৌবনসম্ভার ও অন্তরের অমূল্য প্রণয়সম্পদ আমার মতো এক অক্ষম পাত্রে অর্পণ করতে এসেছ? তোমার কুমারী জীবনের দুরায়াসলালিত অস্ফুট কুসুমকোরকগুলিকে কেন তুমি এমন নির্মমভাবে অপাত্রে উৎপাটিত করে দিতে এলে বালা?

কৈকসী বলে, এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই। আপনার এই আশ্রমের শান্ত নীলাশোকের ছায়াতলে এসে আমি আমার কামনার সমস্ত উত্তাপ হারিয়ে ফেলেছি মুনিবর। আপনার এই স্তব্ধধ্বংসর তপোভূমিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার কুমারী জীবনের দীর্ঘ দিবসসঞ্চিত স্বপ্নপুঞ্জের সমস্ত প্রগলভ উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে পড়েছে নিঃশেষে। আমার কৌমার্যসত্তার সমস্ত শুচিতা আপনাতেই সমর্পণ করেছি আর্য। আমার যৌবনাঙ্গ পুষ্পিতা; কিন্তু ফলবতী নয়, আমায় প্রার্থিত ফল দান করে আমার অঙ্গলতিকাকে সার্থক করুন ঋষিবর।

শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডলে এক সকরুণ হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে বিশ্রবা বলেন, সত্যই তুমি ছলনাময়ী রক্ষকুলবালা। যে নারী শুধু পুত্রসুখাভিলাষিণী কর্তব্য-চারিণী ভার্যারূপে এক নীরস নিষ্ঠায় তার ভর্তার দেহকে সেবার দ্বারা তৃপ্ত করে যাবে, কিন্তু সরস প্রণয়সংরাগের দ্বারা অনুরঞ্জিত করবে না তার হৃদয়কে, সে নারীকে আমায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করছ কোন্ সাহসে স্পর্ধিনী?

এক নিবিড় ব্যথাভারে নিপীড়িত হতে থাকে কৈকসীর মর্মদেশ। শিশিরাপ্লিত নয়নে বলে, আমায় ক্ষমা করবেন তাপসশ্রেষ্ঠ। আমার ধারণা ছিল, কোনো প্রণয়-সংরাগের সরস বর্ণানুলেপন দ্বারা কখনো কোনো তপস্বীর বৈরাগ্যধূসর অন্তরা-কাশকে অনুরঞ্জিত করা যায় না। আমার একান্ত বিশ্বাস ছিল, তপোসিদ্ধ কোনো মহাপুরুষের অন্তরে কৃপা আছে, করুণা আছে; কিন্তু প্রেম নেই। অনুকম্পা আছে অনুরাগ নেই। কাতর প্রার্থনায় তাঁরা কৃপা করেন, কিন্তু প্রেমের ডাকে তাঁরা সাড়া দেন না। তাঁদের কাছে কামনার তৃপ্তি পাওয়া যায়; কিন্তু তৃষ্ণার শান্তি পাওয়া যায় না। এখন দেখছি আমার সে ধারণা, সে বিশ্বাস ভুল। আমার এ ভুল ভেঙে দিয়ে আপনি ভালই করেছেন নাথ। এখন দেহের সঙ্গে আমার মনের সমস্ত চেতনা,

চিত্তের সমস্ত অহংকার, হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ, অন্তরের সমস্ত আবেগ আপনাকে নিঃশেষে দান করতে আমার আর কোনো বাধা নেই। আমি শুধু ব্রতচারিণী ঋষিবধূ হব না, আমি হব প্রণয়াভিমানিনী এক কামিনী। সিতচন্দনে সিক্ত হয়ে উঠবে আমার চীরবাস বল্কলিত দেহভার। কালাগুরু ধূপে সুবাসিত হবে আমার কেশস্তবক। কর্ণে নবকর্ণিকার ও ফুল্ল বকুল শোভা পাবে আমার কবরীবন্ধনে। পুষ্পবলয়ে শোভিত হবে আমার বাহুযুগল।

প্রগলভালাপিণী কৈকসীকে আর কোনো কথা বলতে দেন না বিশ্রবা। দুটি ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করে পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করেন তাকে। তার বিম্বাধরের উপর চুম্বনপীড়ন দ্বারা স্তব্ধ করে দেন তার সমস্ত বাক্যোচ্ছ্বাসকে।

নিমীলিতাক্ষী কৈকসী বলে, যে নির্মম প্রয়োজনের তাড়নায় এখানে আমি এসেছিলাম সে প্রয়োজন এখন লাভ করল এক প্রণয়ধন্য সার্থকতা। আজ আমি কৃতার্থ। আমার প্রেম আমার প্রয়োজন আমার দেহ আমার মন সব কিছু আপনাকে দান করে আজ আমি হলাম সম্পূর্ণ মুক্ত মুনিবর। আজ আমি মুক্ত ও লঘুপক্ষ বিহঙ্গীর মতো লীলাচপল পক্ষ বিস্তার করে আমাদের মিলিত অন্তরাকাশ দুটিকে পরিক্রমা করব শুধু।

দূরে নীলাকাশে শুক্লা দ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা অঙ্কিত হয়। গন্ধাবেশে বিহ্বল হয় দক্ষিণের মলয়সমীরণ। চন্দ্রালোকচুম্বিত তরুবীথিকার মতো কৈকসীর স্পর্শবিহ্বল বক্ষ শিহরিত হয়। অলিচুম্বিত গন্ধপুষ্পকোরকের মতো তার হৃদয়ের সুরভিত নিভৃতে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এক গূঢ় প্রণয়াবেগ।

কিন্তু একটা কথা সুরম্যা!

ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে তাকায় কৈকসী, আবার কি কথা স্বামী?

বিশ্রবা বলেন, এখন প্রদোষকাল। এই অসময়োচিত সঙ্গমের ফলে তোমার প্রথম সন্তান বিপুল বল-বীর্যের অধিকারী হয়েও সে হবে অধার্মিক ও উচ্ছৃংখল। সে হবে নীতিহীন শক্তি আর বিবেকহীন বিক্রমের প্রতীক। সে স্বর্ণলংকাপুরী অধিকার করে তোমার পিতার মনস্কামনা পূরণ করবে; কিন্তু তারই পাপে সে পুরী হবে বিধ্বস্ত।

এক নিবিড় আবেগে কৈকসী বলে, তা হোক হৃদয়েশ্বর। এখন আমার কাছে আপনার প্রেম-সমৃদ্ধ স্পর্শমাধুরীই একমাত্র কাম্য। পুত্রসুখবাসনার কাছে সে মাধুরীকে ম্লান করে দিতে চাই না আমি। তাছাড়া আমার একান্ত বিশ্বাস, আপনার পবিত্র তেজোসম্ভূত আমার সব সন্তানই দুরাত্মা হবে না। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এক পরম ধার্মিকরূপে অক্ষয় করে রাখবে আপনার এই তপোশুদ্ধ মহাজীবনের মর্যাদাকে।

বিশ্রবা সানন্দে বলেন, তোমার তৃতীয় এবং শেষ পুত্রই হবে সেই ধর্মাত্মা।

কতকগুলি দুরূহ শব্দের অর্থ

আয়তীমতী	সধবা স্ত্রীলোক
জীবৎপুত্রিকা	পুত্র জীবিত আছে যে নারীর
নীলকঞ্জপ্রভ	মেঘের মত কালো
অলক্তরাগে	আলতায়
পেলব	নরম
স্যন্দন	রথ
বীচিবিক্ষুব্ধ	তরঙ্গের দ্বারা আন্দোলিত
তিতিক্ষা	ত্যাগ করার ইচ্ছা
ফেনপুঞ্জবিহসিত	ফেনপুঞ্জের হাসির মতো উজ্জ্বল
মঞ্জুলমঞ্জরি	সুন্দর কুঁড়ির থোকা
নবোদ্ভিন্ন	সদ্য ফোটা
স্বয়ংগ্রহাশ্লেষ	স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়ার প্রবণতা বা ইচ্ছা
মার্তণ্ডতাপে	সূর্যের তাপে
গবাক্ষা	জানালা
অনূঢ়া	অবিবাহিতা কন্যা
স্বর্ণপর্যঙ্ক	সোনার খাট
ব্রীড়াবনত	লজ্জায় অবনত
প্রদোষকাল	সন্ধ্যাকাল
ঝিল্লীধ্বনিত	ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দে ধ্বনিত
সামীপ্য	নৈকট্য
অবতংস	হার
সন্নতভাবে	বেশী নত হয়ে
দ্যুলোক	স্বর্গলোক
কাঞ্চনদ্রব	গলা সোনা
ক্রোধবিস্ফারিত	রাগের চাপে প্রসারিত
লোচনবহ্নি	আগুনের মত চোখ
পদ্মগন্ধবিনিন্দিত	পদ্মগন্ধের থেকেও মধুর
নম্রীভূত	নত
অনলপ্রভ	আগুনের মত উজ্জ্বল
বিলাসলাস্য	বিলাসের উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য
উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরান্ত	ওঁকারের অন্তর্গত অ উ ম এই স্বর বা নাদের নাম
চিত্তবিভ্রম	চিত্তের ভুল

সূর্যসন্নিভ	সূর্যের মত
কণ্ডুয়ন	গা চাটা
আশিঞ্জিতনূপুর	যে নূপুর থেকে ঝম ঝম শব্দ হয়
ভৃঙ্গারক	জল সেচনের পাত্র
দ্রুম	গাছ
ভূধর	পাহাড়
কবরীস্তবক	চুলের খোঁপা
বসনাঞ্চল	কাপড়ের আঁচল
কুট্টিম	প্রকোষ্ঠ
পর্বতস্তনিত	পর্বত স্তন যার
সমুদ্রমেখলা	সমুদ্র যার মেখলা বা কোমরের বিছে
কুন্দধবল	কুন্দফুলের মত সাদা
চন্দ্রানির্মিলিত	চাঁদকেও হার মানায়
কৌমুদীজাল	জ্যোৎস্নার আলো
আঁয়তাক্ষী	আয়ত চোখ যার
অবনতাঙ্গী	অবনত অঙ্গ যার
স্বেদাঙ্কুরাচিত্রিত	গায়ের উপর ঘামের চিহ্ন
শিলাজতুসৌরভ	পাহাড়ের গা থেকে বেরোন আঠার গন্ধ
আলেখিত	অংকিত
পর্ণরাশি	পাতার রাশ
বেণীভূতপ্রতনুসলিলা	যে নদীর স্রোত বেণীর মত সরু হয়ে গেছে
তটিনী	নদী
শীকরকণাসিক্ত	জলীয় বাষ্পকণার দ্বারা সিক্ত বা ভিজে
মৈরেয় মধু	চাল ও আখের রস দ্বারা তৈরী একরকম মদ
নিরন্ধ্রনিশীথ	একেবারে নিশ্ছিদ্রভাবে নীল
নীরদমালাসদৃশ	মেঘমালার মত
ভোগবতী বিধৌত	ভোগবতী অর্থাৎ পাতালের নদীর দ্বারা বিধৌত
কজ্জল	কাজল
দ্রুমদেহাবিচ্ছিন্ন	গাছের গা থেকে বিচ্ছিন্ন
ধূল্যাবলুণ্ঠিত	মাটিতে লুণ্ঠিত
মৃত্যুসন্ধুক্ষিত	মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত
প্রগলভালাপিনী	দম্ভভরা কথা যে নারীর
লাস্যবিলোল	বিলাসব্যসনে পটু
শিলাকুট্টিম	পাথরের ঘর